# শুনুন ধর্মাবতার


রচনা

নাথুরাম গড্‌সে

ও

গোপাল গড্‌সে



ভাষান্তর ঃ নিরদবরণ হাজরা



মহাজাতি প্রকাশন

১৩, বঙ্কিম চাটার্জী স্ট্রীট কলিকাতা-৭৩

## ॥ প্রকাশকের নিবেদন ॥

আমার প্রকাশনের নামে ইতঃপূর্বে কয়েকটি গ্রন্থ প্রকাশিত হলেও ষোলআনা আমার প্রকাশনা হিসাবে 'শূন্যে ধর্মাবতার' কেই গ্রহণ করতে হবে। বর্ত্তমান গ্রন্থের অনুবাদক ও টীকাকার আমার পূর্ব-পরিচিত শ্রদ্ধাভাজন মানুষ। তিনি যখন এই গ্রন্থ সম্পর্কে আমাকে বলেন এবং গ্রন্থটি সম্পর্কে দু'একজন ব্যক্তির বিরূপ মন্তব্য শোনান, তখন আমার আগ্রহ ও জেদ দুই-ই বর্দ্ধিত হয়। আমি পাণ্ডুলিপি পড়ি।

আমি ব্যক্তিগতভাবে গান্ধী-অনুরাগী। সত্যাশ্রয় গান্ধীজীর জীবনাদর্শ। অবিমিশ্র ভক্তি ও স্তূতিতে কখনই সত্য উদ্ধার হয় না। বিজ্ঞানচর্চা সম্পর্কে বলতে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, সন্দেহ জিজ্ঞাসা ও বিচারেই বিজ্ঞানের পুষ্টি। সেই অর্থে সত্য যাচাই-এর পথও তাই। একারণে আমার মনে হয় গান্ধীজীর সত্যমূল্য উদ্ধারের জন্য এই চরম গান্ধী বিরোধী বক্তব্য প্রকাশিত হওয়া প্রয়োজন।

নাথুরাম ব্যক্তিগতভাবে গান্ধীজীকে ভক্তি করতেন। তাঁর দিকে গুলি ছুঁড়বার আগেও তিনি মনে মনে গান্ধীজীকে প্রণাম করেন, তাঁর পুণ্যস্বর্গ কামনা করেন। পথ বিরোধী হলেও গান্ধীজী বা নাথুরাম কেউই ভারতবর্ষের মঙ্গলের বিপরীত চিন্তা করতেন না। ফাঁসির মুহূর্ত্তেও নাথুরাম বলেছেন, অখণ্ড ভারত অমর হোক্, বন্দেমাতরম্। একথা ত' আমাদেরও কথা। সেদিক থেকে এ গ্রন্থ প্রকাশ গান্ধীজীকে তথা ভারতীয় রাজনীতিকে বিচারের একটা নতুন দিক খুলে দেবে।

নাথুরাম তাঁর জবানবন্দীতে গান্ধীজীর রাজনৈতিক বিচ্যুতি দেখাতে চেয়েছেন। কিন্তু ভারতীয় রাজনীতিতে ব্যাপক জনজাগরণে গান্ধীজীর ভূমিকাকে অস্বীকার করেন নি। ১৯৪৮ সালের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে এই হত্যাকারীর মনে হয়েছে গান্ধীজী ভারতের অগ্রগতির পক্ষে পরম বাধা। এই কারণেই তার স্বেচ্ছায় গান্ধী-হত্যার সিদ্ধান্ত

গ্রহণ। একথা যদি ঐতিহাসিক ভাবে সত্য বলেও গৃহীত হয়, তা হলেও ভারতীয় রাজনীতির ইতিহাসে মহাত্মার গুরুত্ব এতটুকু কমবে না বলেই আমার বিশ্বাস। গান্ধীজীর সত্যনিষ্ঠার প্রতি শ্রদ্ধা রেখেই সত্য প্রতিষ্ঠার সহায়ক হিসাবে এ গ্রন্থ প্রকাশ করলাম।

মূল গ্রন্থের নাম May it please your honour-এর প্রকাশক ও সংকলক নাথুরাম-ভ্রাতা শ্রীগোপাল গডসে আমাকে এ গ্রন্থ প্রকাশের অনুমতি দিয়ে বাধিত করেছেন।

গ্রন্থটি কলিকাতা পুস্তক মেলায় প্রকাশের লক্ষ্য রাখায় অতিদ্রুত কাজ করতে হয়েছে। ফলে গ্রন্থসজ্জায় এবং প্রুফ দেখায় সামান্য ত্রুটি থেকে গেছে। এজন্য আমি মার্জনা চাইছি। পুনর্মুদ্রণে এ সম্পর্কে আরও সতর্কতার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।

এ গ্রন্থ প্রকাশনার ব্যাপারে যেমন বাধা পেয়েছি, পেয়েছি অকৃপণ সহায়তা। যারা সহায়তার হাত বাড়িয়েছেন, তাদের কথা সকৃতজ্ঞচিত্তে মনের মণিকোঠায় ধরে রাখলাম।

## ॥ মুখবন্ধ ॥

### ॥ এক ॥

চল্লিশ বছর আগে নাথুরাম গড্‌সে আদালতে যে বিবৃতি পেশ করেছিলেন, সাতাশ বছরেরও বেশি কাল যা সরকারী নিষেধাজ্ঞায় অন্ধকার সংগুপ্ত করে রাখা হয়েছিল তাকে বাংলা ভাষায় অনুবাদ করতে পেরে আমি বিশেষ আনন্দবোধ করছি।

গান্ধীজী ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের এক কীর্ত্তিমান মানুষ। প্রায় ত্রিশ বছর ভারতীয় রাজনৈতিক ক্রিয়া চলেছে তাঁর নির্দ্দেশে। এতবড় অপ্রতিহত প্রতাপ, দায়িত্ব ও নেতৃত্ব আর কেউ কখনও অর্জন করতে পারেন নি। আমাদের কৈশোরে তিনি নিহত হন। নোয়াখালি যাওয়ার পথে জনারণ্য-স্টেশনে গাড়ির মধ্যে উপবিষ্ট গান্ধীজীকে এক ঝলক দেখেছিলাম প্রাক্‌স্বাধীনতা যুগে। দিবারাত্র সপরিবারে মৃত্যু-ভয়ের মধ্যে কাল কাটিয়ে এদেশে এসে হয়ত' দুর্দ্দশায় পতিত হয়েছি কিন্তু তাকে বুঝবার মত বিশ্লেষণী মন আমার ছিল না। কিন্তু মনে আছে ঘনশ্যাম নামে আমার থেকে সামান্য বড় যে উড়িষ্যাবাসী যুবক আমাদের বাড়িতে কাজ করত, গান্ধীজীর মৃত্যুসংবাদ সেই প্রথম আমাদের বাড়িতে বয়ে আনে। গোটা পরিবার শোক-স্তব্ধ হয়। ঘনশ্যাম লুটিয়ে লুটিয়ে কাঁদতে থাকে। আজ মনে হয় দৃশ্যটা প্রতীকী। গান্ধী হত্যার ফলে গোটা দেশের শোককে ঘনশ্যাম আমার কাছে তুলে ধরেছিল।

সে দিন গান্ধীজীর চিতাভস্ম নিয়ে কয়েক মাস ধরে যে সব অনুষ্ঠান ও আয়োজন হয়েছিল, তাতে তলিয়ে গেছিল গান্ধী হত্যা-কারীদের বিবরণ। পত্র পত্রিকাতেও তেমন বিশেষ কিছু প্রকাশিত হয়নি। পাঁচই ফেব্রুয়ারী আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রথম হত্যাকারী হিসাবে নাম ঘোষণা করা হয়েছে এবং তার পরিচয়ে বলা হয়েছে,

> **'নাথুরাম পূর্বে দর্জির কাজ করিত। তখন নারায়ণ রাও গড্‌সে তাহার নাম ছিল। সে হায়দ্রাবাদে যায় এবং সেখানে নাম পরিবর্তন করে।'**

এর থেকে কিছু বিশদ বিবরণ প্রকাশিত হয় হিন্দুস্থান টাইমস্-এ। কিন্তু তবু আমি আনন্দবাজারের বিবরণ তুলে দিলাম, এটুকু বোঝাতেই যে, গান্ধীহত্যার ব্যাপারে হত্যাকারীদের প্রথম থেকেই গোপন করে রাখা হয়েছিল। তাদের বিচার প্রকাশ্যে হয়নি। তাদের বিবৃতি প্রকাশ করতে দেওয়া হয়নি। কিন্তু কেন?

অথচ নাথুরাম একেবারে তুচ্ছ মানুষ ছিলেন না। তিনি কমবেশি যে প্রচার সংখ্যাই থাকুক একটি দৈনিক ও একটি সপ্তাহিক পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। আমি ব্যক্তিগত ভাবে পুনা-হায়দ্রাবাদ ও গোয়ালিয়র অঞ্চল ঘুরে জেনেছি সমাজসেবী ও নিঃস্বার্থ কর্মী হিসাবে তাঁর সুনাম ছিল। নাথুরামের সমগ্র বিবরণীতে গান্ধীজীর ব্যক্তিত্বের প্রতি কোথাও শ্রদ্ধার অভাব দেখা যায় নি। অথচ তাঁকেই নাথুরাম হত্যা করলেন।

লক্ষ্য করবার কথা, নাথুরাম গান্ধীজীর প্রতি তিনটি গুলি ছোঁড়ে অর্থাৎ তখনও তার রিভলভারে তিনটি গুলি ছিল। সে কিন্তু আত্মহত্যা করেনি। সে আত্মগোপন করার মত পোষাকও পরে যায় নি, পালাতেও চেষ্টা করেনি। আবার গান্ধী-হত্যার জন্য তাঁর প্রতি যে মৃত্যুদণ্ডাদেশ দেওয়া হয়, তার বিরুদ্ধেও পুনর্বিচার প্রার্থনা করে নি। অর্থাৎ মৃত্যুকে নিশ্চিত জেনেই নাথুরাম তার শ্রদ্ধা ও সম্মানের সামাজিক মর্যাদার আসন ছেড়ে নেমে এসেছিলেন স্বেচ্ছায় ফাঁসি বরণ করার ফলকে অবধারিত জেনে। এ মানুষটির বক্তব্য জানবার অধিকার সকলেরই আছে। সেদিক থেকে নাথুরামের এই বিবরণী এক ঐতিহাসিক দলিল।

গান্ধী-হত্যা কাণ্ডের পর আজ চল্লিশ বছর পার হয়ে গেছে। কিন্তু আজও আমরা সত্য প্রকাশের স্বাধীনতা গ্রহণে ভীত। বেশ কয়েকজন প্রকাশক এ গ্রন্থ প্রকাশে আগ্রহী থেকেও অকারণ ঝঞ্ঝাটে জড়িয়ে যাবার ভয়ে পিছিয়ে যান। দুটি প্রেস শেষ পর্যন্ত পাণ্ডুলিপি ফেরৎ দেয়। অথচ সমগ্র গ্রন্থে সেকালের কংগ্রেসী কার্যকলাপ বা গান্ধীজীর অতীত কীর্তির সমালোচনার বাইরে আর কিছুই নেই। তবে কি আজও আমরা কোন অলিখিত ভয়ের রাজ্যে বাস করছি?

॥ দুই ॥

সমগ্র গ্রন্থে তিনটি অংশ আছে। প্রথম অংশ লিখেছেন গোপাল গড্‌সে। ইনি নাথুরামের ভাই। ইনিও অভিযুক্ত ছিলেন। শাস্তি ভোগ করেছেন। দীর্ঘকায় মজবুত স্বাস্থ্যের অধিকারী এই মানুষটির এতবয়সেও কর্মশক্তি আমাকে বিস্মিত করেছে। আরও বিস্মিত করেছে তার নির্ভেজাল ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি অবিচল নিষ্ঠা। গোপালবাবু মনে করেন, আমাদের সংস্কৃতি প্রথম বিপন্ন হয় ভাষার অপব্যবহারে। আমরা ভিন্নভাষা থেকে শব্দ গ্রহণ করে নিজ ভাষাকে কলুষিত করি। গোপালবাবু আমাকে অনুবাদ কর্মে এই ভাষার মিশ্রণ থেকে মুক্ত থাকতে নির্দেশ দিয়ে ছিলেন কিন্তু আমি সর্বথ সে রীতি মানতে পারি. নি। আমার মনে হয়েছে শব্দের ঐ বৈশিষ্ট্যের দিকে তাকিয়ে 'ব্ল্যাঙ্ক চেক'-এর বাঙলা যদি 'নিরঙ্ক প্রত্যয়পত্র' করা হয় তবে সমগ্র গ্রন্থের আবেদন যথাযথ ভাবে সঞ্চারিত হবে না। অমি নাথুরামের আবেগ ও বাক্যগঠন রীতি যথাযথ রাখবার চেষ্টা করেছি।

যাই হোক, গোপালবাবু এই প্রথম খণ্ডে পূর্ণ ঘটনার বিবরণ ও নাথুরামের অন্তিম পর্বের বর্ণনা করে মূল গ্রন্থের পাঠোপযোগিতা বাড়িয়ে দিয়েছেন। এ অংশ গ্রন্থের অতি প্রয়োজনীয় ভূমিকা প্রতিষ্ঠা করেছে।

দ্বিতীয়ভাগই মূল বিবরণ। এই মূল বিবরণের সামনেও এক পাতা গোপালবাবুর লেখা। 'আমি নাথুরাম বিনায়ক গড্‌সে' বলে নাথুরামের বিবরণ শুরু হয়েছে। যেহেতু বিষয়টি আদালতের নথি তাই আদালতের রীতিতে এই বিবরণে প্রতি অনুচ্ছেদে সংখ্যাপাত করা আছে। মোট একশ পঞ্চাশ অনুচ্ছেদে বিবরণ সমাপ্ত। তারপর আছে পরিশিষ্ট—সংযুক্ত দলিলাদির বিবরণ এবং নাথুরামের উইল।

তৃতীয় ভাগ আমার সংযোজন। মূল গ্রন্থ পড়তে গিয়ে আমাকে বারংবার ইতিহাস গ্রন্থ খুঁজতে হয়েছে। ১৯৪৮ সালে যে সব সংবাদ ছিল সদ্য-দৃষ্ট তা আজ ইতিহাসের নথি। আমার নিজের অসুবিধা থেকেই এই টীকা টিপ্পনির প্রয়োজন অনুভব করে ছিলাম। সে জন্যই এ অংশ যুক্ত হল।

পাঠক দেখবেন চতুর্থ অধ্যায়ের পর টীকা নেই। এর কারণ এর পর থেকে নাথুরাম মূলত তাঁর মন-সমীক্ষা করেছেন। এ বিষয়ে আমার কোন মন্তব্য না করাই ভাল।

পাঠকের সামনে একটা প্রশ্ন না তুলে পারছি না। লরি এবং পিয়ের সাহেবের লেখা Freedom at Midnight গ্রন্থে গান্ধী-হত্যার বিশদ বিবরণ প্রকাশিত আছে। লেখকদ্বয় এমন কৌশলে লিখেছেন যেন মুভি ক্যামেরা নিয়ে তাঁরা আগে থেকেই সব কিছু অনুসরণ করে তুলে রেখেছিলেন। তাঁরা গান্ধী-হত্যা কাণ্ডের নায়ক ও পরিকল্পনাকার হিসাবে সাভারকরকে চিহ্নিত করেছেন—ঠিক যেভাবে পুলিশ মামলা সাজিয়ে ছিল। কিন্তু বিচারে সাভারকর মুক্ত হন। পুলিশের বিবরণ কোর্ট সত্য বলে গ্রাহ্য করেনি। তারপর এই বিবরণ অবলম্বনে রচিত গ্রন্থ বাজারে চলে আজও সাভারকরকে কলুষিত করছে। সাভারকর একই সঙ্গে দোষী এবং নির্দোষ হতে পারেন না। অতএব হয় গ্রন্থটি নিষিদ্ধ হওয়া উচিত, নতুবা কোর্টে মৃত হলেও সাভারকরের পুনর্বিচার হওয়া প্রয়োজন।

এ গ্রন্থ অনুবাদে আমাকে সাহায্য করেন বন্ধু সুকুমার ভট্টাচার্য। তাঁর রীতিকে আমি সর্বদা মান্য করতে পারিনি। কিন্তু তা হলেও তার আন্তরিকতা আমাকে কৃতজ্ঞ করে রেখেছে। আর একটি মানুষ আমাকে সর্ব ব্যাপারে যেমন সাহায্য করেন, এ বিষয়েও তেমনি করেছেন। তিনি শ্রীঅমৃতসু দাস। শ্রীঅখিলেন্দু দাস পুনা থেকে সচেষ্টভাবে যোগাযোগাদি না করলে শ্রীগোপাল গড্সের কাছ থেকে কপি-রাইট আনানই দুঃসাধ্য হ'ত। সর্বশেষে নাম উল্লেখ করি তরুণ প্রকাশক শ্রী প্রকাশচন্দ্র দত্তর। তার মঙ্গল হোক।

# সূচীপত্র

# শুনুন ধর্মাবতার

* প্রথম ভাগ *

গান্ধী-হত্যা মামলার সাধারণ বিবরণ

ও

আসামীদের পরিচয়

॥ রচনা ॥

গোপাল গড্‌সে

ভাষান্তর : ডঃ নীরদবরণ হাজরা

॥ আলঙ্কারিক চাতুর্য্যে নয় ॥

সারা পৃথিবীর মানুষ গান্ধী-হত্যা মামলার সঙ্গে যুক্ত প্রত্যেক আসামী[১] সম্পর্কেই পৃথকভাবে জানবার আগ্রহ পোষণ করেন। কেমন লোক ছিলেন তারা, তাদের ঐক্যের দিকগুলিই বা কি কি—এ সব হচ্ছে তাদের প্রশ্ন।

বিশ্ব বিখ্যাত কিছু বিদেশী লেখক[২] এ বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করেছেন। এ কাজ করতে গিয়ে তারা তথ্যকে বিকৃত করেছেন, সহজ ঘটনার বদলে মিথ্যার অবতারণা করেছেন, স্বভাবতঃ কুৎসিৎ এমন সব ইঙ্গিত দিয়েছেন। এমনি করে তাদের তথাকথিত মহৎ কীর্ত্তির মধ্যে ধীরে ধীরে নোংরামির অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছেন। পাঠকের মানসিকতার দিকে তাকিয়ে তারা সস্তা আবেগময়তার আশ্রয় নিয়েছেন, এমন কি যারা জাতীয় স্তরে নেতা হবার যোগ্য তাদের ভাবমূর্ত্তিও বিকৃত করেছেন।

ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে এ সব করে ঐ লেখকদের দ্রুত অর্থ-উপার্জন ছাড়া অন্য কোন স্বার্থ ছিল না। প্রশ্রয়দানের অযোগ্য এবং ভিত্তিহীন একটা আবেগকেই তারা মূলধন করেছেন।

নাথুরাম গড্‌সে এমন একজন মানুষ যার হাতে গান্ধীজি নিহত হন।

নাথুরাম লালকেল্লায় যে বিবরণ পেশ করেন, তা প্রকাশ করবার জন্য অবিরাম তাগিদ রয়েছে। এই বিবরণ সম্পর্কে এত আগ্রহের কারণ এই যে বহু বছর ধরে সব রাজ্যসরকারও বিবরণটির প্রকাশ আইনতঃ নিষিদ্ধ করে রেখেছিল। যে আইনের বলে এটি নিষিদ্ধ করে রাখা হয়েছিল, তা আজ আর বলবৎ নেই। গ্রন্থটি ভারতীয় বহু ভাষাতেই অনুবাদ করা হয়েছে। বাঙলা ভাষায় অনুবাদের দাবীও এসেছে অনেককাল থেকে।

গান্ধী-হত্যার পিছনে নাথুরামের যে সব যুক্তি ও কারণ বর্ত্তমান

ছিল—সেগুলির সঙ্গে পাঠকদের পরিচয় করিয়ে দেওয়াই এ গ্রন্থের লক্ষ্য। ইংরাজী ভাষাতেই নাথুরাম তার বিবরণ পেশ করেন এবং হত্যাকান্ডের জন্য তিনি নিজেকে অপরাধী বলেই স্বীকার করেন। কিন্তু লেখক তার সমগ্র চরিত্রকে মলিন করে আঁকবার যে চেষ্টা করেছেন এবং সারা দেশে তার সম্পর্কে যে ভুল বোঝার পরিমন্ডল গড়ে রাখা হয়েছে, এই তথ্যনিষ্ঠ বিবরণ তার অবসান ঘটিয়ে একটা স্বচ্ছতা সৃষ্টি করবে। সহজ সরল ঘটনাগুলি থেকে এবং এই অলঙ্কার বর্জিত ও বাহুল্যহীন বিবরণ থেকে পাঠকেরা নিজেরাই নিজেদের ধারণা গড়ে নিতে পারবেন। নাথুরাম থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে বলা যায়,

> 'ভবিষ্যৎ কালের সৎ ইতিহাস লেখকেরা আমার কাজকে যোগ্য মর্যাদায় বিচার করবেন এবং সত্যমূল্যে উপনীত হবেন।'

আমার মনে হয় কোন আলঙ্কারিক চাতুর্য্যে নয়—যারা নাথুরামের কাজকে বিকৃত করে ব্যাখ্যা করছেন, তাদের বিরুদ্ধে নাথুরামের এই বিবরণই হবে যোগ্য প্রতিবাদ; বিশেষতঃ তিনি যখন আর কোন গ্রন্থ রচনা করতে ফিরে আসছেন না, এখন এই বিবরণের গুরুত্ব অপরিসীম।

অন্তিম শয়নে গান্ধীজী

# ঘটনা-পরম্পরা ও অভিযুক্তেরা

॥ বিস্ফোরণ ॥

১৯৪৮ সালের ২০শে জানুয়ারী সন্ধ্যায় ভারতের রাজধানী নিউ দিল্লীর বিড়লা ভবনের প্রাচীরের ধার ঘেঁষে এক বিস্ফোরণ ঘটেছিল। জিনিসটা ছিল সাধারণ পেটো। প্রাচীরটার খানিকটা ক্ষতি হয়েছিল।

দিল্লীর এই বিড়লা ভবনে তখন গান্ধীজী বাস করছিলেন। ভবনের সামনের চত্তরে তিনি তার প্রার্থনা সভা চালাচ্ছিলেন।

দিল্লি এবং এ দেশের অন্যান্য অংশেরও আবহাওয়া তখন তপ্ত,[৩] মানসিকতাতেও ছিল চাপা উত্তেজনা। এর কারণ মাস কয়েক আগেই হিন্দুস্হানের অঙ্গ-ব্যবচ্ছেদ করা হয়েছে। 'স্হান' শব্দটির অর্থ তো ভূমি বা দেশ। হিন্দুস্হানের একটা অংশকে কেটে বার করে এনে সৃষ্টি করা হল ধর্মীয় শাসনভিত্তিক স্বাধীন মুসলমান রাষ্ট্র—পাকিস্হান, যার অর্থ হল পবিত্রভূমি। হিন্দুস্হানের অবশিষ্ট অংশ, যা একই সঙ্গে ব্রিটিশ শাসনের জোয়াল নামিয়ে স্বাধীন হল, তার নতুন নামকরণ হল 'ভারত'।

রাজনৈতিক দল হিসাবে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসই ছিল রাজনীতির পুরোভাগে। কংগ্রেসের নেতারা তখন হিন্দু-মুসলমান ঐক্য এবং ধর্মনিরপেক্ষতার অলীক কল্পনায়[৪] মত্ত ছিলেন। তাদের আগ্রহের এবং নীতিগত ঘোষণার ঠিক উল্টোটাই তারা করে বসলেন—হিন্দুস্হানের মাটির ওপরেই তারা এক ধর্মশাসিত মুসলমান রাষ্ট্র স্বীকার করে বসলেন। ওরা ছিলেন ভন্ড এবং এত নির্লজ্জ যে তাদের মতটাকে তারা একতরফা ভাবে হিন্দুদের ওপর চাপিয়ে দিল। নিজেদের এই পরাজয়টাকে ঢাকা দিতে তারা হিন্দুদের একটা 'জাতি'

বলেই স্বীকার করলেন না—স্বীকার করলেন সম্প্রদায় হিসাবে। তারা ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি [৫] একমাত্র তাদেরই রাষ্ট্র ভারতে জোর করে চালু করলেন।

এই যে 'ইণ্ডিয়া' (এই ইংরাজী নামেই আজও ভারত সূচীত হয়) শব্দটি, তা হচ্ছে হিন্দুস্থান শব্দেরই ব্রিটিশদের দ্বারা বিকৃত রূপ [৬]। আবার 'ভারত' শব্দটাও হিন্দুস্থানেরই এক প্রাচীন নাম। শব্দটি অবিভক্ত সমগ্র দেশটিরই দ্যোতনা সৃষ্টি করে। কিন্তু এ দেশে বসবাসকারী মুসলমানেরা পাছে আহত হন বা কোনক্রমে হিন্দুদের প্রাধান্য সূচীত হয়ে পড়ে এমন নামকরণকে এড়িয়ে যাওয়ার কথাই ভাবলেন নেতারা [৭]। এমনি করে বাস্তব ক্ষেত্রে ধর্মনিরপেক্ষতা হয়ে দাঁড়াল মুসলমান তোষণ।

দেশ-বিভাজনের তীব্র বেদনার পথরেখা ধরে এলো গণহত্যা, ধর্ষণ, তীব্র হিংস্রতা আর লক্ষ লক্ষ মানুষের গৃহহারা উদ্বাস্তু হওয়া।—এগুলিই সেই কালের সাধারণ নীতি হয়ে উঠল।

গান্ধী,—মহাত্মা বলেই তিনি সর্বলোকমান্য—এক মহান আত্মা—এই রাজনীতিতে এক সমুজ্জ্বল ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। হিন্দুদের মধ্যে যারা এই দেশ বিভাগের ফলে সমূহ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলেন এবং যারা ভ্রাতৃত্ববোধের দ্বারা তাদের দুঃখে সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন, তারা তার প্রতি বিক্ষুব্ধ হচ্ছিলেন। আর তাই বিড়লা ভবনের চতুর্দিকে বেশি করে পুলিশ মোতায়েন করা হচ্ছিল—তাকে যে কোন রকম আক্রমণ থেকে রক্ষা করবার জন্য।

১৯৪৮ সালের ২০শে জানুয়ারী যে বিস্ফোরণ ঘটে, তার আক্রমণের লক্ষ্য গান্ধী ছিলেন না।[৮] তিনি যে মঞ্চে বসেছিলেন, তা ছিল সেখান থেকে প্রায় এক শ' পঞ্চাশ ফুট দূরে। যাই হোক, পুলিশ পরে উদ্ঘাটন করে বসে যে এই বিস্ফোরণও গান্ধীকে উড়িয়ে দেবার মূল পরিকল্পনার অংশ ছিল।

মদনলাল পাওয়া ঐ দিনই ঘটনাস্থলে গ্রেপ্তার হয়। দেশ বিভাগের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হিন্দুদের মধ্যেই সে একজন। পুলিশ সংবাদ পেয়ে-

ছিল যে এই ষড়যন্ত্রে মদনলালের অন্য সহকারী ছিল। কিন্তু পরিকল্পনা ব্যর্থ হওয়ায় সহ-ষড়যন্ত্রীরা পালিয়ে যায়। পুলিশ সারা ভারতব্যাপী জাল বিস্তার করল। অন্য দিকে সরকার বিড়লা ভবনের নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করল আর পুলিশের সংখ্যা দিল বাড়িয়ে।[৯]

পরবর্ত্তী দশ দিনের মধ্যেও অন্যদের গ্রেপ্তার করবার ব্যাপারে পুলিশ আদৌ এগুতে পারল না।[১০] আকস্মিক ভাবেই ১৯৪৮ সালের ত্রিশে জানুয়ারী বিকেল পাঁচটায় গান্ধী যখন প্রার্থনা সভার মঞ্চে আসবার মাঝপথে এসেছেন, তখনই নাথুরাম গড্‌সে সামনাসামনি দাঁড়িয়ে গুলি করলেন তাকে। গান্ধীর মুখ দিয়ে একটা অতিমৃদু ও অস্ফুট 'আঃ' ধ্বনি বেরিয়ে এল,[১১] সম্ভবতঃ আকস্মিক তীব্র আঘাত ও জৈবিক প্রতিক্রিয়াতেই। তিনি মাটিতে পড়ে গেলেন। মুহূর্ত্তেই তিনি চেতনা হারালেন এবং মিনিট কুড়ির মধ্যে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন।[১২]

গুলি করেই নাথুরাম অস্ত্রশুদ্ধ হাত তুলে (আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে) দাঁড়াল এবং পুলিশকে ডাকল। পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করল।

তদন্তকে প্রধানতঃ বোম্বাই, দিল্লী ও গোয়ালিয়রের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখা হল।

॥ লালকেল্লা ॥

বিচারের কাজ চালাবার জন্য এক বিশেষ আদালত গঠন করা হল। শ্রীআত্মাচরণ অগ্রবাল, আই-সি-এস, বিচারপতি নিযুক্ত হলেন।

স্মরণীয় লালকেল্লাই বিচারালয়ের স্থান বলে স্থির করা হল। এটা বোধ হয় তৃতীয় ঐতিহাসিক বিচারানুষ্ঠান যা এখানে সংঘটিত হল। প্রথম বিচার ছিল[১৩] বাহাদুর শাহ জাফর ও অন্য অভিযুক্তদের। ১৮৫৭ সালে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে যারা স্বাধীনতার সংগ্রাম গড়ে তুলেছিল, এরা সকলেই ছিলেন তাদের দলভুক্ত। দ্বিতীয়টি ছিল ১৯৪৫ সালে। নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর নেতৃত্বাধীন ভারতীয় জাতীয়

বাহিনীর অফিসারদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছিল যে তারা দ্বিতীয় বিশ্ব মহাযুদ্ধের সময়ে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন।[১৪] তৃতীয়টিই ছিল এই গান্ধী-হত্যা মামলা।

এই অভিযুক্তদের রাখবার জন্য লালকেল্লার এক প্রাচীরের গায়ের ছোট ছোট কুটুরীকে জেলে পরিণত করা হল।

বারোজনকে নানা অভিযোগে অভিযুক্ত করা হল। তাদের মধ্যে তিনজন ছিল ফেরার। ১৯৪৮ সালের ২৭মে তারিখে আত্মাচরণের এজলাসে অবশিষ্ট ন' জনকে হাজির করা হল। তারা হলেন,

১। নাথুরাম গড্‌সে (৩৭)-পুনা।
২। নারায়ণ দত্তাত্রেয় আপ্তে (৩৪)-পুনা।
৩। বিষ্ণু রামকৃষ্ণ করকরে (২৭)-আহম্মদ নগর।
৪। মদনলাল. কে. পাওয়া (২০) বোম্বাই।
[আদি নিবাস ঃ মন্টেগোমারী জেলা, পাকিস্তান।]
৫। শঙ্কর কিস্টাইয়া (২০)-সোলাপুর।
৬। গোপাল বিনায়ক গড্‌সে (২৭)-পুনা।
৭। দিগম্বর রামচন্দ্র বাদগে (৪০)-পুনা।
৮। বিনায়ক দিগম্বর সাভারকর (৬৬)-বোম্বাই।
৯। দত্তাত্রেয় সদাশিব পারচুরে (৪৭)-গোয়ালিয়র।

ফেরার তিনজনের নাম হল,

১। গঙ্গাধর দন্ডবতে।
২। গঙ্গাধর জীধাও এবং
৩। সূর্যদেও শর্মা।

এরা সকলেই ছিলেন গোয়ালিয়রের লোক।

সাত নং অভিযুক্ত দিগম্বর বাদগে শেষ পর্যন্ত রাজসাক্ষী হয়ে যায়। আর তাই পরবর্ত্তী ক্রমিক সংখ্যার বি. ডি. সাভারকর ক্রমিক সংখ্যা পান সাত।

আগ্নেয়াস্ত্রধারী বিপ্লবী হিসাবে সাভারকরের এক উজ্জ্বল ও

আত্মত্যাগী অতীত ছিল। তার কথা অনুল্লেখিত রেখে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস কখনই সম্পূর্ণ হতে পারে না। বছর তের চৌদ্দ থেকেই তিনি স্বাধীনতার যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। 'আমাদের পবিত্র কর্ত্তব্যই স্বাধীনতা অর্জন'-এই ছিল তাঁর বীজমন্ত্র। 'ভারতবর্ষের কাঁধের ওপর ব্রিটিশ শাসনের জোয়াল চাপিয়ে রাখা অস্বাভাবিক এবং নীতিবিরুদ্ধ আর যে কোন উপায়ে সেই জোয়াল নামিয়ে দেওয়াই যুক্তিযুক্ত।'—এই ছিল তাঁর দীক্ষার মন্ত্র। [ইটালীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের দীপ্ততম পুরুষ জোসেফ ম্যাজিনীর তত্ত্ব বর্ণনা করে তিনি ভারতীয় যুবকদের স্বপ্নে উদ্দীপ্ত করে তুলতেন।] ১৮৫৭ সালের অভ্যুত্থান যে শুধুমাত্র সিপাইদের বিদ্রোহ নয়, তা ছিল ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম—একথা তিনিই প্রথম উচ্চারণ করেন—যদিও ইংরেজরা আমাদের উল্টো কথাই শিখিয়েছিল।

রাজদ্রোহের অপরাধে তাকে দু-দুবার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর বাসের দণ্ড দেওয়া হয়েছিল। দণ্ড দুটি যাপন হবে একযোগে নয়—পর পর। ১৯১০ সালে দন্ডভোগ শুরু হয়। ১৯৩৭ সালে তাকে মুক্তি দেওয়া হলেও কতকগুলি বিধিনিষেধ চাপিয়ে রাখা হয়।

এই সময়ের মধ্যে গান্ধীর নেতৃত্বে কংগ্রেস মুসলমান তোষণের নীতিতে উল্লেখযোগ্যভাবে এগিয়ে যায়।

জনসাধারণ সাভারকরকে 'স্বতন্ত্রবীর' উপাধিতে ভূষিত করেছিল—স্বাধীনতার দীপ্ত ব্যক্তি। তিনি আবার রাজনীতিতে যোগ দেন এবং 'হিন্দু-মহাসভা'র নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। হিন্দু সমাজকে যোগ্য মর্যাদা ও সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠার সঙ্গে স্বাধীনতা অর্জনের সংগ্রাম ছিল এই সভার লক্ষ্য।

তিনি দেশ-বিভাজন ছাড়াই স্বাধীনতালাভের ওপর জোর দিতেন এবং দেশ বিভাগ এড়াতে মুসলমান তোষণ নীতি থেকে দূরে থাকতে বলতেন। ব্রিটিশদের অধীনে হলেও সৈন্যদলে যোগ দিতে বলতেন তিনি। কারণ সৈন্যদলে যোগদান আমাদের সামনে অস্ত্র ব্যবহারের সুযোগ এনে দিত। তিনি যুবকদের উপদেশ দিতেন, অস্ত্র-ব্যবহার

করতে শিখে প্রস্তুত হয়ে থাকতে যাতে সময় এলেই স্বাধীনতালাভের জন্য তা ব্যবহার করা যায়। বীর সাভারকরের এই বৈপ্লবিক উন্মাদনাই নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর প্রেরণা ছিল। এ সংবাদ খুব কম লোকেই জানেন যে ব্রিটিশ জোয়াল ছুঁড়ে ফেলতে সশস্ত্র আক্রমণের পরিকল্পনা নিয়ে এই দুই নেতার মধ্যে আলোচনা হয়েছিল। সুভাষচন্দ্র পরে এই আক্রমণেই ব্রতী হন। বিপ্লবী রাসবিহারী বসু যিনি পালিয়ে জাপানে চলে যান এবং সেখানে হিন্দু মহাসভার সভাপতি ছিলেন—তিনিই ছিলেন এদের সংযোগ সূত্র। একথাও অনেকেই জানেন না যে রাসবিহারী যখন বিদেশে তখনও বীর সাভারকর তাঁর পুরোন সহকর্মীর সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলতেন।

প্রকৃত দেশ বিভাজনের অনেক আগে থেকেই সাভারকর জনসাধারণকে সতর্ক করে দিতে থাকেন যে প্রধান রাজনৈতিক দলটি অর্থাৎ ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস শুধু মুসলমান তোষণের জন্য জনগণকে দুই দলে ভাগ করে দেবে এবং তার পরেও অবশিষ্ট ভারতেও মুসলমান তোষণ করতে থাকবে। এটা তারা করবে হিন্দুদের আইনসঙ্গত অধিকারগুলিকে দলিত করে।

এই দুই পরস্পর বিরোধী মতাদর্শ নিয়ে অবিরাম টানাটানি ও দ্বন্দ্ব চলছিল। গান্ধীজী এবং কংগ্রেস 'সহিংসপন্থী' বলে বিপ্লবীদের ধিক্কার দিতেন এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের হাত থেকে দেশমুক্তির উপায় ও পদ্ধতির শুচিতার কথা বলতেন। লোকমান্য তিলক বেঁচে থাকতেই দৃষ্টিভঙ্গির এই পার্থক্য ধরা পড়েছিল। গীতাকে ব্যাখ্যা করবার একটা নিজস্ব দৃষ্টি ছিল গান্ধীজীর। তিলকের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তা পৃথক ছিল। কোন মহৎ কাজে হিংসার পথকে তিলক অনাসক্তির বিরুদ্ধ ভাবতেন না। অরবিন্দের মতই তিলকও জাতি এবং ধর্মকে সমার্থক ভাবতেন।[১৫] কিন্তু গান্ধীজী এই সুদৃঢ় মত পোষণ করতেন যে যিনি অনাসক্তি লাভ করতে চান, অহিংসা তার পক্ষে অত্যাবশ্যক পূর্বসূত্র।

তিলক আর সাভারকর সমমত পোষণ করতেন। প্রকৃতপক্ষে

সাভারকর তিলক থেকে এক ধাপ এগিয়ে ছিলেন। তিনিও প্রবীনদের কথিত জ্ঞানের অন্তরতম অংশকেই তার মূল কর্মনীতি বলে মনে করতেন। তবে ততখানিকেই তিনি মানতেন যা বর্ত্তমান পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খেত। তিনি মনে করতেন গীতাকে আক্ষরিক অর্থে জড়িয়ে নেবার প্রয়োজন নেই, সময়ের পরিবর্ত্তনের পরিপ্রেক্ষিতে বরং আক্ষরিক অর্থকে অতিক্রম করেই যেতে হবে। যা প্রাসঙ্গিক তাকে গ্রহণ করতে হবে এবং প্রয়োগ করতে হবে। কিন্তু যা আজকের মানবজাতির অগ্রগতির প্রতিবন্ধক—তা কাল-দোষে দুষ্ট, তা পরিত্যাজ্য। তাঁর কাছে হিন্দুস্থানের স্বাধীনতা ছিল প্রধান কর্ত্তব্য, আর তাকেই তিনি সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিতেন। তিনি জনসাধারণকে মহান আত্মজ্ঞান এবং বিপ্লবীদের শহীদত্ব বরণের মানসিকতাকে সম্মান দেখাতে শিখিয়েছিলেন—আপাতদৃষ্টিতে একে সহিংস কাজের প্রতি সমর্থনকেই বোঝায়। দেশের স্বাধীনতার জন্য এই বৈপ্লবাত্মক পন্থা এবং বিপ্লবীদের প্রতি গান্ধী বারংবার বিরূপতা দেখিয়েছেন।

সাভারকর কয়েকটি জাতীয় নীতির স্বপক্ষে ছিলেন। জাতীয় স্বার্থের দিকে তাকিয়েই তিনি গান্ধী ও কংগ্রেসের মুসলমান তোষণ নীতির বিরোধিতা করেছেন। কংগ্রেস সরকার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত সরকারী মামলা পরিচালকের পক্ষে তাই সাভারকরকে অন্যতম হত্যাকারী স্থির করা সহজ ছিল।

এই মামলার অন্য আসামীরাও দেশ বিভাগের তীব্র বিরোধী ছিলেন। কংগ্রেস যে ধ্বংসাত্মক যুক্তি ও একনায়কোচিত ভঙ্গিতে দেশের লোককে গিলতে বাধ্য করছিল—তারও বিরোধী ছিল তারা। আসামীরা বীর সাভারকরের সুদৃঢ় সমর্থক ছিলেন। তারা একথা এক মুহূর্ত্তের জন্যও অস্বীকার করেন নি, সাভারকরও অস্বীকার করেননি যে অভিযুক্তেরা ছিলেন তার ভক্ত। এ ব্যাপারটাও সরকারী উকিলকে ধোঁয়াটে কল্পনায় ভরা গল্প বানাতে এবং তৃতীয় শ্রেণীর উড়ো প্রমাণ সাজিয়ে প্রতিষ্ঠা করতে সাহায্য করেছে যে সাভারকরের আশীর্বাদ নিয়ে মহাত্মাকে হত্যা করা হয়েছে।[১৬]

প্রকৃতপক্ষে এটা একটা ভাগ্যের পরিহাস। দেশ বিভাজন করে যারা বিপুল ধ্বংস এবং লক্ষ লক্ষ লোকের বিভৎস মৃত্যুর জন্য দায়ী' গণবিরোধী কাজের জন্য যাদের এই কাঠগড়ায় টেনে আনা উচিত ছিল, তারাই আজ ক্ষমতা দখল করে আছেন আর যারা মহান দেশপ্রেমিক তাদের তোলা হয়েছে কাঠগড়ায়।

অভিযুক্ত দুই। নারায়ণ আপ্তে, বি এস-সি, বি, টি। তিনি ছিলেন শিক্ষক। তিনি বাড়িতেও পড়াতেন। তিনি আহম্মদ নগরে থাকতেন। আহম্মদ নগর জেলা শহর। পুনা থেকে ৭০ মাইল দূরে অবস্থিত। অভিযুক্ত তিন, কারকারেও ওখানে থাকতেন। তারা দুজনে পরস্পরের সান্নিধ্যে এসেছিলেন। কারণ তাদের সম আকর্ষণের একটি ক্ষেত্র ছিল। তা হল 'হিন্দু-সংগঠন' নামে এক হিন্দু প্রতিষ্ঠান। যুবকদের আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার শিক্ষা দেবার জন্য আপ্তে একটা রাইফেল ক্লাবেরও প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

হিন্দু-সংগঠনের কর্মপদ্ধতি ও নীতি প্রচারের জন্য ১৯৪৪ সালের শেষ দিকে আপ্তে এবং নাথুরাম একত্রে পুনা থেকে 'হিন্দুরাষ্ট্র' নামে মারাঠী ভাষায় এক দৈনিক সংবাদপত্র প্রকাশ করতে শুরু করেন। ১৯৪৮ সালের ৩০শে জানুয়ারীই এই পত্রিকার শেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয়। তাতে গান্ধী হত্যার সংবাদ পরিবেশন করে হত্যাকারী হিসাবে পত্রিকারই সম্পাদক নাথুরামের নাম ঘোষণা করা হয়।

আপ্তে এবং নাথুরাম গড্‌সে হিন্দু মহাসভার পতাকার তলায় পাঁচ থেকে ছ'বছর একত্রে কাজ করেছিলেন। ১৯৪৮-এর ২০শে জানুয়ারী এবং ৩০শে জানুয়ারী দিল্লীতে অকুস্থলে উপস্থিত ছিলেন। বাদীপক্ষ তাকে এই ষড়যন্ত্রের 'নেপথ্য-মস্তিষ্ক' বলে বর্ণনা করেন। জাতীয়-সংহতিকে তারা জীবনের চেয়েও প্রিয় বলে ভাবতেন। তাই নাথুরাম গড্‌সে এবং আপ্তে সেই প্রিয়তম জাতীয় সংহতির জন্য হাতে হাত রেখে, কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে মুখে 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি উচ্চারণ করতে করতে আত্মদানের জন্য প্রস্তুত হয়েছিলেন।

আপ্তে ছিলেন সুপুরুষ। তিনি ছিলেন বিবাহিত। তাঁর এক

পুত্র সন্তান ছিল। আপ্তের ফাঁসি হবার পরে বারো বছর বয়সে এই বালকের মৃত্যু হয়।

আহম্মদাবাদে বিষ্ণু কারকারের একটা হোটেল ছিল। সেখানে থাকা এবং খাওয়া দুয়েরই ব্যবস্থা ছিল। তিনি একজন সক্রিয় রাজনৈতিক কর্মী ছিলেন। বঙ্গদেশের (বর্ত্তমানে বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্ত) নোয়াখালি যখন স্থানীয় হিন্দুদের কসাইখানায় পরিণত হয়, তখন কারকারে দশজনের এক দল নিয়ে সেখানে গিয়েছিলেন। তিনি সেখানে হিন্দুদের প্রতিরোধের জন্য সংগঠিত করেন এবং তাদের প্রতিরক্ষায় জঙ্গী মনোভাব গ্রহণ করেন। হিন্দু মহাসভার পতাকার তলে তিনি অসংখ্য আশ্রয়-শিবির গড়ে তোলেন। এসব ১৯৪৬-৪৭ সালের ঘটনা। ২০শে ও ৩০শে জানুয়ারী তিনি দিল্লীতে অকুস্থলে উপস্থিত ছিলেন।

কারকারে বিবাহিত ছিলেন কিন্তু তাদের কোন সন্তান ছিল না।

মদনলাল, যে একখণ্ড পেটো মেরে বিস্ফোরণ ঘটিয়েছিল, সে ছিল একজন উদ্বাস্তু। নৃশংস হত্যাকাণ্ড, লুট ও অগ্নিসংযোগের আতঙ্কের ঘটনা সমূহের প্রত্যক্ষদর্শী ছিল সে। নিজের গৃহ ও আশ্রয় থেকে বিতাড়িত লক্ষ লক্ষ মানুষের মাইলের পর মাইল বিস্তৃত পদযাত্রা সে দেখেছিল। তারা আসছিল ভারতে আশ্রয়ের আশায়। তার এই তিক্ত ও করুণ অভিজ্ঞতার কথা সে তার বিবৃতিতে জানিয়েছিল আদালতকে।

সেও ছিল বিবাহিত।

শঙ্কর কৃষ্টাইয়া, পাঁচ নম্বর আসামী, ছিল অবিবাহিত। রাজসাক্ষী হয়েছিল যে দিগম্বর বাদগে তার অধীনে কাজ করত শঙ্কর। ১৯৪৮ সালের ২০শে জানুয়ারী অকুস্থলে সে হাজির ছিল।

গোপাল গড্‌সে ছিলেন নাথুরাম গড্‌সের ভাই। এই মামলার তিনি ছিলেন ছয় নং আসামী। তিনি সরকারী সামরিক অস্ত্রাগারে কাজ করতেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে তিনি সমুদ্র পেরিয়েও নানাদেশে গিয়েছিলেন। ফিরে এসে পুনার কাছেই খড়কি ডিপোতে নিযুক্ত

ছিলেন। ২০শে জানুয়ারী তিনি বিড়লাভবনে উপস্থিত ছিলেন বলে ষড়যন্ত্রের সঙ্গে তাঁকে জড়িয়ে দেওয়া হয়। তিনি বিবাহিত। তাঁর দুই কন্যা।

দিগম্বর বাদগে ছিলেন একজন হিন্দু সাংগঠনিক। তিনি ছিলেন অস্ত্র ব্যবসায়ী। তার একটা দৃঢ়মূল ধারণা ছিল যে, যে সমস্ত ক্ষুদ্র এলাকায় হিন্দুরা সংখ্যালঘু ছিল, সে সব এলাকার হিন্দুদের সশস্ত্র করে তুলতে হবে, মুসলমানরা আক্রমণ করলে তারা যেন প্রতিরোধ করতে পারে। বাদীপক্ষ দাবী করেছিল যে, মদনলালকে পেটোটি বাদগেই সরবরাহ করেছিল। মদনলালের কাছ থেকে একটা হাতবোমাও উদ্ধার করা হয়েছিল। বাদগের কাছ থেকেও আরো কিছু অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধার হয়েছিল। ২০শে জানুয়ারী দিল্লীর ঘটনাস্থলে সে উপস্থিত ছিল।

ডি. এস. পারচুরে ছিলেন আট নম্বর আসামী। তিনি একজন চিকিৎসক ছিলেন। তিনি গোয়ালিয়রে চিকিৎসা করতেন। তিনি একজন উপযুক্ত হিন্দু সংগঠক ছিলেন। তিনি মুসলমান আক্রমণকে প্রতি-আক্রমণে প্রতিহত করেছেন। নাথুরাম তার কাছ থেকেই পিস্তলটা পেয়েছিল বলে তাকে অভিযোগে জড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। অত্যাচার করে তার কাছ থেকে এ বিষয়ে একটা স্বীকৃতিপত্রও আদায় করা হয়েছিল। তিনি বিবাহিত ছিলেন এবং সপরিবারে নিজ গৃহেই বাস করতেন।

**॥ শুনানী ॥**

অভিযুক্তেরা আইনজ্ঞ পরামর্শদাতা নিযুক্ত করেছিলেন। কিন্তু অভিযোগের উত্তর তাদের নিজেদেরই দিতে হয়েছিল আর তা তারা করেছিলেন। তা করবার আগেই তারা লিখিত প্রতিবেদন পেশ করেছিল।

নাথুরাম তার লিখিত প্রতিবেদনে, বিশেষতঃ তার দ্বিতীয় অধ্যায়ের এবং পরবর্ত্তী অংশে, তিনি কেন যে গান্ধী হত্যার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, তা বর্ণনা করেছিলেন। বাদীপক্ষ বিষয়টা আগেই জেনে

ফেলেছিল আর তাই আগে ভাগেই ঐ প্রতিবেদন পাঠের বিরুদ্ধে এক আপত্তি তুলেছিল। কিন্তু বিচারক তা খারিজ করে দেন।

প্রতিবেদনটি পাঠ করা হয়েছিল এবং পরদিন পত্রিকায় তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকাশিত হয়েছিল।

কিন্তু সরকার একে অবহেলার চোখে দেখলেন না। তাতে আদালতের সর্বোচ্চ ক্ষমতাকে টলান গেল না। কর্তৃত্বের দৃঢ় হাতে তারা এই প্রতিবেদন পূর্ণতঃ বা অংশতও পুনর্মুদ্রণ আইনতঃ নিষিদ্ধ ( ব্যান্ ) করেছিলেন।

সরকারের এই মনোভাবের কারণ ছিল স্পষ্ট। নাথুরামের বিবরণে গান্ধীকে যে ভাবে উলঙ্গ করে দেওয়া হয়েছিল তা সর্বসাধারণে প্রকাশ হয়ে পড়ুক এটা সরকার চান নি। তারা চেয়েছিলেন হত্যাকারী নাথুরামের বিরুদ্ধে যে ধিক্কারের মানসিকতা জমে উঠছিল, তা জমতে থাকুক, সত্য চাপা পড়ুক। তাদের নিজস্ব চিন্তাধারায় হয়ত এটাই ছিল মহাত্মার স্মৃতির প্রতি যথাযুক্ত [১৭] সম্মান প্রদর্শন।

সরকারের এ কাজে কেউ প্রতিবাদ করে নি—বিচারের আবেদনও জানায় নি। যতদিন পর্যন্ত আইন না রোধ হয়েছে, ততদিন পর্যন্ত বছরের পর বছর বলবৎ থেকেছে এই নিষেধাজ্ঞা। প্রায় তিন দশক ( ত্রিশ বছর ) কেটে যাবার পর এই প্রতিবেদন প্রথম সাধারণের হাতে পেঁছাল।

নিজের মামলা নিজেই সওয়াল করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন নাথু-রাম। হত্যার অভিযোগে তাকে যে শাস্তি দেওয়া হয়েছিল তার বিরুদ্ধে তিনি কোন আপত্তি তোলেন নি। তার এই বিবরণ অবিকৃত-ভাবে প্রকাশের স্বাধীনতা প্রেসকে দেওয়া হয় নি।

### ॥ বিচারের রায় ॥

বাদীপক্ষ ১৪৯ জন সাক্ষী হাজির করেছিল। ১৯৪৮ সালের ৩০ ডিসেম্বর শুনানী শেষ হয়। রায়দান স্থগিদ থাকে। ১৯৪৯ সালের ১০ ফেব্রুয়ারী রায় পাঠ করা হয়।

বীর সাভারকরকে বেকসুর খালাস দেওয়া হয়।

সহ অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে রাজসাক্ষী হওয়ায় দিগম্বর বাদগেকে ক্ষমা করা হয় এবং মুক্তি দেওয়া হয়।

বিষ্ণু কারকারে, মদনলাল পাওয়া, গোপাল গড্‌সে, শঙ্কর কিস্টাইয়া এবং ডাঃ পারচুরেকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ভোগ করতে হয়।

নাথুরাম গড্‌সে এবং নারায়ণ আপ্তেকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছিল।

রায়দান সমাপ্ত হতে না হতে জনপূর্ণ আদালতগৃহ অভিযুক্তদের স্বতঃস্ফূর্ত ও বজ্রদীপ্ত ধ্বনিতে পূর্ণ হয়ে উঠল—

অখণ্ড ভারত—অমর রহে।

বন্দে-মাতরম্‌।

স্বতন্ত্রীয় লক্ষ্মী কী জয়।

**॥ বিশেষ আইনের বৈশিষ্ট্য ॥**

তথাকথিত গণতান্ত্রিক কাঠামোতে গঠিত সরকারের কাছ থেকে গান্ধী সার্বভৌমত্ব ভোগ করতেন। 'বোম্বাই জন-নিরাপত্তা বিধায়ক আইন' নামে একটা আইন আগে বোম্বাই এলাকায় চালু ছিল। এই বিচারের জন্য বিশেষ আদালত গঠন করবার আগেই এই আইনের এলাকাকে বাড়িয়ে দিল্লীকে তার আওতায় আনা হল। অনেকখানি অতীতকালকেও এই আইনের আওতায় এনে আদেশ জারি করা হয়েছিল।[১৮] এমনি করেই বিচার শুরু হল।

'আইনের চোখে সবাই সমান' এবং এই রকম আরও অনেক মৌলিক নাগরিক অধিকার থেকে সর্বসাধারণকে এই আইনদ্বারা বঞ্চিত করা হল। তখনও ভারতের সর্বোচ্চ আদালত গঠিত হয় নি। তাই এই ক্ষমতা বহির্ভূত আইনজারী করা সম্ভব হয়েছিল। যেহেতু আইনটি বলবৎ হওয়ার কালকে পিছিয়ে দিয়ে শুরু করা হয়েছিল, তাই আসামীরা অনেক সুযোগ হারিয়েছিল।

সাধারণ আইনে মৃত্যুদণ্ডাদেশকে উচ্চ আদালতকে দিয়ে অনু-

মোদন করিয়ে নিতে হয়। কিন্তু এই বিশেষ আইনের বলে তা করবার দরকার ছিল না। সাধারণ আইনে পুনর্বিচার (অ্যাপীল) চাইবার আবেদন পেশ করবার জন্য ষাট বা নব্বুই দিন সময় দেওয়া হয়—এ আইনে তা বাতিল করে সময় দেওয়া হল মাত্র পনের দিন।

॥ **পুনর্বিচারের আবেদন** ॥

সাতজন দন্ডাদেশ-প্রাপ্ত আসামীই জেল কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে লাহোর হাইকোর্টের কাছে পুনর্বিচারের আবেদন জানালেন। আগে লাহোরেই ছিল উচ্চ আদালত। এই শহরটির পূর্ব নাম ছিল লবপুর। শ্রীরাম-চন্দ্রের শক্তিমান পুত্র লবের নামানুসারে এই শহরের নামকরণ হয়েছিল। কিন্তু ভাগ্যের বিচিত্র পরিহাসে এ শহরটি পড়েছিল পাকিস্থানে এবং হয়েছিল সে রাষ্ট্রের এক অপরিহার্য শহর। ফলে আদালতটিও উদ্বাস্তু হয়ে পড়েছিল। ব্যবচ্ছেদিত ভারতের সিমলা শহরে এসে আশ্রয় নিয়েছিল আদালতটি।[১৯]

নাথুরাম স্থির করলেন যে হত্যা অভিযোগের দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে নয়—ষড়যন্ত্র করা এবং অন্যান্য অভিযোগের দন্ডাদেশের বিরুদ্ধে তিনি পুনর্বিচারের আবেদন জানাবেন। তিনি তার নিজের মামলার সওয়াল নিজেই করবার অনুমতি চাইলেন—আবেদন মঞ্জুর হল। সে সময় সব দন্ডাদেশ-প্রাপ্ত আসামীকেই লালকেল্লার বিশেষ জেল থেকে আম্বালার জেলে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল। নাথু-রামকে নিয়ে যাওয়া হ'ল সিমলায়। সেখানে তাকে রাখা হ'ল এক বিশেষ জেলে। অন্য আসামীদের মামলা লড়লেন তাদের আইনজীবিরা।

বিচারপতি ভান্ডারি, আছরুরাম এবং খোসলা জে. জে. এই পুন-র্বিচার ১৯৪৯ সালের মে জুন মাসে শুনলেন। তারা ১৯৪৯ সালের ২২শে জুন তাদের রায় দিলেন।

বিষ্ণু কারকারে, গোপাল গড্‌সে এবং মদনলাল পাওয়ার দন্ডাদেশ বহাল রইল।

বিচারকেরা নারায়ণ আপ্তের মৃত্যুদণ্ডাদেশকেও বহাল রাখলেন। নাথুরামের ফাঁসির হুকুম আপনা থেকেই বহাল হয়ে গেছিল।

## ॥ হত্যাকারীর পার্শ্বচিত্র ॥

অনিবার্য ভাবেই উচ্চ আদালত নাথুরামের আচরণ ও দক্ষতায় বিমুগ্ধ হয়েছিল। বিচার বিবরণ লিপিবদ্ধ করতে গিয়ে এ কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। বিচারপতি আছরুরাম বলেছেন,

'পুনর্বিচার প্রার্থীদের মধ্যে একমাত্র নাথুরাম বিনায়ক গড্‌সেই ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ ধারায় তাকে যে দণ্ডাদেশ দেওয়া হয়েছে তার বিরুদ্ধে যৌক্তিকতা দাবী করেন নি, যৌক্তিকতার দাবী করেন নি তার বিরুদ্ধে হত্যাপরাধের দন্ড হিসাবে ফাঁসির হুকুমের বিরুদ্ধে। তার বিরুদ্ধে আনীত এবং প্রমাণিত অন্য অভিযোগগুলির বিরুদ্ধেই তিনি পুনর্বিচার দাবী করেন এবং আদালতে তার সওয়াল সীমাবদ্ধ রাখেন—তিনি নিজেই তার পুনর্বিচারে সওয়াল করেছেন, আর আমি নিশ্চয়ই বলব, তথ্যাদির দ্বারা প্রমাণ স্থাপনের নিপুণ যোগ্যতার এমন এক অবিসংবাদী কৃতিত্ব তিনি দেখিয়েছেন যা যে কোন বিচার কার্যকেই সুসমাধিত করতে সাহায্য করে।'

নাথুরামের চিন্তন শক্তির সম্পর্কে এই বিচারক মন্তব্য করেছেন,

'যদিও তিনি ম্যাট্রিক পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়েছিলেন তবু তিনি ছিলেন বহুপঠিত মানুষ। পুনর্বিচারের সওয়াল করতে গিয়ে তিনি তার সুউচ্চ ইংরাজী ভাষা-জ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন। দিয়েছেন স্বচ্ছ চিন্তাশক্তির উল্লেখযোগ্য পরিচয়।'

সওয়ালের মধ্যে একস্থানে নাথুরাম ১৯৪৮ সালের ২০শে জানুয়ারী বিড়লাভবনে তিনি ছিলেন না বলে জানিয়েছেন। বিচারকেরা তা নাকচ করে দিয়েছেন। কেন তারা এই আপত্তি নাকচ করলেন, তার কারণ দেখাতে গিয়ে তারা নাথুরামের প্রবল ইচ্ছা-শক্তি সম্পর্কে, তাদের পর্যবেক্ষণের ফল জানিয়েছেন। শ্রীআছরুরাম বলেন,

'যে পাঁচ সপ্তাহ ধরে পুনর্বিচারের শুনানি হচ্ছিল, বিশেষতঃ যে আট ন দিন ধরে নাথুরাম নিজের মামলার সওয়াল নিজেই করলেন, সেই দিনগুলোতে আমরা তাকে যথেষ্ট চিনবার সুযোগ পেয়েছিলাম

আর আমি ত কল্পনাও করতে পারি না যে তাঁর মত ক্ষমতাবান লোক এ ধারণাকে ( নিজেকে নেপথ্যে গুপ্ত করে রাখা ) প্রশ্রয় দিতে পারে।'

॥ **নিরপরাধ** ॥

বিচারপতি খোসলা অবসর নেবার পর তার মনের পর্দায় ভেসে ওঠা বিচারালয়ের স্মৃতিচিত্র আঁকতে গিয়ে বলেছেন,

'আত্মপক্ষ সমর্থন করতে গিয়ে নাথুরাম গড্‌সে যে ভাবে তার বক্তব্য উপস্থিত করেছিলেন, সেটাই ছিল সেই পুনর্বিচার পর্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও উজ্জ্বল দিক। বেশ কয়েক ঘন্টা ধরে তিনি বলেছিলেন। প্রথমেই তিনি বলেছিলেন এই মামলার ঘটনা সমূহ, তারপর যে মানসিকতা তাকে মহাত্মা গান্ধীর জীবন হরণের সিদ্ধান্তে উপনীত করেছিল।—

'দর্শনে ও মননে শ্রোতারা অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন। তিনি যখন বক্তব্য পেশ করে থামলেন, তখন আদালতে ছিল গভীর নীরবতা। উপস্থিত নারীরা অঝোরে কাঁদছিলেন, পুরুষেরা ধরে আসা গলা ঝেড়ে নিচ্ছিলেন বা পকেটের ভেতরে হাতড়াচ্ছিলেন রুমাল। সেই নৈঃশব্দ আরও অর্থবহ হয়ে উঠেছিল চাপা দীর্ঘশ্বাস আর অস্ফুট কাশির শব্দে।

'যে ভাবেই হোক, আমার কোন সন্দেহ নেই যে সেদিনকার দর্শকদের যদি জুরির আসনে বসান হ'ত অথবা গড্‌সের পুনর্বিচারের আবেদনের সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়ার দায়িত্ব দেওয়া যেত তবে বিপুল সংখ্যা গরিষ্ঠতায় তারা এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হতেন যে নাথুরাম নিরপরাধ।'

দিল্লীতে লালকেল্লায় বিশেষ আদালতে নিজের মামলার সওয়াল করবার সময় বিচারপতি আত্মাচরণের সামনেও নাথুরাম একই রকম দক্ষতার ( শক্তির ) পরিচয় দিয়েছিলেন।

॥ **ফেরারী আসামী** ॥

ডঃ পারচুরে দণ্ডিত হবেন কি খালাস পাবেন, তারই ওপর ফেরারী আসামীদের ভাগ্য নির্ভর করছিল। ডঃ পারচুরে বেকসুর মুক্তি পেলে

ফেরারী তিনজন গোয়ালিয়রে এক জেলাশাসকের সামনে হাজির হয়। তারা তিনজনই মুক্তি পান।

॥ তখনকার জরুরী অবস্থা ॥

নাথুরামের যুক্তিপূর্ণ বক্তব্য শুনে উচ্চ আদালতেও সাংবাদিকেরা তার প্রতি শ্রদ্ধায় অভিভূত হয়েছিলেন। তার আবেগদীপ্ত আবেদনের সঙ্গে মিশেছিল উত্তেজক যুক্তি। তার কণ্ঠে ছিল এক বিরল ধরনের মানসিক স্থৈর্যের প্রকাশ। স্বাভাবিক ভাবেই সংবাদপত্রীরা আকৃষ্ট হয়েছিলেন। তাদের প্রতিনিধিরা যথাযথ লিখে নিয়েছিলেন। কিন্তু বিচারকেরা তাদের কক্ষে ফিরে যেতে না যেতে পুলিশ লাফিয়ে পড়ল সংবাদপত্রের প্রতিনিধিদের ওপর এবং তাদের লিপিপত্র ছিনিয়ে নিল। এতেই থামল না তারা। তারা লিপিপত্রগুলি ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলল আর নাথুরামের বক্তব্যের সত্য বিবরণ প্রকাশিত হলে ভয়াবহ পরিণামের হুমকি দিতে থাকল সংবাদপত্রীদের। পত্র-পত্রিকার দলকে সবলে সরকারী নির্দেশের কাছে নতিস্বীকার করান হল। ফলতঃ সংবাদপত্রগুলিতে প্রকাশিত হল অসংলগ্ন এবং বিকৃত সংবাদ।

কিছু সংবাদপত্রে ঘটনাটিকে যথার্থ পরিপ্রেক্ষিতে মূল্যায়ন করে প্রবন্ধ লিখিত হয়েছিল। এটাও হয়েছিল ফাঁসির দণ্ডাদেশ কার্যকর হবার পর। তবু ঐ পত্রিকাগুলিকে কড়া পাহাড়ায় রাখা হয়েছিল, নানাভাবে বিড়ম্বিত করা হয়েছিল তাদের। সত্যের প্রতি ভালবাসার বদলে সরকার দেখালেন আতঙ্ক-বাতিক। যদিও সরকার নিজেকে গান্ধীবাদী বলে বর্ণনা করতেন তবু এসব কাজে বৈপরীত্যটা ছিল স্পষ্ট।

॥ দণ্ডাদেশ প্রতিপালন ॥

১৯৪৯ সালের ১৫ নভেম্বর বুধবার অর্থাৎ গুলি ছোঁড়ার ঘটনার সাড়ে একুশ মাস পর সকাল আটটায় আম্বালা জেলে নাথুরাম গড্‌সে এবং নারায়ণ আপ্তের ফাঁসির দণ্ডাদেশ কার্যকর করা হয়।

এদের আচার আচরণ সম্পর্কে বেশ কয়েকটি বিবরণ প্রকাশিত হয়েছে। তাদের মধ্যে অনেকগুলিই বিকৃত। এই লেখক কারকারে ও মদনলালের সঙ্গে মৃত্যুদণ্ডাদেশ প্রতিপালনের কুড়ি মিনিট আগে পর্যন্ত হতভাগ্যদের সঙ্গে ছিলেন। দুজনকেই স্থির, অটল এবং বুদ্ধিদীপ্ত দেখাচ্ছিল। সেই শান্তভাব দেখাতে তাদের যে কোন বাড়তি চেষ্টা করতে হচ্ছিল, তা মনে হচ্ছিল না। তাদের মুখমণ্ডলে লেগে ছিল অচঞ্চলতা এবং প্রশান্তির স্পর্শ। তারা কথা বলছিলেন, খুনসুটি করছিলেন কখনও নিজেদের মধ্যে, কখনও জেলের কর্ম্মীদের সঙ্গে, কখনও আমাদের সঙ্গে।

আমরা সবাই মিলে খেলাম চা আর কফি। যখন সিপাইটি কফির ট্রে বয়ে নিয়ে এল, তখন নাথুরাম পাশে দাঁড়িয়ে থাকা সুপারিনটেনডেণ্ট শ্রী অর্জুন দাসের দিকে তাকিয়ে হাসলেন।

হাসি ফিরিয়ে দেবার মত মানসিকতা অর্জুন দাসের ছিল না। কয়েক মিনিট পরেই তিনি এই দণ্ডপ্রাপ্ত আসামীদের মেরে ফেলতে চলেছেন। তিনি এটাকে তার জীবনের দুর্ভাগ্য বলে গ্রহণ করলেন।

এই দু'জনের সঙ্গে তার বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল। তিনি তাদের কাছে বসতেন এবং দীর্ঘ সময় ধরে গল্প করতেন। ঘটনাগুলোর সম্পর্কে তাঁর রাজনৈতিক উপলব্ধি ছিল। তিনি দুজনেরই জাতীয় সংহতির মনোভাব জানতেন। তা যদি নাই হবে, তিনি ভেবেছিলেন, তবে হাজার মাইলেরও বেশি দূরবর্ত্তী পাঞ্জাব যখন বিধ্বস্ত হচ্ছিল, তখন মহারাষ্ট্র নিবাসী এই মানুষ দু'টি ভেঙে পড়বেন কেন? না হলে কেনই বা ছিন্নমূল মানুষগুলোর জন্য তারা বেদনাবোধ করবেন আর কেনই বা নিজেদের ছুঁড়ে দেবেন আগুনের মধ্যে।

ভারতবর্ষের স্বাধীনতার উদ্বোধনের পিছনের রক্তপাতকে এই সুপারিনটেনডেণ্ট দেখেছিলেন। যারা যখন তখনই বলতেন, একবিন্দুও রক্তপাত না করে ভারতীয় স্বধীনতা অর্জিত হয়েছে সেই ভণ্ডদের তিনি অভিশাপ দিতেন। পাঞ্জাবের এই বিপুল পরিমান রক্তক্ষয়ের জন্য দায়ী কারা? এ সংশয়িত প্রশ্ন ছিল তাঁর মনে।

তিনি ভেবেছিলেন, সেই রক্তস্রোতে তিনিও ঠাণ্ডা মাথায় তারও খানিক রক্ত মেশাতে চলেছেন।

আমরা দেখলাম, তিনি তার দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে আসা অশ্রুবিন্দুগুলিকে গোপন করতে চেষ্টা করছেন। কি করে তিনি নাথুরামের হাসি নিজের হাসি দিয়ে ফিরিয়ে দিতে পারতেন!

তবু তিনি ভাবলেন, এটা হয়ত দণ্ডাদেশপ্রাপ্ত আসামীর শেষ ইচ্ছা। কেন তাকে অখুশী করব? তিনি জোর করে তার মুখে একটুকরো হাসি টেনে আনলেন, প্রশ্নভরা চোখে তাকালেন তার দিকে।

নাথুরাম বললেন, শ্রীমানজী! আপনার কি মনে পড়ে, আমি একদিন আপনাকে বলেছিলাম যে, ফাঁসিকে আমি কিছু মনে করি না, তবে ফাঁসির দড়িতে ঝুলে পড়বার আগে আমি অবশ্যই এককাপ কফি খেতে চাই। এই ত' সেই কফির কাপ! আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।

অর্জুন দাস ফোঁপান কান্নাকে সংযত করলেন।

তখন নাথুরাম তাকালেন ডাক্তারের দিকে। বললেন, ডাক্তার ছাবদা। আপনার বইটি আমি অ্যাসিস্টাণ্ট সুপারিনটেনডেণ্ট ত্রিলোক সিং-এর কাছে রেখেছি। তাতে স্বাক্ষর (অটোগ্রাফ) করা আছে। আশা করি আপনার আর স্বাক্ষরের প্রয়োজন নেই।

আগের দিন মামার সঙ্গে যে সহজ ভঙ্গিতে কথা বলেছিল, সেই সহজ ভঙ্গিতেই কথা বললেন। মামাকে গতকাল বলেছিলেন, মামা তোমার হাজার টাকা আমি ফিরিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছি।

নারায়ণ আপ্তে সুপারিনটেনডেণ্টকে স্মরণ করিয়ে দিলেন যে, তার লেখা কাগজগুলো যেন পাঠিয়ে দেওয়া হয়। গত দশদিন ধরে আপ্তে 'শাসনতান্ত্রিক বিন্যাসে'র ওপর লিখেছেন কতকগুলি মৌলিক প্রবন্ধ।

সুপারিনটেনডেণ্ট সরকারের কাছে সেগুলি পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। যতদূর জানি আপ্তের স্ত্রী বা তার ভাইয়ের কাছে সেগুলি পাঠান নি।

সেই জেলার সমাহর্ত্তা শ্রীনরোত্তম সহ্‌গল সেখানে উপস্থিত

ছিলেন। অজানা দেশে যাত্রার আগে ওদের দুজনের কাছে কোন স্মারক আছে কিনা তা তিনি জানতে চাইলেন আর থাকলে তা অনুমোদিত কি না, তাও জানতে চাইলেন।

মৃত্যুর পরপারে যাত্রার জন্য ওরা দুজন প্রস্তুত ছিলেন। তারা হাতে বয়ে এনেছেন একখণ্ড করে ভাগবতগীতা, একটি করে অবিভক্ত হিন্দুস্থানের মানচিত্র আর একটি করে গেরুয়া পতাকা।

দণ্ডাদেশপ্রাপ্ত আসামীদের যেখানে রাখা হ'ত তার পাশেই ছিল ফাঁসির মঞ্চ। একসঙ্গে তিনজনকে ফাঁসি দেওয়ার উপযুক্ত ছিল সেটা।

পথে যেতে যেতে মধ্যশীতের প্রভাতসূর্যের উষ্ণতাকে উপভোগ করলেন আপ্তে। কতদিন পর পেলেন সূর্যের স্পর্শ।

তিনি আনন্দে উল্লসিত হয়ে উঠলেন, 'সূর্যটা কি মনোরম, তাই না পণ্ডিত!' তিনি কখনও কখনও নাথুরামকে পণ্ডিত বলে সম্বোধন করতেন।

নাথুরাম বললেন, অনেকদিন পর তুমি দেখছ কিনা! সিমলায় এটা স্বাভাবিক।

'কি স্বর্গীয় শোভা!'

নাথুরাম বললেন, 'আমাদের জীবনের এই স্বর্গীয় সন্ধিক্ষণে আমাদের মাতৃভূমি আমাদের ওপর আশীর্বাদ ছড়িয়ে দিচ্ছে।'

ফাঁসির মঞ্চের কাছে পেঁছে তারা মাতৃভূমির বন্দনার একটি স্তোত্র আবৃতি করলেন—

নমস্তে সদা বত্‌সলে মাতৃভূমি, ত্বয়া হিন্দুভূমে
সুখং বর্ধিতোঽহম্‌।
মহামঙ্গলে পুণ্যভূমে ত্বদর্থে পতত্বেষ কায়ো
নমস্তে নমস্তে।

[ হে প্রিয় মাতৃভূমি! প্রণাম তোমায় প্রণাম! এই হিন্দুভূমির কোলে তোমারই লালনে আমি বেড়ে উঠেছি সুখে—হে সর্বমঙ্গসময়ী পুণ্যভূমি, আমি তোমার কাজে জীবন উৎসর্গ করলাম। প্রণাম মা! তোমায় প্রণাম। ]

তাদের হাতগুলো পিছন দিকে বেঁধে দেওয়া হ'ল। জল্লাদ ফাঁসির দড়ি তাদের গলার চারদিকে জড়িয়ে দিল। দড়ির ঢিলা অংশ কাঠের ওপর পড়ে রইল। ছোট্ট দুটুকরো দড়ি দিয়ে সে তাদের পা দুটোও বেঁধে দিল।

নাথুরাম এবং নারায়ণ আপ্তে ধ্বনি দিয়ে উঠলেন। চতুর্দ্দিকের নিস্তব্ধ পরিবেশকে প্রায় শত গজ পরিধি নিয়ে সে ধ্বনি কেঁপে কেঁপে ফিরতে থাকল।

অখণ্ড ভারত — অমর রহে।

বন্দে মাতরম্।

সুপারিনটেনডেণ্ট জল্লাদকে সবুজ সংকেত দেখালেন। সঙ্গে সঙ্গে জল্লাদ ফাঁসির হাতল টেনে দিল।

ফাঁসি-কূপের পাটাতন শব্দ করে সরে গেল।

প্রকৃতি মাধ্যাকর্ষণ বলে টেনে নিল তাদের আর তার অদৃশ্য রথে করে তাদের দু'টি আত্মাকে পাঠিয়ে দিলেন কোন অজানার উদ্দেশে।

দড়িটা ঝুলে পড়ার সাথে সাথেই কাজটা শেষ হল এবং শেষ হ'ল বিন্দুমাত্র রক্তপাত না করে।

নাথুরামের মৃত্যু এসেছিল সঙ্গে সঙ্গে। নারায়ণের হাঁটু দুটো যেন তার থুতনি ছুঁতে চেষ্টা করল। অজ্ঞান অবস্থাতে কয়েক মিনিট তার দেহ কাঁপতে থাকল। তারপর তাঁর জীবনদীপ একেবারে নিভে গেল।

সহকারী-সুপারিনটেনডেণ্ট শ্রীরামনাথ শর্মা দেহ দুটির সৎকার-পূর্ব ধর্মীয় বিধিগুলি পালন করলেন।

যে জিনিসগুলি ওদের দুজনের হাতে ছিল (গীতা, অখণ্ড হিন্দুস্থানের মানচিত্র এবং গৈরিক পতাকা) সেগুলি বর্ত্তমান লেখকের হাতে পেঁাছে দেওয়া হল।

জেলের মধ্যেই তাদের দাহকার্য সমাধিত হল।

নাথুরামের ইচ্ছাপত্র (উইল), [এই গ্রন্থের শেষ দিকে মুদ্রিত আছে] পরদিনই তার ছোটভাই দত্তাত্রয়ের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

## ॥ যাবজ্জীবন দণ্ডিতেরা ॥

যাবজ্জীবন দণ্ডিত তিন আসামীর সঙ্গে সরকার অস্বাভাবিক, রূঢ় এবং নিষ্ঠুর আচরণ করেন বিশেষতঃ তাদের মুক্তির ব্যাপারে। 'যাবজ্জীবন' শব্দটার মধ্যেই এই সুযোগ লুকিয়ে ছিল। অন্য কোন দেশে প্রেরণ করে তাদের স্বাধীন জীবন যাপনের সুযোগ দেওয়া হল না। দণ্ডাদেশ প্রাপ্তদের অনুরোধেই যে তাদের এদেশে রাখা হয়েছিল, এমন নয়– এটা করা হয়েছিল তাদেরই সুবিধার জন্য। অন্যদিকে, সরকার নিজের আনন্দেই এটা করেছিলেন। এই তিনজনের জীবনের প্রতি তাদের কুটিল দৃষ্টি ছিল। আমৃত্যু তাদের জেলের মধ্যে রাখাই তাদের অভিপ্রায় ছিল।

জেলের মধ্যে কাজ এবং আচার আচরণ ভাল হলে কঠোর কারা-দণ্ডে দণ্ডিতদের মেয়াদের সীমা কমিয়ে দেওয়া হয়। যাবজ্জীবন দণ্ডিতদেরও ঐ শ্রেণীভূক্ত বলে গণ্য করা হয়। এর ফলে তাদের কারা-বাসের মেয়াদ সংক্ষিপ্ত হয়ে আসে।

সরকারের কাছ থেকে এসব যা প্রত্যাশার ছিল, সেগুলি ছাড়াও যখনই যেখান থেকে ডাক এসেছে তখনই এই যাবজ্জীবন দণ্ডাদেশ-প্রাপ্ত ব্যক্তি শাস্তির কাল যাপন করতে করতেই সেখানে রক্তদান করেছে। এমন দানের জন্য প্রতিবারে সরকার দশদিন করে মেয়াদ কমিয়ে থাকেন। সরকার এ ক্ষেত্রেও তা লিখে রেখেছেন কিন্তু কখনই কার্যকর করেন নি। রিজার্ভ-ব্যাঙ্কের ডিমাণ্ড-ড্রাফট যেমন সেক্রেটারিয়েটরা অসম্মান করে সরিয়ে রাখে, এগুলিও ছিল তেমনি উপেক্ষিত। সরকার লেখকের কাছে তার মৃত্যুতিথিই প্রত্যাশা করত, এবং তাদের ইচ্ছে ছিল, তারপর ও সব কার্যকর করবেন।

তার মুক্তির ব্যাপারটা একটা সীমাহীন স্থগিদ রাখার বিবেচনা-ধীন ছিল।

সরকারের সর্বোচ্চ পদগুলি যারা অধিকার করেছিলেন, তারা তাদের কোন বদ্ধমূল ধারণা থেকেই হয়ত এমন প্রতারণাপূর্ণ পন্থা গ্রহণ করেছিলেন। অবিভক্ত হিন্দুস্থানের স্বপ্নে যারা জীবন পর্যন্ত

বাজী রেখেছিলেন, তাদের জন্য একটা অহিংস মারণপন্থা তারা প্রয়োগ করেছিলেন। হয়ত তারা ভেবেছিলেন এতেও অহিংসারই জয়ধ্বজা উড্ডীন হচ্ছে। তারা হয়ত ভেবেছিলেন, তারা ত' গান্ধীর আদর্শ অনুসরণকারী—তাই এদের এমন মৃত্যুর ভেতর দিয়ে সেই মহান আত্মার তৃপ্তি সাধন করা যাবে। নইলে সবরকম বিধি-নিষেধ অগ্রাহ্য করে মেয়াদের দিন কমিয়ে দেবার প্রলোভন দেখিযে বারবার রক্ত দেবার আহ্বান জানানোর আর কি অর্থ থাকতে পারে? আর সেই রক্ত নেওয়ার পর মেয়াদের দিন না কমাবারই বা কি তাৎপর্য থাকতে পারে?

যখন এই লেখক বুঝতে পারলেন যে একদল প্রতারকের দ্বারা তিনি প্রতারিতই হয়েছেন আর তারা দৈহিক ব্যাপারেও শক্তিমান, তখন তিনি তথাকথিত মেয়াদ কমবার প্রত্যাশা না রেখেই রক্তদান করেছেন। তিনি রক্তদানের মধ্যে যে জাতীয় আহ্বান ছিল, তাকেই সম্মান দেখিয়েছিলেন যারা অন্যকে সততার শিক্ষা দিতেন, কিন্তু নিজেরা বিন্দুমাত্রও সদাচারণ করতেন না—তাদের প্রতি নয়। এই সব লোকেরাই যখন রাজঘাটে যায়, গান্ধীজির প্রতি সম্মান দেখিয়ে ন্যায় ও অহিংসার নীতি মেনে চলবার প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করে, তখন এই লেখকের মনে হয়, আমাদের দেশের জনগণকে বোকা বানাবার এটা একটা সীমাহীন ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছে।

এই লেখক ভারতীয় সর্বোচ্চ আদালতের কাছে আইনসঙ্গত মুক্তির জন্য বাইশবার আবেদন জানিয়েছিল। কিন্তু তিনি সরকারের তরফের দুর্নীতিমূলক অসাধু অভিসন্ধির প্রমাণ করতে পারেন নি। এই সরকার বিদ্বেষের চোখে দেখা আসামীদের ওপর অপ্রতিহত নিয়ন্ত্রণ শক্তি চেয়েছিলেন আর দুরভিসন্ধিমূলকভাবে চেয়েছিলেন যে, আমৃত্যু তারা জেলের মধ্যেই বন্দী থাক।

আমাদের একটি দরখাস্ত তখনও বিচারাধীন ছিল। বিচারালয় সরকারের ওপর নোটিশ জারি করেছিল। এরই ফলে গোপাল গড্‌সে এবং অন্য দুইজন যারা এ ব্যাপারে দুর্ভোগ ভুগছিলেন, তারা ১৯৪৪ সালের ১৩ই অক্টোবর মুক্তি পেলেন। এতঃমধ্যে মেয়াদ কমান সহ

তাদের সকলেরই ছাব্বিশ বছর শাস্তিভোগ করা হয়ে গেছে। এর মাত্র কয়েক মাস আগে পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর মৃত্যু হয়েছে।

যদিও এই লেখক সর্বোচ্চ আদালতের কাছ থেকে তার স্বপক্ষে কোন রায় আদায় করতে পারেন নি, তবু যদি সর্বোচ্চ আদালত না থাকত, তবে সরকার কখনও তাকে বা তার সঙ্গে আর যে দুজন শাস্তি ভোগ করছিল, তাদের মুক্তি দিত না।

॥ **মুক্তির পরবর্তী জীবন** ॥

সতের বছর বন্দী জীবন যাপন করে মুক্তিলাভের পর শ্রীবিষ্ণু কারকারে এবং লেখক (গোপাল গড্‌সে) তাদের বন্ধু-বান্ধব এবং শুভানুধ্যায়ীর দ্বারা আয়োজিত এক সংবর্ধনায় উপস্থিত হন। সরকার এই সংবর্ধনায় আপত্তি জানায়। মুক্তির মাত্র চল্লিশ দিনের মধ্যে তাদের দুজনকে নিবর্ত্তনমূলক আটক আইনে আবার জেলখানায় পাঠান হয়।

তাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ আনা হ'ল না। এই আইনের বলে আটক রাখার কর্ত্তাব্যক্তিদের ব্যক্তিগত পরিতৃপ্তিকে অতিক্রম করবার এক্তিয়ার উচ্চতম আদালতেরও ছিল না—আইনটা ছিল এমনই। এই নতুন হয়রানির মেয়াদ চলল প্রায় দেড় বছরেরও ওপর।

গোপাল গড্‌সে লেখাকেই জীবিকা হিসাবে গ্রহণ করেছেন। তাঁর প্রথম গ্রন্থ মারাঠী ভাষায় লেখা ঐ ঘটনারই বিবরণ। গ্রন্থের নাম: গান্ধী-হত্যা এবং আমি।

অন্যান্য বিষয় ছেড়ে দিলেও এ গ্রন্থ সরকারের মিথ্যাচারের স্বরূপ উদ্ঘাটন করে দিয়েছে। অতএব সরকার এবার গ্রন্থটিকে বাজেয়াপ্ত ঘোষণা করলেন।

উচ্চ আদালত এই বাজেয়াপ্তকরণ আদেশ তুলে নেন এবং মামলা বাবদ বাদীপক্ষকে ৩০০০ টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে নির্দেশ দেন। তারপর থেকে বইটি পুনর্মুদ্রিত হচ্ছে এবং অন্যান্য আঞ্চলিক ভাষায় অনুবাদ করা হচ্ছে।

এই লেখক আরও কয়েকটা বই লিখেছেন। নাথুরাম গড্‌সের

বিবরণীও তিনি কয়েকটি আঞ্চলিক ভাষায় অনুবাদ করেছেন।

বিতস্তা প্রকাশন নামে তিনি একটি প্রকাশন সংস্থারও মালিক। কাশ্মীরের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত ঝিলাম নদীরই পৌরাণিক নাম বিতস্তা। তিনি পুনা শহরে সপরিবারে বাস করছেন।

বিষ্ণু কারকারে আহম্মদ নগরে তার পুরোন ব্যবসাই চালাতে থাকেন। ১৯৪৪ সালের ৬ই এপ্রিল হৃদ্‌যন্ত্র বিকল হয়ে তাঁর মৃত্যু হয়। এ ব্যবসা এখন চালাচ্ছেন তাঁর স্ত্রী।

মদনলাল পাওয়া মুক্তিলাভের পর বিয়ে করেছেন এবং কয়েকটা কাগজকলের কেনাবেচার সঙ্গে যুক্ত আছেন।

বীর সাভারকর ১৯৪৪ সালের ২৬শে ফেব্রুয়ারী বোম্বাইতে পরলোক গমন করেন। ভাগ্যের পরিহাসে তাকে বৃটিশ শাসকদের এমন কি স্বাধীন ভারতের কর্ত্তাব্যাক্তিদের কাছ থেকেও কঠোর শাস্তি এবং আটক থাকার শাস্তি ভোগ করতে হয়েছিল। তার অপরাধ এই যে তিনি হিন্দুদের অধিকার রক্ষা করতে ব্যগ্র ছিলেন, আর তিনি ছিলেন ভারত বিভাজনের বিরোধী।

॥ **প্রামাণিকতা** ॥

পরবর্ত্তী পৃষ্ঠাগুলিতে যে বিবরণ মুদ্রিত হয়েছে, তা 'মহাত্মা গান্ধী-হত্যা মামলা'র নথির অংশবিশেষ। পাঞ্জাব হাইকোর্টের ( তখন সিমলায় ) ১৯৪৯ সালের ক্রিমিনাল অ্যাপিল্‌স্‌ এর দ্বিতীয় খণ্ডে নং ৬৬, নং ৭২ রূপে মুদ্রিত আছে।

*গান্ধী হত্যা মামলার অভিযুক্তেরা*

বসে বাঁ দিক থেকে : নারায়ণ আপ্তে (ফাঁসি হয়), সাভারকর (নির্দোষ হিসাবে মুক্ত), নাথুরাম গডসে (ফাঁসি হয়), বিষ্ণু কারকারে (যাবজ্জীবন কারাদন্ড)।

দাঁড়িয়ে বাঁ দিক থেকে : শংকর কিশটোয়া (আপীলে মুক্ত), গোপাল গডসে (যাবজ্জীবন দণ্ডিত), মদনলাল পাওয়া (যাবজ্জীবন দণ্ডিত) দিগম্বর বাদগে (রাজসাক্ষী)।

অন্য প্রধান অভিযুক্তেরা

বীর বিনায়ক দামোদর সাভারকর

গোপাল গডসে

বিষ্ণু রামকৃষ্ণ কারকরে

মদনলাল পাওয়া

ফাঁসির আসামীদ্বয়

নাথুরাম বিনায়ক গডসে

নারায়ণ দত্তাত্রেয় আপ্তে

# শুনুন ধর্মাবতার

## * দ্বিতীয় ভাগ *

গান্ধী-হত্যা মামলায় লালকেল্লায়
বিশেষ বিচারালয়ে
নাথুরাম গডসের
সওয়াল

আদালতের বিশেষ নির্দেশে সংবাদপত্র,
এমন কি আইনবিষয়ক গ্রন্থেও
এই সওয়ালের আভাসমাত্র
প্রকাশ নিষিদ্ধ ছিল।


।। রচনা ।।
**নাথুরাম গডসে**

অনুবাদ : **ডঃ নীরদবরণ হাজরা**

দিল্লীর লালকেল্লায় বিশেষ বিচারকদের নিয়ে গঠিত আদালত। সরকার বনাম নাথুরাম গড্সে ও অন্যান্যদের মামলার যা মহাত্মাগান্ধী হত্যা মামলা নামে খ্যাত, সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করা শেষ করেছেন বাদীপক্ষ।

বিশেষ বিচারক শ্রীআত্মাচরণ এসে বসেছেন তার আসনে। আদালতকক্ষে বিরাজ করছে নিস্তব্ধতা। অভিযুক্তেরা কাঠগড়ার মধ্যে যে যার নির্দিষ্ট আসনে বসে আছে। দু পক্ষের আইনজীবী পরামর্শদাতারাও উপস্থিত আছেন। উৎকণ্ঠিত ভাবে কলম ধরে সাংবাদিকেরাও প্রস্তুত হয়ে আছেন।

আদালতকক্ষ জনতায় আকণ্ঠ বোঝাই। শুধু সরকার অনুমোদিত ব্যক্তিরাই সেখানে প্রবেশ অধিকার পেয়েছিলেন।

দিনটা ছিল ১৯৪৮ সালের ৮ই নভেম্বর। অভিযুক্ত ব্যক্তিদের জবানবন্দী সেদিনই শোনা যাবে।

ভারতীয় ফৌজদারী দণ্ডবিধির ৩৪২ ধারায় অভিযুক্ত ব্যক্তিদের সাক্ষ্য নেওয়া শুরু করলেন বিচারক। তিনি ঘোষণা করলেন ঃ—

'আসামী নম্বর এক। নাথুরাম বিনায়ক গড্সে। হিন্দু। বয়স ৩৭। হিন্দুরাষ্ট্র পত্রিকার সম্পাদক। পুনা।

'আসামী নম্বর এক' শুনেই নাথুরাম দুপায়ে খাড়া উঠে দাঁড়ালেন।

বিচারক বলে চললেন, বাদীপক্ষের তরফ থেকে তোমার বিরুদ্ধে পেশ করা সব সাক্ষ্য-প্রমাণ তুমি শুনেছ। এ বিষয়ে তোমার কি বলবার আছে?

ধর্মাবতার! আমি আমার লিখিত বিবরণ পেশ করতে চাই।—বললেন নাথুরাম।

বেশ। পড় তোমার বিবরণ। বিচারক বললেন।

এতে অ্যাড্‌ভোকেট জেনারেল শ্রীদপ্তরি উঠে দাঁড়ালেন। তিনি বললেন, ধর্মাবতার। এই মামলার সঙ্গে সম্পর্কিত অংশই শুধু তাকে পড়তে দেওয়া হোক। অন্যথায় তাকে বিবরণটি পড়তে না দেওয়ার আদেশ দেওয়া হোক।

বিচারক এ আপত্তি নাকচ করে দিলেন।

মাইকের সামনে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন নাথুরাম। তিনি বিবরণ পড়তে প্রস্তুত। যে নৈঃশব্দ আদালতকক্ষকে গ্রাস করে রেখেছিল তা দেওয়ালে দেওয়ালে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত তার সুরেলা ও স্পষ্ট কণ্ঠস্বরে আরও প্রকট হয়ে উঠল—

শুনুন ধর্মাবতার।

## প্রথম অধ্যায়

### অভিযোগ পত্রের উত্তর

আমি, নাথুরাম বিনায়ক গড্‌সে, আসামী নম্বর এক, সম্মান সহ-কারে নিম্ন বিবরণ পেশ করছি,—

১. আমার বিরুদ্ধে যে সব বিভিন্ন অভিযোগ আনা হয়েছে, সেগুলি সম্পর্কে আমার বক্তব্য পেশ করবার আগে, আমি অত্যন্ত সম্মানের সঙ্গে আপনাকে এ কথাই নিবেদন করতে চাই যে আমার বিরুদ্ধে অভিযোগগুলি আইনসম্মতভাবে গঠিত হয় নি। বিশেষতঃ এতে অভিযোগগুলির মধ্যে এমন এক ভ্রান্ত জট পাকান হয়েছে যাদের দুই পৃথক মামলা হিসাবে বিচার করা উচিত ছিল—যাদের একটি ১৯৪৮ সালের ২০শে জানুয়ারীর ঘটনা সংক্রান্ত এবং অন্যটি ১৯৪৮ সালের ৩০শে জানুয়ারীর। দুটোকে মিশিয়ে ফেলায় সমস্ত বিচার কাজটিই বাতিলযোগ্য হয়েছে।

২. আমার পূর্বোক্ত নিবেদনের প্রতি কোন পক্ষপাত না রেখে আমি এর পর থেকে আমার বিরুদ্ধে আনীত বিভিন্ন অভিযোগের সম্পর্কে আমার বক্তব্য পেশ করছি।

৩. অভিযোগ-পত্রে আসামীদের বিরুদ্ধে বহু সংখ্যক অভিযোগ করা হয়েছে। ভারতীয় দন্ডবিধি এবং অন্যান্য লিখিত আইনের বহু শাস্তিযোগ্য অপরাধ কোথাও এরা ব্যক্তিগত ভাবে কোথাও বা যৌথ-ভাবে ঘটিয়েছেন বলে অভিযোগ আনা হয়েছে।

৪. এই অভিযোগ পত্র থেকে এটা প্রতীয়মান হয় যে বাদীপক্ষ ২০শে জানুয়ারী, ১৯৪৮ এবং তারপর ৩০শে জানুয়ারী ১৯৪৮ এর ঘটনাকে অদ্বিতীয় এবং অনুরূপ অথবা একই ঘটনা-শৃঙ্খল বলে মনে করেন যার লক্ষ্য এবং ফল গান্ধীজীকে হত্যা করা। তাই আমি

প্রথমেই এ কথা স্পষ্ট করে দিতে চাই যে, ২০শে জানুয়ারী ১৯৪৮ পর্যন্ত যা ঘটেছে তা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এর পর থেকে ৩০শে জানুয়ারী ১৯৪৮ আগে বা ঐ দিনে যা ঘটেছে তার সঙ্গে এর কোন যোগ নেই।

৫. অভিযোগ-পত্রে যে সব অভিযোগ করা হয়েছে, তার মধ্যে প্রথম এবং সর্বপ্রধান হচ্ছে এই যে আসামীরা গান্ধীজীকে হত্যা করবার জন্য নিজেদের মধ্যে ষড়যন্ত্র করেছিলেন। এ কারণে আমি প্রথমেই এই অভিযোগ সম্পর্কেই আলোচনা করব। আমি বলছি যে অভিযোগ-পত্রে যে সব অপরাধের কথা বলা হয়েছে, তার কোনটি সম্পর্কেই আসামীদের মধ্যে কোন ষড়যন্ত্র হয় নি। এখানেই আমি নিবেদন করতে চাই যে উল্লেখিত অভিযোগের কোনটিও ঘটানোর জন্য আমি কোন আসামীর কাছ থেকেই কোন নির্দেশ পাই নি।

৬. আমি বলছি, বাদীপক্ষ যে সব সাক্ষ্য-প্রমাণ হাজির করেছেন তার দ্বারা কোন ষড়যন্ত্র বা ঐ রকম কিছুর অস্তিত্ব তারা প্রতিষ্ঠিত ও প্রমাণিত করতে পারেন নি। একমাত্র সাক্ষী যে উল্লেখিত ষড়যন্ত্রের স্বপক্ষে সাক্ষ্য দিয়েছে, যে দিগম্বর. আর. বাদগে। (বাদীপক্ষের সাক্ষ্য নম্বর ৫৭)। সে যে সম্পূর্ণভাবে অবিশ্বাস্য এক সাক্ষী, একথা আমার পক্ষের আইনজীবী এই মামলার সাক্ষ্যগুলি বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে যখন এই সাক্ষী (পি. ডাব্লিউ. ৫৭)র সাক্ষ্য নিয়ে আলোচনা করবেন তখন প্রমাণ করবেন।

৭. লাইসেন্স ছাড়া অস্ত্র এবং গোলা বারুদ সংগ্রহ ও বহন এবং ১৯৪৮ সালের ২০শে জানুয়ারী ঘটনার সমর্থন করা সম্পর্কে যে অভিযোগ আনা হয়েছে, সে অভিযোগ আমি অস্বীকার করছি, এবং বলছি যে আমি ঐ পেটো, হাতবোমা, বিস্ফোরক পদার্থ, পলতে, পিস্তল বা রিভালভার বা কার্তুজ আমি বহনও করিনি, অন্যত্র নিয়েও যাইনি। অভিযোগে যেমন বলা হয়েছে, তেমন ভাবে এসব আমার হেপাজতে ছিলও না, আমি এই সব অভিযুক্তদের মধ্যে কাউকে ঐ সমস্ত অস্ত্র বা গুলিবারুদ দিয়ে ২০শে জানুয়ারী ১৯৪৮ এর

আগে পরে বা অন্য কোন তারিখে সাহায্য বা সমর্থন কিছুই করিনি। অতএব আমি অস্বীকার করছি যে ভারতীয় অস্ত্র আইন বা ভারতীয় বিস্ফোরক দ্রব্য আইনের অনুবিধি লঙ্ঘন করেছি বা ঐ সব আইন বলে শাস্তিযোগ্য কোন অপরাধ ঘটিয়েছি।

৮. এই অভিযোগের ব্যাপারে একমাত্র সাক্ষ্য হচ্ছে দিগম্বর. আর বাদগে (পি ডাব্লিউ ৫৭), যাকে আমরা ৬ নং অনুচ্ছেদে আগেই সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য সাক্ষী বলে বর্ণনা করেছি। সাক্ষী বাদগে ( পি. ডাব্লিউ. ৫৭ ) আমার পরিচিত। কিন্তু সে কদাচিত আমার কাছে আসত, আমিও গত কয়েক বছরে তার বাসস্থানে যাইনি। সে যে বিবৃতি দিয়েছে যে গত ১০ই জানুয়ারী, ১৯৪৮ আপ্তে, আসামী নম্বর দুই, তাকে 'হিন্দু রাষ্ট্র' অফিসে নিয়ে এসেছিল, তা সম্পূর্ণ মিথ্যা। আমি আরও অস্বীকার করছি যে ঐ দিনে হিন্দু-রাষ্ট্র অফিসে তার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। উক্ত বাদগে সাক্ষ্য দিয়েছেন যে আমার উপস্থিতিতে তার আর আপ্তের মধ্যে পেটো, হাতবোমা ইত্যাদি নিয়ে এবং সেগুলি বম্বেতে নিয়ে গিয়ে হস্তান্তরিত করবার কথা হয়েছিল—তাও সম্পূর্ণ মিথ্যা—তাকেও আমি অস্বীকার করছি। তার সাক্ষ্যে সে বলেছে যে আপ্তে আমাকে ঘরের বাইরে যেতে বলেন এবং আপ্তে যে হাতবোমা ইত্যাদি সরবরাহ করতে রাজী হয়েছে এবং খানিকটা যে দিয়েছেও—একথা সম্পূর্ণ মিথ্যা। উল্লে-খিত ষড়যন্ত্রের মধ্যে আমাকে এবং অন্যান্য আসামীদের জড়িয়ে দেবার উদ্দেশ্যেই এই অলীক গল্প গড়ে তোলা হয়েছে। আমি আরও বলছি যে ১৪ই জানুয়ারী ১৯৪৮-এ দাদারে বা অন্য কোথাও একা একা বা আপ্তে সহ বাদগের সঙ্গে আমার দেখা হয়নি। আমি জানিও না যে ঐ দিনে বাদগে বম্বে এসেছিল।

৯. অভিযোগ-পত্রে বি. ১ও ২ অনুচ্ছেদে 'দ্বিতীয়তঃ' শব্দ দিয়ে যার সূচনা হয়েছে, সে অভিযোগকেও আমি অস্বীকার করছি। গত ২০শে জানুয়ারী ১৯৪৮ আমার সঙ্গে কোন গোলাবারুদ ছিলনা, আমার নিয়ন্ত্রণাধীন কোন স্থানেও তা ছিল না। এ ধরনের কোন

কাজের ষড়যন্ত্রেও আমার কোন সংযোগ ছিল না।

এ ক্ষেত্রেও এই অভিযোগের সমর্থনে এক বাদগের সাক্ষ্যকেই উপস্থিত করা হয়েছে এবং আমি বলছি সে নিজের পিঠ বাঁচাতেই এমন মিথ্যা সাক্ষী দিয়েছে। কারণ একমাত্র মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়েই সে প্রতিশ্রুত এবং অনুমোদিত ক্ষমা পেতে পারে।

১০. 'তৃতীয়তঃ' দিয়ে যে অভিযোগ শুরু হয়েছে এবং এ ১ ও ২ এবং বি ১ ও ২ ইত্যাদি বহু অনুচ্ছেদ ধরে যা ব্যক্ত করা হয়েছে, সে সম্পর্কে বলতে গিয়েও আমি বলছি যে, এই অভিযোগ এবং এর দ্বারা যে ষড়যন্ত্রের ইঙ্গিত করা হয়েছে তা আমি অস্বীকার করছি।

১১. 'চতুর্থতঃ' দিয়ে যে অভিযোগ শুরু হয়েছে তার দ্বিতীয় অনুচ্ছেদের বক্তব্যের উত্তরে আমি বলছি যে, একথা আমি অস্বীকার করছি গত ২০শে জানুয়ারী ১৯৪৮এ বিড়লাভবনে ঐ পেটো বোমা ফাটাতে আমি একা বা অনেককে সঙ্গে নিয়ে মদনলাল কে. পাওয়ার সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হই নি। আমি বলছি যে, এই অভি-যোগটি প্রতিষ্ঠা করবার জন্য কোন প্রমাণ উপস্থিত করা হয়নি আর যদিও বা সামান্য কিছু প্রমাণ উপস্থিত করা হয়ে থাকে, তবে তার দ্বারা কোনভাবেই আমাকে ঐ পেটো বোমার বিস্ফোরণের সঙ্গে জড়িত করা যায় নি।

১২. অভিযোগপত্রের 'চতুর্থতঃ' শব্দ দ্বারা সূচিত অনুচ্ছেদে 'মহাত্মা গান্ধীকে হত্যাপ্রচেষ্টার' ষড়যন্ত্রের যে অভিযোগ আনা হয়েছে, তাকেও আমি অস্বীকার করছি এবং ঘোষণা করছি যে প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে মদনলাল কে পাওয়া বা অনুরূপ আরও কারোও সঙ্গে আমার এমন কোন যোগাযোগ ছিল না। আমি জানাচ্ছি যে এই অভিযোগের সমর্থনে কোনো প্রমাণ বা সাক্ষ্য উপস্থিত করা হয়নি।

১৩. অভিযোগপত্রের 'ষষ্ঠতঃ' দ্বারা সূচিত অংশের অনুচ্ছেদ 'এ'র ১ ও ২ এ যে অভিযোগ আনা হয়েছে, তার সম্পর্কে আমার বক্তব্য হচ্ছে আমি নারায়ণ. ডি. আপ্তের সহযোগিতায় লাইসেন্সহীন কোন পিস্তল বা গোলাগুলি আনি নি। ডাঃ দত্তাত্রেয় এস. পারচুরে

এবং নারায়ণ ডি. আপ্তে সেই পিস্তল সংগ্রহ করেছেন বা ওরা একক-ভাবে বা যৌথভাবে ঐ পিস্তল ও গোলাবারুদ সংগ্রহের চেষ্টা করেছেন বা ঐ চেষ্টা করবার জন্য আমাকেও প্ররোচিত করেছেন— এমন কথাও আমি অস্বীকার করছি। আমি আরও বলছি যে এ বিষয়ে বাদীপক্ষ যে প্রমাণ উপস্থিত করেছেন, তাও বিশ্বাসযোগ্য নয়। আমি আরও বলছি যে এ ১ এবং ২নং অনুচ্ছেদে যে সব আইনের উল্লেখ করা হয়েছে সে সব বিধি নির্দিষ্ট অপরাধ যদি সংঘটিত হয়েও থাকত, তবু এই মাননীয় আদালতের সে সব অপরাধের বিচারের এক্তিয়ার ছিল না। আমি আরও যোগ করতে চাই যে, যতক্ষণ আমাকে কেন্দ্র করেই আলোচনা হচ্ছে, ততক্ষণ এই অভিযোগ বি (১) অনুচ্ছেদের মধ্যেই সম্পূর্ণ মিশে যায়।

১৪. বি (১) এবং (২) অনুচ্ছেদের অন্তর্গত অভিযোগগুলির বিষয়ে আমার বক্তব্য এই যে আমি স্বীকার করি ৬০৬৮২৪নং স্বয়ং-ক্রিয় পিস্তল এবং গুলিগুলি আমার অধিকারভুক্ত ছিল। কিন্তু একথাও বলছি যে এই পিস্তল আমার অধিকারভুক্ত থাকার ব্যাপারে নারায়ণ ডি. আপ্তে বা বিষ্ণু. আর. কারকারের কিছুই দায়িত্ব ছিল না।

১৫. 'সপ্তমতঃ' বলে সূচীত অনুচ্ছেদের বিষয়ে আলোচনা শুরু করবার আগে, এখানেই, কেমন করে আমি দিল্লী এলাম এবং কেনই বা আমি দিল্লী এলাম, তা বলে নেওয়া অপ্রাসঙ্গিক হবে না। আমি একথা কখনই গোপন করিনি যে আমি সেই আদর্শ বা চিন্তাধারাকেই সমর্থন করি যা গান্ধীজির সম্পূর্ণ বিরোধী। এ-কথা আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি গান্ধীজি যে অবিমিশ্র অহিংসার কথা সর্বদাই প্রচার করেন, তা অবশেষে ফল হিসাবে হিন্দুসম্প্রদায়কে নপুংসকে পরিণত করবে এবং এমনি করে এই সম্প্রদায় অন্য সম্প্রদায়ের বিশেষতঃ মুসলমান-দের দাঙ্গাবাজী বা আকস্মিক আক্রমণ প্রতিরোধের শক্তি হারাবে। এই সর্বনাশের প্রতিরোধের আকাঙ্খাতেই আমি জনজীবনে নেমে আসবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি এবং সমবিশ্বাসীদের নিয়ে একটা দল ( Group-Party নয়) গঠন করি। এ ব্যাপারে আমি এবং আপ্তে নেতৃত্ব গ্রহণ

করি এবং এই মত প্রচারের অঙ্গ হিসাবে 'অগ্রণী' নামে একটি দৈনিক-পত্র প্রকাশ করি। গান্ধীজি যখনই তার মতামত ব্যাখ্যা করতে যেতেন তখনই তিনি মুসলমানদের এমন একটা মূল সূত্রকে এনে প্রতিষ্ঠা করতেন যা ছিল হিন্দু সম্প্রদায়ের পক্ষে ক্ষতিকারক এবং ধ্বংসাত্মক। তাই আমি এখানে স্পষ্ট করেই বলতে চাই যে, আমি বা আমার দল গান্ধীজির অহিংসার প্রচারের যতটা বিরোধী ছিলাম, তার চেয়ে বেশী বিরোধী ছিলাম এই বিষয়টির। এখানে আমি খুব স্পষ্ট করেই আমার মত বলেছি এবং পরে আরও বিশদভাবে বলব, অসংখ্য ঘটনার উল্লেখ করব যার থেকে নির্ভুলভাবে প্রমাণ হবে যে হিন্দু-সমাজকে এমন অসংখ্য বিপর্যয় ও বেদনা সইতে হয়েছে যার দায় গান্ধীজির।

১৬. আমার পত্রিকা 'অগ্রণী' ও 'হিন্দুরাষ্ট্রে' আমি সবসময়েই গান্ধীজির মতামত এবং কর্মপদ্ধতিকে কঠোর সমালোচনা করে এসেছি। কর্মপদ্ধতি—যেমন উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য অনশন শুরু করা। আর পরে যখন গান্ধীজি প্রার্থনা সভা করা শুরু করলেন, তখন আমরা—আমি এবং আপ্তে সিদ্ধান্ত নিলাম যে আমরাও বিরোধিতার জন্য শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ প্রদর্শন করব। আমরা পাঞ্চাগ্নি, পুনা, বোম্বাই এবং দিল্লীতে এমন বিক্ষোভ প্রদর্শনের আয়োজন করেছিলাম। এই দুই আদর্শের মধ্যে ছিল সমুদ্রের ব্যবধান। এ ব্যবধান ক্রমেই বাড়ছিল কারণ গান্ধীজী এবং কংগ্রেসের, যে কংগ্রেস আবার গান্ধীজীর নির্দেশেই পরিচালিত হ'ত, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সমর্থনে বা ইঙ্গিতে মুসলমানেরা সুযোগের পর সুযোগ পেয়েই চলেছিল—যার চরম পরিণতিতে হল ভারত বিভাজন—১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্টে। এ সম্পর্কে পরে আমি আরও বিশদভাবে আলোচনা করেছি। গত ১৩ই জানুয়ারী ১৯৪৮ সালে আমি জানলাম গান্ধীজী এক আমরণ অনশনের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এর পিছনে যে কারণ দেখান হয়েছিল, তাতে তিনি ভারত যুক্তরাষ্ট্রে হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের প্রতিশ্রুতি চাইছিলেন। কিন্তু আমি এবং আরও অনেকেই

বুঝতে পারছিলাম যে এই তথাকথিত হিন্দু-মুসলমান ঐক্যই এই অনশনের পিছনের প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল না—ভারতীয় সরকার যে পঞ্চান্ন কোটি টাকা পাকিস্হানকে দিয়ে দিতে দৃঢ়ভাবে অস্বীকার করেছিল—তাই পাকিস্হানকে দিয়ে দিতে বাধ্য করাই ছিল এর কারণ। এর প্রতিবাদে আপ্তে সেই পুরোন পন্ধতিই গ্রহণ করতে বলল—গান্ধীজীর প্রার্থনা সভায় তীব্র কিন্তু শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ প্রদর্শন করা। আমি, আন্তরিকভাবে না হলেও এতে সম্মতি দিয়েছিলাম—কারণ এর অসারতা আমি স্পষ্ট বুঝেছিলাম। যাই হোক, আমিও তার সঙ্গে যোগ দিতে রাজী হলাম—কারণ অন্য কোন বিকল্পপন্হা আমার মনে উদিত হল না। এই কারণেই আমি এবং এন. ডি. আপ্তে ১৪ জানুয়ারী ১৯৪৮ সালে বম্বে গেলাম।

১৭. ১৫ জানুয়ারী ১৯৪৮, আমরা—আমি আর আপ্তে সকাল-বেলা দাদারে হিন্দুসভা অফিসে গিয়েছিলাম। সেখানে আমি বাদগেকে দেখি। আমাকে এবং এন. ডি. আপ্তেকে দেখে বাদগে এন. ডি. আপ্তের সঙ্গে কথা বলে এবং বম্বে আসার কারণ জিজ্ঞাসা করে। আপ্তে তাকে কারণ বলে। বাদগে তখন নিজে থেকেই আমাদের সঙ্গে দিল্লী গিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শনে যোগ দিতে চায়—অবশ্য এতে যদি আমাদের কোন আপত্তি না থাকে। আমরা আমাদের পিছনে অনেক লোক চেয়েছিলাম—যারা আমাদের শ্লোগানের জবাবে কণ্ঠ মেলাবে—অতএব তার প্রস্তাবে সম্মত হলাম। আমরা কখন রওনা হচ্ছি তা তাকে জানিয়েছিলাম। তখন বাদগে বলেছিল যে পারভিনচন্দ্র সেথিয়াকে তার কিছু মাল দেবার আছে। এ সব কাজ সে এক-দু দিনের মধ্যে সেরে ফেলে ১৯৪৮ সালের ১৭ই জানুয়ারী দেখা করবে।

১৮. ১৫ই জানুয়ারী ১৯৪৮ তারিখে দাদারের হিন্দুসভা অফিসে বাদগের সঙ্গে এই সাক্ষাতের পর আবার আমি তাকে দেখলাম ১৯৪৮ সালের ১৭ই জানুয়ারী সকালবেলা।

১৯. বাদগে যে বিবৃতি দিয়েছে, যে, আমরা তাকে সঙ্গে নিয়ে দীক্ষিতজী মহারাজের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম, বা আপ্তে তাকে

বলেছে যে সাভারকর, আপ্তে এবং আমার ওপর দায়িত্ব দিয়েছেন গান্ধীজি, পন্ডিত জওহরলাল এবং সুরাবর্দীকে শেষ করে দিতে—তা সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং বাদগের মস্তিষ্ক প্রসূত। আমি বা আপ্তে কেউই এ ধরনের কোন কথা বাদগে বা অন্য কাউকেই বলি নি।

বাদীপক্ষ আমার নামে যে মিথ্যার উল্লেখ করেছেন যে আমার কাজের জন্য আমি বীর সাভারকরের নির্দেশ পেয়েছি এবং তাকে খুশি করবার জন্যই এ কাজ করেছি এবং এ ছাড়া কিছুতেই এভাবে আমি এ কাজ করতে পারতাম না—তা আমি অকুণ্ঠভাবে অস্বীকার করছি। আমি এই মিথ্যা এবং অলীক অভিযোগে তীব্র আপত্তি জানাচ্ছি। আমি আরও দুঃখ প্রকাশ করছি যে, এটা আমার বুদ্ধিমত্তা এবং বিচারশীলতার ওপরেই কটাক্ষপাত। বাদীপক্ষ আমাকে যে অপেরর হাতের ক্রীড়নক প্রমাণ করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন তা আমার বিরুদ্ধে এক কুৎসামাত্র—তা সত্যভ্রষ্ট।—প্রকৃতপক্ষে তা সত্যের বিকৃতি মাত্র।

২০. বাদগে ঐ যে বিবৃতি দিয়েছেন যে আমিও আমার ভাই গোপাল গড্‌সের সঙ্গে দেখা করবার জন্য পুনা যেতে চেয়েছিলাম, ওরই ওপর রিভলভার সংগ্রহের দায়িত্ব ছিল, এবং ওকে-ও আমাদের সঙ্গে দিল্লী যাওয়ার জন্য বম্বেতে নিয়ে আসতে চেয়েছিলাম— এ সব কথাও অসত্য। ওপরের ১৭নং অনুচ্ছেদে যেটুকু বর্ণনা করেছি তা ছাড়া ১৫ই জানুয়ারী, ১৯৪৮-এর সাক্ষাতে বাদগের সঙ্গে আমার কোন কথাই হয় নি। অধিকন্তু ১৬ই জানুয়ারী ১৯৪৮ তারিখে বাদগের সঙ্গে আমার পুনায় সাক্ষাৎ হয়েছিল বলে সে যে বর্ণনা দিয়েছে—তাও সম্পূর্ণ মিথ্যা। আমার সঙ্গে পুনায় তার কথোপকথনের যে ষড়যন্ত্রমূলক বিবরণ বাদগে তার সাক্ষ্যে জানিয়েছে তাও সম্পূর্ণ মিথ্যা। গত ১৬ই জানুয়ারী ১৯৪৮ আমি পুনায় ছিলাম না। এর থেকেই স্পষ্ট বোঝা যাবে যে সেদিনই বদ্‌লে একটা বড় রিভালভার পাওয়ার জন্য তাকে আমি একটা পিস্তল দিয়েছিলাম— এ কথা কত বড় মিথ্যা।

২১. আমি একথা আগেই বলেছি যে আমরা—আপ্তে এবং আমি—পরিকল্পনা করেছিলাম যে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দিল্লীতে গান্ধীজীর প্রার্থনাসভায় আমরা একটা তীব্র অথচ শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ প্রদর্শন করব—আর এজন্য আমাদের দিল্লীতে যেতে হবে। ১৭ নং অনুচ্ছেদে বলাই হয়েছে যে এই বিক্ষোভ প্রদর্শনে অংশ গ্রহণ করবার ইচ্ছা বাদগে নিজেই প্রকাশ করেছিল। আমাদের সঙ্গে অনেক স্বেচ্ছাসেবকের থাকার অনিবার্য প্রয়োজন বোধ করেছিলাম আমরা—এতেই বিক্ষোভ-প্রদর্শন সার্থক হতে পারে। যাত্রা শুরু করবার আগে আমরা এই যাত্রা এবং স্বেচ্ছাসেবকদের ব্যয় নির্বাহের জন্য অর্থ-সংগ্রহ শুরু করলাম।

২২. ১৭ই জানুয়ারী ১৯৪৮ আমরা বীর সাভারকরের সঙ্গে দেখা করেছিলাম এবং তিনি আমাদের 'যশস্বী হৌন্ য়া' [ সফল হয়ে ফিরে এসো ] বলে আশীর্বাদ করেছিলেন বলে যে বিবৃতি দেওয়া হয়েছে তা আমি দৃঢ়তার সঙ্গে অস্বীকার করছি। অনুরূপভাবে আমি অস্বীকার করছি যে বাদগের সঙ্গে আমাদের কোন কথোপকথন হয়েছিল বা আমি কিংবা আপ্তে তাকে বলেছিলাম, "তাত্য়ারাওয়ানী আসে ভবিষ্য কেলে আহে কী গান্ধীজীচী সম্ভর বর্ষে ভরলী র' আতা আপলে কাম নিশ্চিন্ত হোনার্ য়াঁত্ কাহী সন্শয় নাহি।"
[ তাতিয়ারাও, এই রকম ভবিষ্যৎবাণী করেছেন যে, গান্ধীজীর শতবর্ষ পূর্ণ হয়েছে, এবার আপনার কাজ অবশ্যই সম্পূর্ণ হবে। এতে কোন সন্দেহ নেই। ]

১৯৪৮ সালের ১৫ই জানুয়ারী দাদারে হিন্দুসভা অফিসে বাদগের সঙ্গে আমাদের সাক্ষাতের পর আমরা, আপ্তে ও আমি, পত্রিকা সম্পর্কিত কাজে চলে যাই।

২৩ আপ্তে এবং আমি ১৭ই জানুয়ারী, ১৯৪৮ তারিখে প্লেনে করে দিল্লী এলাম এবং মেরিনা হোটেলে উঠলাম। ২০শে জানুয়ারী ১৯৪৮ তারিখের সকালে বাদগে আমাদের হোটেলে এলো এবং আপ্তেকে জানাল যে সে তার চাকরকে নিয়ে আপ্তের সঙ্গে সন্ধেবেলা প্রার্থনা ময়দানে যেতে চায়—যেখানে বিক্ষোভ প্রদর্শন হবে সে

স্হানটা এবং প্রার্থনার দৃশ্যটা সে দেখে রাখতে চায়। যখন বাদগে এলো, তখনও আমি বিছানায় শুয়েছিলাম কেননা তীব্র মাথার যন্ত্রণায় আমি খুবই অসুস্থ বোধ করছিলাম। তাই বাদগেকে বললাম যে আমি অসুস্থ বোধ করছি বলে প্রার্থনা ময়দানে যেতে পারব না। বাদগে তার বিবৃতিতে ঐ যে বলেছে যে ঐ দিন আপ্তে, গোপাল গড্‌সে, কারকারে, মদনলাল, বাদগে এবং তার চাকর খ্রিষ্টিয়া মেরিনা হোটেলে মিলিত হয়েছিল, সে আর শংকর সেখানেই খেয়েছিল, গোপাল গড্‌সেকে সে দেখেছিল একটা রিভালভার ঠিকঠাক করতে, আপ্তে, কারকারে, মদনলাল এবং বাদগে ঢুকেছিল স্নানঘরে—সেখানে তারা বিস্ফোরক দ্রব্য, ফিউজতার, পেটোবোমা, হাতবোমা ইত্যাদি ঠিকঠাক করে নিয়েছিল—শংকর আর আমি ঢুকবার দরজার দু'দিকে দাঁড়িয়েছিলাম—এ সব মিথ্যা। বাদগে আমার মুখে কিছু কথাও বসিয়েছে। আমি নাকি বলেছিলাম, বাদগে, এই আমাদের শেষ চেষ্টা। আমাদের সফল হতেই হবে। দেখো সব জিনিষ যেন সঠিকভাবে প্রস্তুত হয়। —আমি এ সব অস্বীকার করছি। আমি বাদগেকে সম্বোধন করে এ সব কথা বা এমন ধরনের কথা সেদিন বা অন্য কোন দিনও বলি নি। আগেই বলা হয়েছে যে বাদগে সকালবেলা ঘরে এসে আমায় জানায় যে সে ঐ দিন সন্ধ্যায় প্রার্থনাসভায় যাবে। সেদিন আমার ঘরে বাদগের বর্ণনার অনুরূপ কোন সভা হয় নি। আমার ভাই গোপাল গড্‌সে, আমার জ্ঞানতঃ দিল্লীতে ছিল না। কেউই বিস্ফোরক দ্রব্য, ফিউজতার, পেটোবোমা, হাতবোমা ঐ ঘরে ঠিকঠাক করে নি। প্রকৃতপক্ষে আমার বা আপ্তের সঙ্গে ঐ ধরনের কোন গোলাবারুদ ছিল না। এরপর বাদগের বিবরণে আছে অস্ত্র ভাগাভাগির বিশদ বিবরণ। দলের সকলের মধ্যে অস্ত্রগুলি ভাগ করে নেওয়ার—এ কথাও সম্পূর্ণ মিথ্যা। এ বিষয়ে সাক্ষীদের বক্তব্য নিয়ে আলোচনা করা বা তার মধ্যে কোথায় কোথায় মিথ্যা আছে তা নিয়ে আলোচনা করা আমার পক্ষে প্রয়োজনীয় নয়—আমার পক্ষের কৌঁশলী তার ভাষণে এ বিষয়ে বলবেন।

২৪. আগেই বলা হয়েছে যে তীব্র মাথা ব্যথার দরুণ অসুস্থ থাকায় আমি প্রার্থনা প্রাঙ্গনেও যেতে পারি নি। সন্ধ্যা ছ'টা নাগাদ

মেরিনা হোটেলে ফিরে এসে আমাকে জানায় যে সে একবার প্রার্থনা-সভা দেখে এসেছে এবং দু-এক দিনের মধ্যেই বিক্ষোভ প্রদর্শনের আয়োজন করতে পারবে। প্রায় ঘণ্টাখানেক পর একটা বিস্ফোরণের ফলে গান্ধীজীর প্রার্থনাসভায় প্রচণ্ড হৈ চৈ শুনতে পেলাম। পরে শুনতে পেলাম একজন উদ্বাস্তুকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আপ্তে ভেবেছিল এ সময়ে দিল্লী ছেড়ে যাওয়াই আমাদের পক্ষে যুক্তিযুক্ত। এবং সেই অনুযায়ী আমরা দিল্লী ত্যাগ করেছিলাম। এটা সত্য নয় যে ২০শে জানুয়ারী ১৯৪৮ আমি বাদগের সঙ্গে হিন্দুসভা ভবনে দেখা করেছিলাম। কয়েকজন সাক্ষী এ সাক্ষ্য দিয়েছেন যে ২০শে জানুয়ারী ১৯৪৮ তারিখে আমি বিড়লাভবনে ছিলাম—কিন্তু আমি দৃঢ়তার সঙ্গে বলছি যে এমন বলা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। আমি বলছি তারা অন্য কারো উপস্থিতিকে আমার উপস্থিতির সঙ্গে গুলিয়ে ফেলেছেন। কয়েকজন সাক্ষী আমাকে সনাক্ত করেছেন। এটাও বিশ্বাসযোগ্য নয় কারণ ঐদিন আমি বিড়লাভবনে ছিলামই না। এই সব সাক্ষী যে আমাকে সনাক্ত করছে এর কারণ এই যে আমি যখন তুঘলক রোড্ পুলিশ স্টেশনে ছিলাম তখন বহু লোককেই আমাকে দেখান হয়েছিল। এ ছাড়াও গত ১২ই ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত আমার মাথায় যে ব্যাণ্ডেজ ছিল, তার জন্য সনাক্ত করা খুবই সহজ ছিল। এই সব পুলিশ সাক্ষ্যেরা যারা আমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়েছিলেন তারা প্রকৃত-পক্ষে হলফ করে মিথ্যা বলেছিলেন। বম্বেতে অনুষ্ঠিত এই সনাক্তকরণ সমাবেশের দিনই আমি দিল্লীর সাক্ষ্যদের বিরুদ্ধে এ সম্পর্কে অভিযোগ করেছিলাম।

২৫. দিল্লীতে গান্ধীজীর প্রার্থনাসভায় বিক্ষোভ প্রদর্শনের বিষয়ে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা করবার জন্য সুগভীর বিবেচনা করেও আমি খুবই অনিচ্ছুকভাবে আপ্তের সঙ্গে যোগ দেওয়ায় সম্মতি জানাই। এই নতুন পরিস্থিতিতে বম্বে বা পুনা থেকে ইচ্ছুক ও উপযুক্ত স্বেচ্ছাসেবক পাওয়া সম্ভব ছিল না। এ ছাড়াও আমাদের তহবিল তখন নিঃশেষিত, আর একদল স্বেচ্ছাসেবককে বম্বে থেকে

দিল্লী নিয়ে যাওয়া এবং ফিরিয়ে আনার খরচ বহন করার সাধ্য আমাদেরও ছিল না। তাই আমরা স্থির করলাম গোয়ালিয়রে যাবো ডাঃ পারচুরের সঙ্গে দেখা করব। তাঁর হাতে 'হিন্দু-রাষ্ট্র-সেনা'র বহু স্বেচ্ছাসেবক ছিল। স্বেচ্ছাসেবকদের গোয়ালিয়র থেকে দিল্লী নিয়ে যাওয়াকে কমবেশি অর্থনৈতিক পরিকল্পনা বলা যায়। আমরা তাই গোয়ালিয়রে যাত্রা করলাম—২৭শে জানুয়ারী ১৯৪৮ প্লেনে দিল্লী পেঁছে রাতের গাড়িতে খুব ভোরে গোয়ালিযর পেঁছালাম। যেহেতু তখনও ছিল গাঢ় অন্ধকার তাই আমরা স্টেশনের কাছেই এক ধর্ম-শালায় বিশ্রাম করলাম। সকালবেলা ডাঃ পারচুরের বাড়ি গিয়ে তার সঙ্গে দেখা করলাম। তিনি ডিস্‌পেন্‌সারিতে ব্যস্ত ছিলেন। তিনি আমাদের বিকেলে দেখা করতে বললেন। আমরা বেলা চারটে নাগাদ তার সঙ্গে দেখা করলাম। কিন্তু দেখলাম তিনি আমাদের সাহায্য করতে তেমন প্রস্তুত নন। কারণ তার স্বেচ্ছাসেবকেরা তখন স্থানীয় কাজে ব্যস্ত ছিল। সম্পূর্ণ ব্যর্থ মনোরথ হয়ে আমি বম্বে বা পুনায় ফিরে গিয়ে আপ্তেকে স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহের চেষ্টা করতে বললাম আর আমি চলে এলাম দিল্লীতে। বললাম, আমি উদ্বাস্তুদের ভেতর থেকে স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহের চেষ্টা করব। আমি আর আপ্তে গোয়ালিয়রে গিয়েছিলাম শুধুমাত্র রিভালভার বা পিস্তল সংগ্রহ করতে এবং সেখানে অনেকগুলি এমন অস্ত্র চোরা পথে বিক্রির জন্য হাজির করা হয়েছিল বলে যে অভিযোগ করা হয়েছে তা আমি সম্পূর্ণ অস্বীকার করছি। আমার যতখানি দৃঢ়তা আছে ততখানি দিয়েই আমার এ বক্তব্য পেশ করছি।

চরম হতাশা নিয়ে দিল্লী পেঁছে আমি দিল্লীর উদ্বাস্তু কলোনীতে গেলাম। উদ্বাস্তু শিবিরে ঘুরতে ঘুরতে আমার চিন্তাভাবনা একটা স্পষ্ট এবং চূড়ান্ত মোড় নিল। আকস্মিকভাবেই আমার সঙ্গে এক উদ্বাস্তুর দেখা হ'ল—সে অস্ত্রাদির লেনদেন করত এবং আমাকে একটি পিস্তল দেখাল। এটা পাবার জন্য আমি প্রলুব্ধ হলাম এবং তার

কাছ থেকে কিনে ফেললাম। এই পিস্তলটাই পরে আমি যে গুলি ছুঁড়েছিলাম তাতে ব্যবহার করেছিলাম। দিল্লীর রেল স্টেশনে এসে আমি ২৯শের সারা রাত চিন্তার পর চিন্তা করে কাটিয়ে দিলাম। হিন্দুদের বর্ত্তমান বিপর্যয় এবং আরও ভবিষ্যৎ বিধ্বস্ততা থামিয়ে দেওয়া বিষয়ে আমার সিন্ধান্তই ছিল চিন্তার বিষয়।

এবার, আমি রাজনৈতিক ও অন্যান্য ব্যাপারে আমার সঙ্গে বীর সাভারকরের সম্পর্ক বিষয়ে আলোচনা করব। কারণ বাদীপক্ষ এ বিষয় নিয়ে যথেষ্ট জল ঘোলা করেছেন।

২৬. একটি স্বধর্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মে আমি সহজাত প্রবণতা বশেই হিন্দুধর্ম, হিন্দু ইতিহাস ও হিন্দু সংস্কৃতিকে ভালবেসেছিলাম। সব মিলিয়ে আমি হিন্দুত্ব সম্পর্কে ছিলাম গর্বিত। তৎসত্ত্বেও যতই আমি বড় হয়ে উঠতে লাগলাম ততই কোন রাজনৈতিক বা ধর্মীয় মতবাদের গোঁড়ামীর শিকল না পরে স্বাধীন চিন্তার প্রবণতা গড়ে তুলতে লাগলাম। এই কারণেই আমি জন্মসূত্রে প্রাপ্ত জাতপাত প্রথা এবং অস্পৃশ্যতা বিলোপের জন্য সক্রিয়ভাবে কাজ করেছি। আমি জাত প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলনে প্রকাশ্যভাবে যোগ দি এবং আমি মনে করেছি যে সমস্ত রকম রাজনৈতিক ও ধর্মীয় অধিকারের ব্যাপারে সমস্ত হিন্দুকে সমান পর্যায়ের বলে গণ্য করতে হবে, নিজ যোগ্যতাতেই তারা উঁচু বা নীচু হবে—বিশেষ কোন জাতের বা বৃত্তির ঘরে জন্মলাভের আকস্মিকতাতেই তা নির্ধারিত হবে না। আমি প্রকাশ্যেই জাত-বিরোধী ভোজের আয়োজনে অংশ নিয়েছি—ঐ সব ভোজে হাজার হাজার হিন্দু অংশ নিয়েছে—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, চামার বা ভাঙ্গি জাতপাতের সব বিধি-নিষেধ উপেক্ষা করে পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হয়েছে।

২৭. আমি দাদাভাই নৌরোজী, বিবেকানন্দ, গোখলে, তিলক ইত্যাদির রচনাবাণী পড়েছি, পড়েছি প্রাচীন ও আধুনিক ভারতের ইতিহাস। সেই সঙ্গে পড়েছি ইংল্যাণ্ড, ফরাসী, আমেরিকা এবং রাশিয়ার মত সমুন্নত বিভিন্ন দেশের ইতিহাস। আমি চলতি ধারার

সমাজবাদ এবং সাম্যবাদ সম্পর্কেও চলনসই রকমের পড়াশুনা করেছি। কিন্তু সবচেয়ে বেশী করে পড়েছি বীর সাভারকর এবং গান্ধীজী যা লিখেছেন এবং বলেছেন। কারণ আমার মনে হয়েছে যে বর্ত্তমান ভারতের চিন্তা ও কর্মকে গত পঞ্চাশ বছর বা তার কাছাকাছি সময় ধরে বিবর্ত্তিত করতে এই দুই আদর্শ যতখানি অবদান রেখেছে —অন্য কোন উপাদান একক ভাবে ততখানি পারে নি।

২৮. এই সমস্ত পাঠ এবং চিন্তা আমাকে এই বিশ্বাসে উপনীত করেছে যে একজন দেশপ্রেমিক হিসাবে এবং মানবতাবাদী হিসাবে আমার প্রথম কর্ত্তব্য হচ্ছে হিন্দুত্বকে রক্ষা করা—হিন্দুদের রক্ষা করা। স্বাধীনতাকে রক্ষা করতে, প্রায় ত্রিশ কোটি হিন্দুর ন্যায়-সঙ্গত অধিকারের রক্ষাকবচ তৈরী করতে এবং পৃথিবীর মানবগোষ্ঠীর এক পঞ্চমাংশের মঙ্গল করতে এটাই কি সত্য নয়? এই নিশ্চিত প্রত্যয় আমাকে স্বাভাবিকভাবেই হিন্দু-সাংগঠনিক আদর্শে এবং তাদের কর্ম-ধারায় উদ্বুদ্ধ করে তুলল। আমি বিশ্বাস করতে থাকলাম যে একমাত্র এই পথেই আমার মাতৃভূমি হিন্দুস্থানের জাতীয় স্বাধীনতা অর্জন ও রক্ষা করা যেতে পারে। এর দ্বারাই আমার স্বদেশ, মানবতার প্রতিও যোগ্য সম্মান দেখাতে পারবে।

২৯. আমি রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘে কিছুকাল কাজ করেছি এবং অবশেষে যোগ দিয়েছি হিন্দু মহাসভায়। এই সংগঠনের হিন্দু-বাদী পতাকার তলায় আমি নিজেকে একজন স্বেচ্ছাব্রতী সৈনিক হিসাবে উৎসর্গ করেছি। এই সময়েই বীর সাভারকর হিন্দু মহাসভার সভাপতি নির্বাচিত হন। তার চৌম্বকীয় নেতৃত্বে এবং ঝটিকাবেগ-প্রচারে হিন্দু সাংগঠনিক আন্দোলনে এমন এক বিদ্যুতদীপ্ত ব্যাপকতা এল, যা ইতঃপূর্বে ছিল না। লক্ষ লক্ষ হিন্দু সাংগঠনিক তাঁকে তাদেরই মানস কল্পনার নায়ক বলে ভাবতে থাকলেন, ভাবতে থাকলেন হিন্দু সম্প্রদায়ের যোগ্যতম এবং বিশ্বস্ততম সম্প্রচারক হিসাবে। আমিও ছিলাম এদের মধ্যে একজন। আমি হিন্দু মহাসভার কার্যক্রম বিশ্বস্তভাবে সম্পাদন করতে থাকলাম এবং তারপরই সাভারকরজীর

সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত হলাম।

৩০. পরবর্ত্তী সময়ে আমার বন্ধু এবং হিন্দুদের জন্য কাজে আমার সহকর্মী শ্রীআপ্তে এবং আমি—দুজনে মিলে স্থির করলাম একটা দৈনিক পত্রিকা বের করব। হিন্দু সাংগঠনিক আন্দোলনই হবে তার ব্রত। আমরা বহু বিশিষ্ট হিন্দু সাংগঠনিক নেতার সঙ্গে দেখা করলাম এবং তাদের সহানুভূতি এবং আর্থিক সাহায্য পাবার পর হিন্দু মহাসভার সভাপতি হিসাবেই বীর সাভারকরের সঙ্গে দেখা করলাম। তিনিও আমাদের এই প্রকল্পকে সমর্থন করলেন, এবং এর জন্য যে বিপুল অর্থ দরকার তাতে তার অংশ হিসাবে পনের হাজার টাকা অগ্রিম দিলেন। তার সর্ত্ত রইল যে আমরা যত আগে সম্ভব এটাকে একটা সীমাবদ্ধ দায়সম্পন্ন কোম্পানীতে পরিণত করব এবং তাঁর টাকাটা বিধিবদ্ধভাবে যতগুলি শেয়ার হওয়া উচিৎ তাতে পরিবর্ত্তিত করব।

৩১. এরই ফলে আমরা মারাঠী দৈনিক পত্রিকা 'দৈনিক অগ্রণী' প্রকাশ শুরু করলাম এবং কিছুদিন পরেই একটা লিমিটেড কোম্পানীও রেজিস্ট্রী করা হ'ল। বীর সাভারকর এবং অন্য যারা টাকা দিয়েছিলেন, সবই ৫০০ টাকার শেয়ারে পরিণত করা হ'ল। শেঠ গুলাবচাঁদ ( শ্রীমান্ শেঠ ওয়ালচাঁদ হিরাচাঁদজীর ভাই ), শ্রী শৃঙ্গরে ( ভোর অঞ্চলের প্রাক্তন মন্ত্রী), শ্রীমান্ তালজি পেনধারকার ( কোলাপুরের বিখ্যাত ফিল্ম ব্যবসায়ী) ইত্যাদি মানুষের মত বিখ্যাত নেতা ও বিশিষ্ট ব্যক্তিরাই ছিলেন এই পত্রিকার পরিচালকবর্গ ও দাতাবর্গ। আমি আর শ্রীআপ্তে ছিলাম এই কোম্পানীর ম্যানেজিং ডাইরেক্টর। এই পত্রিকার সামগ্রিক নীতি নির্ধারণের দায়িত্ব ছিল আমার এবং আমিই সম্পাদক ছিলাম। পূর্ণতঃ সংগঠনিক রীতিতে আমরা এ পত্রিকা দীর্ঘকাল চালিয়েছি, মূলতঃ হিন্দু সাংগঠনিক নীতিরই প্রচার করেছি।

৩২. পত্রিকার প্রতিনিধি হিসাবে মিঃ আপ্তে বা আমি হিন্দু সংগঠনের অফিসে যেতাম। অফিসটা ছিল মিডিলহিল বীর সাভার-

করের বাড়ীর একতলায়। এই অফিসের দায়িত্ব ছিল সাভারকরের সচিব মিঃ ডামলের এবং সাভারকরের দেহরক্ষী মিঃ আপা কাসারের ওপর। বীর সাভারকর সর্বসাধারণের জন্য যে সব বক্তব্য পত্রিকায় প্রকাশের জন্য রাখতেন, প্রধানতঃ সেগুলি সংগ্রহ করতেই আমরা সংগঠন অফিসে যেতাম। সেই সঙ্গে সংগ্রহ করা হ'ত সভাপতির ভ্রমণসূচীর বিশেষ বিবরণ বা সাক্ষাৎকার। আমরা সাভারকরের সচিব মিঃ ডামলের কাছ থেকেই এগুলি সংগ্রহ করতাম—পত্রিকার সঙ্গে এসব কাজ চালাবার দায়িত্বও তারই ছিল। 'ফ্রি হিন্দুস্থান' নামক একটি ইংরাজী সাপ্তাহিক পত্রিকার সম্পাদনার সঙ্গে যুক্ত মিঃ এ. এস. বিদে এই বাড়ীর একতলার একগুচ্ছ ঘর নিয়ে বাস করতেন। দ্বিতীয় যে কারণে আমি বা আপ্তে সাভারকর সদনে যেতাম তা হল এই মিঃ বিদে, ডালমে, কাসার এবং অন্যান্য হিন্দুসভার কর্মীদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাত করতে। এঁরা সংগঠন অফিসে সমবেত হতেন এবং ছিলেন পরস্পরের বন্ধু। আমরা বম্বে গেলেই এই অফিসে যেতাম, সেখানে এদের সকলের সঙ্গে দেখাও হ'ত, হ'ত বন্ধুত্বপূর্ণ কথোপকথন। কখনও হিন্দু সংগঠনের কর্মপন্থা নিয়েও তাদের সঙ্গে আলোচনা হত। ওদের মধ্যে কেউ কেউ আমাদের পত্রিকার জন্য বিজ্ঞাপনও সংগ্রহ করে দিতেন।

৩৩. কিন্তু, এখানে একথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে আমাদের এই সব অনিয়মিত দেখা-সাক্ষাৎ উপরে বলা কারণগুলির জন্যই সাভারকর ভবনের একতলায় অবস্থিত সংগঠন অফিসের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকত। বীর সাভারকর দোতলায় বসবাস করতেন। বীর সাভারকরের সঙ্গে ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার খুব কমই ঘটত। আগে থেকে সময়সূচী স্থির করে তবেই এমন সাক্ষাৎকার সম্ভব ছিল।

৩৪. বছর তিনেক আগে বীর সাভারকরের স্বাস্থ্য ভীষণভাবে ভেঙ্গে পড়েছিল আর তখন থেকে তিনি প্রায়ই বিছানায় শুয়ে থাকতেন। এরপর থেকে তিনি সব গণসংযোগ এবং সামাজিক কর্ম-তৎপরতা কমিয়ে দিয়েছিলেন। এবং কমবেশি অবসরের জীবন যাপন

করতেন। এমনি করে তাঁর যোগ্য নেতৃত্ব ও চৌম্বকীয় প্রভাব যখন থেকে হারাতে হল, তখন থেকেই হিন্দু মহাসভার প্রভাব ও কর্ম-তৎপরতা সংকুচিত হয়ে এল আর ডঃ (শ্যামাপ্রসাদ) মুখার্জি যখন এ সভার সভাপতি হলেন তখন সংকুচিত হয়ে কংগ্রেসের হাতের পুতুলে পরিণত হয়েছে। একদিকে গান্ধীবাদী কূট চক্রের ভয়াবহ হিন্দু বিরোধী কার্যকলাপের আর অন্যদিকে মুসলিমলীগের পাল্টা দেওয়ার শক্তি তার আর ছিল না। এসব দেখে নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে কাজ-কর্ম ও প্রতিবাদ করে হিন্দু সংগঠন চালাবার যে নীতি হিন্দু মহা-সভা গ্রহণ করেছিল, তার কার্যকারিতার প্রতি সব আশা হারিয়েছিলাম এবং ভিতরে ভিতরে নিজেকে দৃঢ় করে তুলছিলাম। হিন্দুমহাসভার এই সমস্ত বিশিষ্ট ও বৃদ্ধ নেতাদের সঙ্গে কোন যোগাযোগ না রেখে আমি তারুণ্যদীপ্ত হিন্দু সাংগঠনিকদের নিয়ে একটা দল গড়ে কংগ্রেস এবং লীগের সঙ্গে সংগ্রামী কর্মপন্থা গ্রহণে কৃতসংকল্প হলাম।

৩৫. অসংখ্য ঘটনার মধ্যে এখানে আমি মাত্র দুটি ঘটনার উল্লেখ করব, যা অত্যন্ত বেদনার সঙ্গে আমার চোখ খুলে দিল যে আমি বা আমার মতে বিশ্বাসী তরুণেরা বীর সাভারকর এবং মহাসভার অন্যান্য বৃদ্ধ নেতাদের ওপর আর বিশ্বাস রাখতে পারি না এবং আমরা ভিতর দিকে গান্ধীজীর এবং বাইরের দিকে মুসলীমলীগের কার্যকলাপের প্রতিরোধে যে সংগ্রামী কর্মপন্থা গ্রহণ করতে চলেছি তার নেতৃত্ব দিতে ত' নয়ই, শুধু সমর্থন জানাতেও ওদের ডাকা চলে না। ১৯৪৬ সালে বা তার কাছাকাছি সময়ে সুরাবর্দী সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় হিন্দুদের ওপর বারবার যে নৃশংসতার প্রকাশ ঘটল, তাতে আমাদের রক্ত টগবগিয়ে উঠল। আর যখন দেখলাম স্বয়ং গান্ধীজী এগিয়ে এসেছেন সেই সুরাবর্দীকেই আড়াল দিতে তাকে বলছেন শাহীদ্ সুরাবর্দী—ধর্মের জন্য উৎসর্গীত আত্মা—তার প্রার্থনা সভাতেও একথা বলছেন। শুধু এই নয়, দিল্লীতে ফিরে গান্ধীজী ভাঙ্গি কলোনীর এক হিন্দু মন্দিরে প্রার্থনাসভা করতে থাকলেন। সেখানকার হিন্দু পুরোহিতদের নিষেধ অগ্রাহ্য করেও তিনি সেই মন্দিরের

প্রার্থনাসভায় কোরাণ থেকে অংশবিশেষ পড়তে থাকলেন। অবশ্যই তিনি মুসলমানদের বিরোধিতার সামনে মসজিদে গীতার অংশবিশেষ পাঠ করার সাহস করলেন না। তিনি জানতেন যে তা করলে মুসলমান-দের মধ্যে কী ভীষণ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হবে। তিনি কেবল সহিষ্ণু হিন্দুদের সব আবেগ অনুভূতিকেই নিরাপদে মাড়িয়ে চলতে পারতেন। এই বিশ্বাসটাকেই বিশ্বাস করাতে আমি গান্ধীজীর সামনে এ-কথা প্রমাণ করাতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হলাম যে আত্মসম্মানে আঘাত লাগলে অপমানিত হিন্দুরাও অসহিষ্ণু হয়ে উঠতে পারে।

৩৬ মিঃ আপ্তে ও আমি স্থির করেছিলাম যে দিল্লীতে গান্ধীজীর প্রার্থনাসভায় ধারাবাহিক বিক্ষোভ প্রদর্শন করে তার পক্ষে ঐ ধরনের সভা আয়োজন করা অসম্ভব করে তুলব। মিস্টার আপ্তে উদ্বাস্তুদের একটা বড় অংশকে দিয়ে এক মিছিল গড়ে গান্ধীজী ও শহীদ্ সুরা-বর্দীকে ধিক্কার দিতে দিতে ভাঙ্গি কলোনীতে গান্ধীজীর প্রার্থনা-সভায় ঢুকে পড়ে। ঐ প্রবল বিক্ষুব্ধ প্রতিবাদ দেখে গান্ধীজী চতুরের মত রেলিং দেওয়া ও প্রহরীবেষ্টিত দরজার পিছনে আত্মগোপন করলেন যদিও তখনও বলপ্রয়োগের বিন্দুমাত্র চিন্তাও আমাদের মথায় ছিল না।

৩৭. যদিও আমাদের এই বিক্ষোভ প্রদর্শন ছিল শান্তিপূর্ণ, তবুও সাভারকর যখন এ সংবাদ পড়লেন তখন তিনি গোপনে আমাকে ডেকে আমাদের এই কর্মপদ্ধতি গ্রহণের জন্য প্রশংসা করার পরিবর্ত্তে এমন সন্ত্রাসবাদী কৌশল গ্রহণের জন্য তিরস্কার করলেন। তিনি বললেন, 'বিশৃঙ্খল আচরণ করে তোমাদের মিটিং বা ভোটকেন্দ্র ভেঙ্গে দেওয়ার জন্য কংগ্রেসকেও আমি যেমন ধিক্কার দি, হিন্দু সাংগঠনিক-দেরও এমন অগণতান্ত্রিক আচরণকেও তেমনি ধিক্কার দিতে বাধ্য। গান্ধীজী যদি তার প্রার্থনা সভায় হিন্দু বিরোধী দীক্ষা দেন, তুমি তোমার দলের মিটিং ডেকে সে দীক্ষার বিরোধী বক্তব্য রাখতে পারতে। সম্পূর্ণ গঠনতন্ত্র-সম্মত পথে আমাদের মধ্যে সব রাজ-নৈতিক দলই তার মতের প্রচার করতে পারবে।'

৩৮. দ্বিতীয় উল্লেখ্য ঘটনাটি এর ঠিক পরেই ঘটল। ভারতবর্ষ বিভক্তিকরণ তখন সিদ্ধান্তে পরিণত হয়েছে। হিন্দুমহাসভাবাদীদের একদল তখন জানতে চাইলেন যে ভাগের পর পড়ে থাকা যে অংশ নিয়ে নতুন তথাকথিত ভারতরাষ্ট্র গড়ে উঠবে তাকে শাসন করতে যে সরকার গঠিত হবে তার প্রতি হিন্দু মহাসভার মনোভাব কেমন হবে? বিশেষতঃ সে সরকার যে কংগ্রেস সরকার হবে এটা ত' নিশ্চিত। বীর সাভারকর এবং হিন্দুমহাসভার প্রথম সারির অন্যান্য নেতা তৎক্ষণাৎ এবং দৃঢ়তার সঙ্গে বললেন, 'একটা স্বাধীন ভারতীয় রাষ্ট্র শাসন করতে যে ভারতীয় সরকারই গঠিত হোক, তাকে আমরা কখনই একটি দলের সরকার—কংগ্রেস সরকার বলে গণ্য করব না। পাকিস্হান সৃষ্টি হওয়ার জন্য আমরা যত দুঃখই করি, নবজাত স্বাধীন ভারতীয় রাষ্ট্রের সরকারকে সম্মান করা, এবং হিন্দুস্হানের জাতীয় সরকার হিসাবে মান্য করাই হবে আমাদের কর্তব্য। আমাদের ভবিষ্যৎ নীতি হবে বিশ্বস্ত হওয়া এবং সর্বতঃ ভাবে সমর্থন করা। নবার্জিত স্বাধীনতা রক্ষার এটাই হবে একমাত্র পথ। হিন্দুমহাসভার সভ্যদের পক্ষে ভারতরাষ্ট্রের প্রতি কোনো ধ্বংসাত্মক মনোভাব গৃহযুদ্ধের সৃষ্টি করতে পারে। আর তাতে গোটা ভারতবর্ষকে পাকিস্হানে পরিণত করবার নীতিহীন এবং গোপন অভিসন্ধিই পূর্ণ হবে।'

৩৯. যাই হোক, আমি ও আমার বন্ধুরা ওদের কথায় খুশী না হয়েই ফিরে এলাম। আমরা অন্তরে অন্তরে অনুভব করলাম যে বীর সাভারকরের নেতৃত্বকে বিদায় জানাবার সময় এসে গেছে, আমাদের ভবিষ্যৎ নীতি বা কর্মপন্হা সম্পর্কে তার সঙ্গে পরামর্শ করাও হয় এখুনি বন্ধ করতে হবে নতুবা তার কাছ থেকে গোপন কবতে হবে আমাদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা।

৪০. এর পরেই পাঞ্জাবে এবং ভারতের অন্যান্য স্হানে মুসলমানদের ধর্মান্ধতার নিদারুণ বহিঃপ্রকাশ ঘটল। কংগ্রেস সরকার বিহারে, কলকাতায়, পাঞ্জাবে বা অন্য সর্বত্র সেই সব হিন্দুদেরই তাড়া

করে ফিরলেন, গ্রেপ্তার করে পাঠালেন বিচারের নামে অথবা গুলি করলেন—যারা মুসলমান শক্তিকে প্রতিরোধে এগিয়ে এসেছিলেন। আমরা যা কিছু সবচেয়ে বিভীষিকা বলে ভাবতাম তাই সত্য হয়ে উঠতে থাকল। আর এর পরেও যখন দেখলাম মুসলমানদের দেওয়া আগুনে গোটা পাঞ্জাব জুড়ে লেলিহান শিখা উঠছে, হিন্দু রক্তের নদী বইছে—তখনই আলোকমালার উজ্বলতায় ও উৎসবের জমকে উদ্যাপিত হতে চলেছে ১৫ই আগষ্ট, ১৯৪৭। তারিখটি তখন আমাদের কাছে যে কি বেদনার আর লজ্জার হয়ে উঠল। আমার মত মানসিকতার হিন্দু মহাসভাবাদীরা এই সব উৎসব এবং কংগ্রেস সরকারকে বয়কট করবার আর ঐ মুসলমান আক্রমণ স্তব্ধ করতে সংগ্রামী কর্মপন্হা প্রয়োগ করবার সিদ্ধান্ত নিলাম।

৪১. হিন্দুমহাসভার কার্যকরী সমিতির মিটিং এবং সর্বভারতীয় হিন্দু সম্মেলনের সমাবেশ ১৯৪৭ সালের ৯ই আগষ্ট বা ওর কাছাকাছি সময়ে বসল দিল্লীতে—বীর সাভারকরের সভাপতিত্বে। আমি, মিঃ আপ্তে এবং আমাদের অন্য বন্ধুরা প্রথমে চেষ্টা করলাম বীর সাভারকর, ডাঃ মুখার্জি, মিঃ এল বি ভূপারকার এবং হিন্দুমহাসভার অন্যান্য নেতাকে আমাদের মতে আনতে এবং একটা সংগ্রামী কর্মপন্হা গ্রহণ করতে। মহাসভার কার্যকরী সমিতি আমাদের প্রস্তাবমত হায়দ্রাবাদ সমস্যার ব্যাপারে একটি এ্যাকশন কমিটি গড়তে রাজী হল না। বিভক্ত ভারতের নবগঠিত রাষ্ট্রের দায়িত্ব গ্রহণ করতে চলেছে যে কংগ্রেস তাকেও বয়কট করতে রাজী হলেন না। কিন্তু আমার কাছে বিভক্ত ভারতের একটি রাষ্ট্রকে মেনে নেওয়া আর যারা ভারতবর্ষকে বিভক্ত করেছে তাদের শরিক হওয়া ছিল সমান। কিন্তু এসবের পরিবর্তে আরও অগ্রসর হয়ে কার্যকর সমিতি সিদ্ধান্ত নিল এবং ১৫ই আগষ্ট, ১৯৪৭ গৃহশীর্ষে ভাগোয়াঝাণ্ডা ওঠাবার গণ-আহ্বান রাখল। বীর সাভারকর আরও এগিয়ে গেলেন এবং প্রকৃতপক্ষে তিনি ভারতীয় জাতীয়-পতাকা হিসাবে চক্র-লাঞ্ছিত ত্রিবর্ণপতাকা উড্ডীন করার ওপরেই জোর দিলেন। আমরা প্রকাশ্যে এই মনোভাবে আপত্তি জানালাম।

৪২. শুধু এই নয়, বেশিরভাগ হিন্দু সাংগঠনিকদের মতকে পাশে সরিয়ে রেখে বীর সাভারকর তার বাড়ির মাথায় ভাগোয়াঝাণ্ডার সঙ্গে চক্রশোভিত ত্রিবর্ণপতাকাও উড্ডীন করলেন—ভারতীয় জাতীয় পতাকা হিসাবে। এ ছাড়াও যখন ট্রাঙ্ককলে ডাঃ মুখার্জি কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার একটি বিভাগের দায়িত্ব গ্রহণের অনুমতি চাইলেন, তখন বীর সাভারকর দৃঢ়তার সঙ্গে তাকে জানালেন যে তিনি নিশ্চয় কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভায় যোগ দেবেন। যে নির্বাচিত দলই সরকার গঠন করুক না কেন, এই সরকার জাতীয় সরকার হিসাবেই গণ্য হবে এবং সব দেশ-প্রেমিকই তাকে সমর্থন করবে। আর তাই যদি আহ্বান আসে তাহলে সব হিন্দু সাংগঠনিকেরই কাজ হবে মন্ত্রীত্বের দায় গ্রহণ করতে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়া। জাতীয় মন্ত্রীসভা গঠন করতে ডাঃ মুখার্জির মত একজন হিন্দুমহাসভার নেতাকে আহ্বান জানানোর ভেতর দিয়ে যে সমঝোতার মানসিকতা তারা গ্রহণ করছেন বলে বোঝা যাচ্ছে—তার জন্য তিনি অভিনন্দনও জানালেন। মিঃ ভূপাতকারও ডাঃ মুখার্জিকে সমর্থন করলেন।

৪৩. ইতঃমধ্যে আমরা জানতে পারলাম যে কংগ্রেসের শীর্ষ-স্থানীয় কিছু নেতা এবং কিছু প্রাদেশিক মন্ত্রীও বীর সাভারকরের সঙ্গে দেখা করেছিলেন এবং তাদের মধ্যে এক যুক্তফ্রণ্ট গড়ে তোলার দ্রুত তৎপরতা হয়েছিল। নতুন রাষ্ট্রকে সমর্থন করাই ছিল এর লক্ষ্য—বীর সাভারকর ইতঃমধ্যেই এ নীতির অধিবক্তা হয়েছেন। স্বদেশ-প্রেমিকদের মিলিত করে একটা যুক্তফ্রণ্টের বিরোধী আমিও ছিলাম না কিন্তু যখন দেখলাম কংগ্রেস সরকার ভেড়ার মত নির্বিবাদে ক্রমেই গান্ধীজীর থাবার তলায় চলে যেতে থাকল, আর গান্ধীজীও অনশন করবার ভয় দেখানোর মত সরল চাল চেলে তার হিন্দু-বিরোধী বাতিক-গুলো কংগ্রেস সরকারের ওপর চাপিয়ে দিতে থাকলেন, তখন আমার কাছে এটা স্পষ্ট হয়ে উঠল যে এই পরিবেশে ঐ যুক্তফ্রণ্টও গান্ধীজীর একনায়কত্ব মানা দলেরই এক প্রকারভেদ হবে মাত্র এবং তার ফলে সেও হবে হিন্দুত্বের প্রতি এক বিশ্বাসঘাতকতা।

৪৪. বীর সাভারকরের এইসব পদক্ষেপের প্রত্যেকটিতেই আমি এত তীব্রভাবে আপত্তি জানিয়েছিলাম যে আমি মি: আপ্তে এবং তরুণ হিন্দু সাংগঠনিকদের মধ্যে একদল স্থির করলাম যে আমাদের কার্যকর কর্মপদ্ধতি দ্রুত পরিকল্পনা করে ফেলতে হবে এবং হিন্দুমহাসভা বা তার পুরোন নেতৃবৃন্দ-নিরপেক্ষ ভাবেই তার কাজ শুরু করতে হবে। আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম যে বীর সাভারকর সহ কারো কাছেই আমাদের এ সব মতামত গোপন রাখব না।

৪৫. আমি আমার দৈনিক পত্রিকা 'অগ্রনী'ও 'হিন্দুরাষ্ট্র'-এ হিন্দুমহাসভা এবং তার পুরোন নেতাদের মতাদর্শের সমালোচনা শুরু করলাম এবং হিন্দু সাংগঠনিকদের খোলাখুলিভাবে আহ্বান জানালাম আমাদের নিজস্ব কার্যকর পন্থা গ্রহণ করবার জন্য।

৪৬. নতুন স্বাধীন কর্মনীতি কার্যকর করবার জন্য আমি দুটি নির্দিষ্ট পন্থা হাতে নিয়ে কাজ শুরু করব বলে স্থির করলাম। শক্তিশালী কিন্তু শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ মিছিলের আয়োজন ছিল প্রথম পন্থা। এর দ্বারা হিন্দু বিক্ষোভ কতদূর সংগঠিত তার মাত্রাটা গান্ধীজীকে বুঝিয়ে দেওয়া যাবে। গান্ধীজী যে জঘন্য প্রার্থনা-সভায় হিন্দু-বিরোধী প্রচার চালান—সেখানেও পোষ্টার ইত্যাদি সহ বিক্ষোভ প্রদর্শন করে বিশৃংখলা ও হট্টগোল সৃষ্টি করাও আমার প্রথম পন্থার অন্তর্গত। দ্বিতীয় পন্থায় ছিল হায়দ্রাবাদ রাজ্যে ধর্মোন্মাদ মুসলমানেরা সেখানকার হিন্দু ভাই বোনেদের ওপর যে নৃশংসতা চালাচ্ছে, তা থেকে তাদের রক্ষার জন্য ঐ রাজ্যের সীমান্ত বরাবর বিক্ষোভ চালিয়ে যাওয়া। একনায়কতন্ত্রী ভঙ্গিতেই এমন কর্মপন্থা কার্যকর হওয়া সম্ভব। তাই আমরা স্থির করলাম আমরা এসব কথা শুধু তাদের কাছেই প্রকাশ করব যারা এতে বিশ্বাস করে এবং বিনা প্রশ্নে আমাদের নির্দেশ মানতে প্রস্তুত।

৪৭. আমার এই জবানবন্দীতে এ সব কথা হয়ত আমি এত বিস্তৃত করে বলতাম না যদি না আমার বিজ্ঞ বাদীপক্ষ তাঁর উদ্বোধনী বক্তৃতাতেই আমাকে বীর সাভারকরের হাতে সামান্য খেলার পুতুল

বলে বর্ণনা না করতেন। আমার মনে হয় এই বক্তব্যটি আমার স্বাধীন বিচার ও কর্মশক্তির প্রতি ইচ্ছাকৃত অসম্মান আরোপ। আমার প্রতি ভুল অবধারণা, যদি কিছু থাকে তবে তা মুছে দেবার জন্যই আমাকে এসব তথ্য স্থাপন করতে হল। ফলতঃ, আমার বিবরণের পরবর্তী অংশ শুরু করবার আগে আমি দৃঢ়তার সঙ্গে একথা আবার বলতে চাই যে, যে সব কার্যবিধি আমাকে অবশেষে গান্ধীজীর দিকে গুলি চালাতে বাধ্য করল সে সব ঘটনা বীর সাভারকর জানতেন—একথা সম্পূর্ণ ভুল। আমি আবার বলছি যে একথা আদৌ সত্য নয় এবং একথা সম্পূর্ণ মিথ্যা যে আমার উপস্থিতিতে মিঃ আপ্তে বা আমি নিজে বাদগেকে বলেছিলাম যে বীর সাভারকর; গান্ধীজী, নেহেরু এবং সুরাবর্দীকে শেষ করে দেবার আদেশ আমাদের দিয়েছিলেন। রাজসাক্ষী এসব কথা মিথ্যা বলেছেন। একথাও সত্য নয় যে এমন কোন ষড়যন্ত্রের সূত্রে আমরা বাদগেকে নিয়ে বীর সাভারকরকে শেষ দর্শন করতে গিয়েছিলাম এবং তিনি 'য়্যাসাসভি হোন্ হো'—'কৃতকার্য হও এবং ফিরে এস।' বলে আশীর্বাদ করেছিলেন। আমার উপস্থিতিতে মিঃ আপ্তে বা আমি কখনই বাদগেকে একথা বলিনি যে বীর সাভারকর আমাদের বলেছেন যে গান্ধীজীর শতবর্ষ পূর্ণ হয়ে গেছে এবং আমরা কৃতকার্য হবোই। আমি এত কুসংস্কারাচ্ছন্ন ছিলাম না যে আশীর্বাদের জন্য লালায়িত হব আবার এত ছেলেমানুষও ছিলাম না যে এমন ভবিষ্যৎ বাণীতে বিশ্বাস করব।

## অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে গান্ধী রাজনীতি
### ( প্রথম পর্ব )

৪৮. ১৯৪৮ সালের ৩০শে জানুয়ারীর ঘটনার প্রেক্ষাপট সম্পূর্ণভাবে এবং এককভাবে রাজনৈতিক এবং আমি তা একটু বিশদ করেই বর্ণনা করব। গান্ধীজী হিন্দু মুসলমান এবং অন্যান্য ধর্মগ্রন্থ-গুলিকে যে সম্মান করতেন বা তার প্রার্থনার সময়ে গীতা, কোরান বা বাইবেল থেকে যে অংশবিশেষ আবৃত্তি করতেন এ ব্যাপারটা আমার মধ্যে কখনও তাঁর সম্পর্কে কোন মন্দভাব জাগিয়ে তোলে নি। এই যে ধর্মকে তুলনামূলকভাবে অনুধাবন করা— একে কখনই আমার মনে আপত্তিকর বলে প্রতিভাত হয় নি। বস্তুতঃ পক্ষে এটা গুণের দিক।

৪৯. উত্তরে উত্তর-পশ্চিম-সীমান্ত প্রদেশ থেকে দক্ষিণে কেপ মোরিণ দ্বারা বন্ধ যে ভূভাগ বা পশ্চিমে করাচি থেকে পূর্বে আসাম পর্যন্ত বিস্তৃর্ণ যে ভূখন্ড বিভাজনপূর্বে ভারতবর্ষ নামে পরিচিত, তাই চিরকাল আমার কাছে আমার মাতৃভূমি। এই বিশাল দেশে বিভিন্ন বিশ্বাসের মানুষ বাস করে। আমি মনে করি এই সব বিভিন্ন বিশ্বাসের মানুষের প্রত্যেকের নিজ আদর্শ ও মতের অনুসরণ করবার সমান ও সম্পূর্ণ অধিকার আছে। এই অঞ্চলে হিন্দুরা সংখ্যা গরিষ্ঠ। এই দেশের বাইরে বিশ্বের আর কোথাও এমন কোন স্থান নেই যাকে হিন্দুরা তাদের নিজেদের দেশ বলতে পারে। স্মরণাতীত কাল থেকে হিন্দুস্থানই হিন্দুদের মাতৃভূমি এবং পুণ্যভুমি। এই দেশের খ্যাতি ও গৌরব, এর সংস্কৃতি ও শিল্প, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও দর্শন মুখ্যতঃ হিন্দুদের কাছেই ঋণী। হিন্দুদের পরেই মুসল-

মানেরা সংখ্যাগতভাবে প্রধান। তারা দশম শতাব্দী থেকে ধারাবাহিক অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছে এবং অবশেষে ভারতের বৃহত্তর অংশের ওপর মুসলমান শাসন বিস্তার করেছে।

৫০. ব্রিটিশ আবির্ভাবের আগে কয়েক শতাব্দীর অভিজ্ঞতায় হিন্দু এবং মুসলমান—উভয় সম্প্রদায়ই অনুভব করেছে যে মুসলমানেরা সারা ভারতের প্রভু হয়েও থাকতে পারবে না, তাদের তাড়িয়েও দেওয়া যাবে না। উভয়েই বুঝেছে যে উভয় সম্প্রদায়ই এখানে বসবাস করবে। মারাঠাদের অভ্যুত্থান, রাজপুতদের বিদ্রোহ এবং শিখদের জাগরণের ফলে এদেশের ওপর মুসলমান প্রভাব অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়ল। তখনও অবশ্য একদল মুসলমান ভারতে প্রাধান্য-লাভের স্বপ্ন দেখতেন কিন্তু প্রকৃতপক্ষে জনসাধারণ সহজেই বুঝত যে সে আশা অসম্ভব ছিল। অন্য দিকে ব্রিটিশরা প্রমাণ করেছিল যে তারা হিন্দু বা মুসলমানের চেয়ে রণে বা ষড়যন্ত্রে ছিল অনেক দৃঢ় এবং তাদের উন্নততর শাসনব্যবস্থা ও হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে সকলের প্রাণ ও ধনের নিরাপত্তার আশ্বাস দেওয়ায় উভয় সম্প্রদায়ই তাদের অনিবার্য বলে মেনে নিয়েছিল। তৎসত্বেও নিজেদের শক্তি ও কর্তৃত্ব বজায় রাখবার জন্য ব্রিটিশরা হিন্দু মুসলমানদের এই পার্থক্যকে জঘন্যভাবে ব্যবহার করেছে আর এ ফারাক বাড়িয়েই তুলেছে। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস শাসনতন্ত্রের মধ্যে থেকেই জনগণের জন্য শক্তি সংগ্রহের লক্ষ্য নিয়ে যে যাত্রা শুরু করেছিল, তার প্রারম্ভিক লগ্নে তাদের সামনে ছিল পূর্ণ জাতীয়তাবাদের আদর্শ যার অর্থ সমস্ত ভারতবর্ষীয়েরাই গণতান্ত্রিক-ভিত্তিতে অখন্ড ও সমান অধিকার ভোগ করবে। বিদেশী শক্তিকে হটিয়ে তার বদলে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে জনগণের শক্তি ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার এই আদর্শই আমাকে জনসেবা-মূলক জীবন শুরু করতে অনুপ্রাণিত করেছিল।

৫১. আমি আমার লেখায় এবং বক্তৃতায় সব সময় এই পরামর্শই দিয়েছি যে দেশের জনজীবনের ব্যাপারে ধর্মীয় এবং সাম্প্রদায়িক ব্যাপারগুলিকে সম্পূর্ণভাবে এড়িয়ে চলতে হবে। নির্বাচনগুলিতে,

তা সে আইনসভার ভেতরেই হোক আর বাইরেই হোক, বা মন্ত্রীসভা ভাঙ্গা গড়ায় এটাই হবে নীতি। আমি সর্বদাই যৌথনির্বাচন রীতি এবং ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের পক্ষে এবং আমার মনে হয় এটাই যুক্তিসিদ্ধ করণীয়। (এখানে আমি ১৯৪৪ সালের ডিসেম্বরে হিন্দুমহাসভার বিলাসপুরে অধিবেশনে গৃহীত সিদ্ধান্তগুলির কিছু অংশ পড়ছি ঃ সংযোজনী দ্রষ্টব্য) কংগ্রেসের প্রভাব হিন্দুদের মধ্যে দৃঢ়ভাবে মুদ্রিত হচ্ছিল। কিন্তু মুসলমান সম্প্রদায়ই প্রথম নিষ্ক্রিয় হয়ে দূরে দাঁড়াল এবং পরবর্ত্তীকালে বিদেশী শাসকদের ভেদনীতির বিধ্বংসী প্রভাবে তারা হিন্দুদের ওপর প্রাধান্য বিস্তারের উচ্চাশা পোষণে উৎসাহী হয়ে উঠল। ১৯০৬ সালে বড়লাট লর্ড মিণ্টোর প্ররোচনায় পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থার দাবীর মধ্যেই তাদের এই মানসিকতার প্রথম আভাস দেখা গেল। সংখ্যালঘুদের সংরক্ষণের অজুহাতে ব্রিটিশ সরকার এ দাবী মেনে নিল। কংগ্রেস দল একটা মৌখিক আপত্তি জানাল কিন্তু ধীরে ধীরে এই পৃথক হওয়ার নীতিকে মেনে নিতে থাকল এবং সর্বশেষে ১৯৩৪ না গ্রহণ না বর্জনের কুখ্যাত নীতির ফলে মেনেই নিল।

৫২. দেশের বিচ্ছিন্নতার দাবী এমনি করেই সৃষ্ট ও তীব্র হয়ে উঠেছিল। সূচনায় যা ছিল প্রান্তিক সূক্ষ্মরেখার মত, পরিণতিতে তাই হল পাকিস্থান। ভুল শুরু হয়েছিল একটা প্রশংসিত প্রস্তাবের ভেতর দিয়ে ; তা এই যে, বিদেশীদের হঠাতে ভারতের সব সম্প্রদায়কে নিয়ে একটা যুক্তফ্রন্ট গড়ে তোলা হবে আর প্রত্যাশা করা হয়েছিল যে এর ফলেই কালক্রমে বিচ্ছিন্নতাবাদ দূর হয়ে যাবে।

৫৩. নীতিগতভাবে যৌথ-নির্বাচন-প্রথার পরামর্শ দেওয়া সত্ত্বেও মুসলমানদের দাবীর ঐকান্তিকতা দেখে সাময়িক ভাবে পৃথক নির্বাচনকে মেনে নেওয়া পুনর্বিবেচনার ফলে আমি সমর্থন করে-ছিলাম। তবে আমি প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জনসংখ্যার যথার্থ অনুপাতে প্রতিনিধিত্বের ওপর বেশি জোর দিলাম—তার বেশি নয়। আমি এ মতকে সর্বদা সমভাবে মেনেছি।

৫৪. একদিকে ব্রিটিশ প্রভুদের প্রেরণায় আর অন্য দিকে গান্ধীজীর নেতৃত্বাধীন কংগ্রেসের উৎসাহে মুসলীম লীগ সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে তাদের দাবী বাড়িয়েই চলল। মুসলমান সমাজ নিরবচ্ছিন্ন-ভাবে মুসলীম লীগকে সমর্থন করে চলল। উপর্যুপরি নির্বাচনগুলি প্রমাণ করল যে মুসলমান সমাজের ধর্মীয় গোঁড়ামী এবং অশিক্ষাকে মুসলীমলীগ ভালোভাবেই কাজে লাগাতে পেরেছে আর এমনি করে উৎসাহিত হয়ে মুসলীমলীগ বিচ্ছিন্নতার নীতির মাত্রা বছরের পর বছর বাড়িয়েই চলল।

৫৫. যেমন আমি আগেই দেখিয়েছি মুসলীমলীগের সম্প্রদায় ভিত্তিক নির্বাচনের অযৌক্তিক দাবীর নীতিতে আপত্তি জানান সত্ত্বেও কংগ্রেস প্রথমতঃ ১৯১৬ সালের লক্ষ্ণৌ চুক্তি দ্বারা এবং শাসনতন্ত্রের পরবর্ত্তী সংশোধনগুলির প্রত্যেকটির দ্বারা ঐ নীতিকে মেনেই নিয়ে-ছিল। জাতীয়তাবাদ ও গণতন্ত্র থেকে এই বিচ্যুতি পরিণামে কংগ্রেসের পক্ষে এমন এক চরম দুঃখের কারণ বলে প্রমাণিত হয়েছে—যার জন্য মূল্য দিতে হয়েছে প্রচুর।

৫৬. ১৯২০ খৃষ্টাব্দ থেকে অর্থাৎ লোকমান্য তিলক লোকান্তরিত হওয়ার পর থেকেই কংগ্রেসের ওপর গান্ধীজীর প্রভাব প্রথম বেড়ে ওঠে এবং পরে সর্বাত্মক হয়। জন জাগরণের জন্য তার কাজগুলি ব্যাপকতায় বিস্ময়কর ছিল এবং তা আরো জোরদার হয়েছিল তাঁর সত্য ও অহিংসার জিগিরে– গোটা দেশে তিনি একগুঁয়ে ভাবেই এ জিগির ছড়িয়ে বেড়াচ্ছিলেন। কোন আলোকপ্রাপ্ত বা বুদ্ধিমান মানুষই এই নীতিগুলিতে আপত্তি করতে পারত না আর বস্তুতঃ পক্ষে এর মধ্যে নতুনও কিছু ছিল না—মৌলিক কিছুও নয়। গঠনতন্ত্র সম্মত যে কোন গণ আন্দোলনেই এই নীতিগুলি অন্তর্নিহিত ভাবে থাকে। একথা যদি কল্পনা করা হয় যে মানব সমাজের একটা বড় অংশ তাদের দৈনন্দিন স্বাভাবিক জীবনে এইসব মহিমান্বিত নীতির প্রতি দ্বিধাশূন্য আনুগত্য প্রদর্শন করবে বা করতে পারা সম্ভব—তবে তা নেহাতই স্বপ্ন। প্রকৃতপক্ষে যে কোন মানুষই নিজের প্রিয়-

জন বা দেশের জন্য সম্মানবোধে, কর্ত্তব্যে বা ভালোবাসায় অহিংসার নীতির প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করে ফেলতে বাধ্য হয়। আমি কখনই এ কথা বিশ্বাস করব না যে একদল আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে সশস্ত্র প্রতিরোধ অন্যায়। শক্তি প্রয়োগ করে এমন এক শত্রুর প্রতিরোধ করা বা সম্ভব হ'লে তাকে পরাজিত করাকে আমি ধর্ম এবং নৈতিক কর্ত্তব্য বলেই মনে করি। এক তীব্র যুদ্ধে রামচন্দ্র রাবণকে হত্যা করেন এবং সীতাকে উদ্ধার করেন। কংসের অত্যাচার নিবারণ করতে কৃষ্ণ তাকে হত্যা করেন। মহাভারতে শ্রদ্ধেয় ভীষ্ম সহ বহু আত্মীয়ের সঙ্গে অর্জুন যুদ্ধ করেন এবং তাদের হত্যা করেন—কারণ তারা ছিলেন আক্রমণকারীর পক্ষে। এ আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে রাম, কৃষ্ণ বা অর্জুনকে হিংসার অপরাধে অভিযুক্ত করার অর্থ মানুষের কর্মধারার প্রতিই অজ্ঞতা প্রদর্শন করা। ছত্রপতি শিবাজী মহারাজের বীরোচিত যুদ্ধই ভারতে মুসলমান আধিপত্যকে প্রথম স্তব্ধ করেছিল এবং পরিণামে ধ্বংস করেছিল। আফজল খাঁকে শিবাজীর হত্যা করাটা কৌশলগত দিক থেকে সম্পূর্ণ ঠিক, না হলে, তাকেই আফজল খাঁ হত্যা করত। শিবাজী, রাণা প্রতাপ এবং গুরু গোবিন্দকে বিপথগামী দেশ প্রেমিক বলে নিন্দিত করার মধ্যে গান্ধীজী শুধু আত্মগর্বই জাহির করেছেন।

৫৭. প্রত্যেক জাতীয় নায়কই স্বদেশের ওপর সমকালের আক্রমণ-কারীকে প্রতিরোধ করে, জনগণকে রক্ষা করে, বহিরাগত ধর্মোন্মাদদের বর্বরতা ও পাশবিকতার হাত থেকে মাতৃভূমিকে উদ্ধার করেছেন আক্রমণ কারীদের কবল থেকে। উল্টোদিকে মহাত্মার অপ্রতিহত নেতৃত্বের ত্রিশ বছরেরও বেশীকালে আরও বেশী মন্দির অপবিত্র করা হয়েছে, বল-প্রয়োগে বা কৌশলে আরও বেশি ধর্মান্তরিত করা হয়েছে, নারীর ওপর বলাৎকার হয়েছে আরও বেশী এবং সর্বশেষে হারাতে হয়েছে দেশের এক তৃতীয়াংশ। তাই এটাকে আশ্চর্যজনক বলেই মনে হয় যে অন্ধেও যা দেখতে পায় মহাত্মার অনুসরণকারীরা তাও দেখতে পান না। দেখতে পান না যে শিবাজী, রাণা প্রতাপ বা গুরু গোবিন্দের

পাশে মহাত্মা ছিলেন নিতান্ত খর্বাকৃতি বামন। এই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্বরূপ নায়কদের প্রতি গান্ধীজীর এই ধরণের মন্তব্য, সত্যি কথা বলতে গেলে, প্রগল্‌ভতার ( বা দাম্ভিকতার ) প্রকাশ।

৫৮. সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশদের পৃষ্ঠপোষকতায় এবং মুসলমানদের বলপ্রয়োগের মুখে কাপুরুষোচিত আত্মসমর্পন করে ভারত বিভাজনকে মেনে নিয়ে যে ষড়যন্ত্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছে, তারাই গান্ধীজীর হত্যার ব্যাপারটাকে তাদের স্বার্থপূরণের লক্ষ্যে সহস্র কুটিল উপায়ে ব্যবহার করেছে। কিন্তু ইতিহাস যশের কুলুঙ্গির যোগ্য স্থানেই স্থাপন করবে তাদেব। এটাকে আপাত বিরোধী মনে হলেও পরম সত্য যে গান্ধীজী এমনই প্রবল শান্তিবাদী ছিলেন যে সত্য আর অহিংসার নামে সারা দেশে টেনে এনেছিলেন অকথিত বিপর্যয় যেখানে রাণা প্রতাপ, শিবাজী বা গুরু গোবিন্দ দেশবাসীর জন্য এনে দিয়েছিলেন স্বাধীনতা আর এজন্য তারা আবহমান কাল ধরে দেশবাসীর হৃদয়ে সমুজ্জ্বল হয়ে থাকবেন।

৫৯ গান্ধীজীর রাজনৈতিক জীবনকে যথাযুক্তভাবেই তিনটি শিরোনামে বিভক্ত করা যায়—নীচে তাই করা হয়েছে। তিনি ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি কোন সময়ে ইংলণ্ড থেকে ভারতে ফিরে আসেন এবং সঙ্গে সঙ্গেই ভারতের জন-জীবনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। দুর্ভাগ্যবশে তাঁর স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তনের স্বল্প ব্যবধানে ফিরোজশাহ মেহ্‌তা এবং শ্রী গোপালকৃষ্ণ গোখলে লোকান্তরিত হন। দ্বিতীয় জনকে গান্ধীজী গুরু বলতেন। গান্ধীজী আমেদাবাদে সবরমতী নদীর তীরে এক আশ্রম বানিয়ে সত্য ও অহিংসাকে তার মন্ত্র হিসাবে গ্রহণ করে কাজ শুরু করেন। মুসলমান তোষণের জন্য প্রয়োজন হলে তিনি তাঁর এই ঘোষিত নীতির বিরুদ্ধ কাজও করতেন এবং এ ব্যাপারে তার কোন বিবেক দংশনও ছিল না। সত্য আর অহিংসা আদর্শ হিসাবে চমৎকার এবং কোনো কাজ করবার নীতি হিসাবেও প্রশংসনীয়। যাইহোক তাকে দৈনন্দিন প্রকৃত জীবনে প্রয়োগ করতে হবে—হাওয়ায় নয়। আমি পরে দেখাচ্ছি যে গান্ধীজী নিজেই তাঁর এই অতিগর্বিত আদর্শকে স্পষ্টভাবে ভঙ্গ করার অপরাধে অপরাধী।

৬০. আগে আমি উল্লেখ করেছি যে গান্ধীজীর রাজনৈতিক জীবন তিন শিরোনামে বিভক্ত হওয়ার যোগ্য।

(i) ১৯১৫ থেকে ১৯৩৯-৪০ সালের মধ্যবর্ত্তী সময়।

(ii) ১৯৩৯-৪০ থেকে ১৯৪৭ সালের ৩রা জুন পর্যন্ত—যখন মহাত্মা গান্ধীজীর নেতৃত্বে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস পাকিস্হান মেনে নিয়ে জিন্নার কাছে আত্মসমর্পন করল।

(iii) বিভাজনের পর থেকে পাকিস্হানকে ৫৫ কোটি টাকা দিয়ে দেবার সমর্থনে আমরণ অনশনের সূচনা যার অল্প পরেই মহাত্মার মৃত্যু—এর মধ্যবর্ত্তী সময়।

৬১. ১৯১৪ সালের শেষে গান্ধীজী যখন ভারতবর্ষে ফিরে এলেন তখন সঙ্গে নিয়ে এলেন দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়দের দুঃসাহসী নেতৃত্ব দেওয়ার সমুচ্চ প্রশংসা। সেদেশে সাদা চামড়ার আধিপত্যের বিরুদ্ধে—জাতীয় আত্মমর্যাদা বোধের যথার্থতা প্রমাণে ও অধিকার প্রতিষ্ঠায় আর সেই সঙ্গে নাগরিকতা লাভের দাবীতে যে সংগ্রাম শুরু হয়েছিল—তার সর্বোচ্চ স্হানে নিজেকে স্হাপন করতে পেরেছিলেন গান্ধীজী। তিনি সেখানে হিন্দু-মুসলমান এবং পারসিকদের দ্বারা সমান ভাবে সম্মানিত ও মান্য ছিলেন—দক্ষিণ আফ্রিকায় সমস্ত ভারতীয়ের অবিসংবাদী নেতা ছিলেন তিনি। তাঁর জীবনযাত্রার সারল্য, উদ্দেশ্যের প্রতি স্বার্থশূন্য অনুরাগ (এই গুণটিকে তিনি তাঁর চরিত্রেই পরিণত করেছিলেন), তাঁর আত্মত্যাগ, আফ্রিকার উপনিবেশকদের জাতিগত ঔদ্ধত্যের বিরুদ্ধে সংগ্রামে তাঁর ঐকান্তিকতা—ভারতীয়দের সম্মান বাড়িয়েছিল। ভারতবর্ষের সকলের কাছেও তিনি প্রিয় হয়ে উঠেছিলেন।

৬২. তিনি যখন এদেশে ফিরে এসে স্বাধীনতা সংগ্রামে দেশবাসীকে রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করলেন তখন ন্যায়সঙ্গত ভাবেই তিনি প্রত্যাশা করলেন যে আফ্রিকার মত এখানেও তিনি সব সম্প্রদায়ের অসন্দিগ্ধ আস্হা ও শ্রদ্ধা লাভ করবেন। কিন্তু অচিরেই দেখলেন যে এক্ষেত্রে তিনি হতাশ হয়েছেন। ভারতবর্ষ দক্ষিণ আফ্রিকা নয়।

দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়েরা কয়েকটি মৌলিক অধিকার মাত্র দাবী করেছিল—যেগুলি থেকে তারা ছিল বঞ্চিত। তাদের ছিল কতকগুলি সার্বজনীন তীব্র অভিযোগ। ব্রিটিশ এবং বুয়রেরা তাদের পাপোষের মত ব্যবহার করত। হিন্দু-মুসলমান পারসিকেরা তাই একক হয়ে দাঁড়িয়েছিল তাদের একই শত্রুর বিরুদ্ধে। দক্ষিণ আফ্রিকার সরকারের সঙ্গে তাদের আর কোন বিবাদ ছিল না। স্বদেশে ভারতীয়দের সমস্যা ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। আমরা লড়ছিলাম স্বায়ত্বশাসন, স্বকীয় সরকার তথা স্বাধীনতার জন্য। ঐ রাজকীয় শক্তিকে ছুঁড়ে ফেলে দেবার জন্য আমরা বদ্ধপরিকর হয়ে উঠেছিলাম আর ঐ রাজশক্তি যে কোন উপায়ে সেই শাসন চালিয়ে যেতে দৃঢ়সঙ্কল্প হয়েছিল। উপায় হিসাবে তারা বিভেদনীতিও প্রয়োগ করেছিল—হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে বিরোধ তাতে তীব্রই হয়েছিল। এমনি ভাবে গান্ধীজী শুরুতেই এমন এক সমস্যার সম্মুখীন হলেন, যার মত সমস্যার সঙ্গে দক্ষিণ আফ্রিকায় তাঁর পরিচয় ছিল না। প্রকৃতপক্ষে দক্ষিণ আফ্রিকায় তার যাত্রা ছিল আগাগোড়া নির্ঝঞ্ঝাট। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সেখানে স্বার্থের সাম্য ছিল সম্পূর্ণ আর প্রত্যেকেই গান্ধীজীকে তার স্বার্থের সংরক্ষক ভাবতেন। কিন্তু ভারতবর্ষে সম্প্রদায়ভিত্তিক ভোট ব্যবস্থা বা পৃথক নির্বাচক মণ্ডলী এবং এমন সব ব্যবস্থাগুলি ইতঃমধ্যেই জাতীয় সংহতিকে শিথিল করে দিয়েছিল। ব্রিটিশ সরকার সম্প্রদায় বিশেষকে অনুগ্রহ দেখাবার বিচ্ছেদাত্মক ও বিধ্বংসক যে নীতি চরম গোঁয়াতুর্মি করে বিবেকশূন্য ভাবে চালিয়ে যাচ্ছিলেন, এগুলির বেশির ভাগই ছিল তার অন্তর্গত। তাই গান্ধীজী বুঝলেন যে দক্ষিণ আফ্রিকার মত ভারতেও হিন্দু মুসলমানের নিঃসংশয়িত নেতৃত্ব পাওয়া সহজ ব্যাপার নয়। তিনি সমস্ত ভারতীয়দের নেতৃত্বেই অভ্যস্ত ছিলেন আর খোলাখুলি ভাবে বললে তিনি একটা বিভক্ত দেশের নেতৃত্বের কথা বুঝতেন না। তার নীতিনিষ্ঠ মনে এমন এক সেনাদলের সৈনাধিপত্য গ্রহণের কথা চিন্তাও করতে পারতেন না—যারা নিজেদের মধ্যে বিভক্ত হয়েই রয়েছে।

৬৩. ভারতবর্ষে তাঁর প্রত্যাবর্তনের পরের প্রথম পাঁচ বছর ভারতীয় রাজনীতির চূড়ান্ত নেতৃত্ব গ্রহণ করবার সুযোগ তাঁর ছিল না। দাদাভাই নৌরজী, শ্রী ফিরোজ সাহ মেহ্‌তা, লোকমান্য তিলক এবং শ্রী গোপালকৃষ্ণ গোখলে এবং অন্যান্যেরা তখনও বেঁচে ছিলেন। গান্ধীজী সম্মানিতও ছিলেন, জনপ্রিয়ও ছিলেন কিন্তু এই সমস্ত প্রবীণদের তুলনায় কি বয়সে কি অভিজ্ঞতায় তিনি ছিলেন এদের চেয়ে নীচের ধাপের। কিন্তু অপ্রতিরোধ্য ভাগ্য মাত্র পাঁচ বছরের মধ্যে এদের সকলকে সরিয়ে দিল আর ১৯২০ সালের আগষ্টে লোকমান্য তিলকের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে গান্ধীজী একেবারে প্রথম সারিতে উন্নীত হলেন।

৬৪ তিনি দেখলেন যে বিদেশী শাসকেরা তাদের 'বিভেদ আন-ও শাসন কর' নীতির প্রয়োগে ইতঃমধ্যেই মুসলমানদের স্বদেশপ্রেমকে কলুষিত করে তুলেছে আর তিনি যদি সৌভ্রাতৃত্ববোধ ও স্বদেশবোধ জাগিয়ে তুলতে না পারেন, তবে স্বাধীনতার যুদ্ধে সম্মিলিত পতাকা উত্তোলনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ খুব কমই অবশিষ্ট আছে। তাই হিন্দু-মুসলমান ঐক্যকেই তাঁর রাজনীতির ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করলেন। ব্রিটিশ সরকারের কৌশলের পাল্টা চাল হিসাবে তিনি মুসলমান সমাজের সঙ্গে একান্ত সৌহার্দ্রপূর্ণ মনোভাব দেখাতে থাকলেন এবং মুসলমানদের উদার এবং অমিতাচারী নানা প্রতিশ্রুতি দিতে থাকলেন। ভারতীয় গণতান্ত্রিক-জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে যতক্ষণ এই সব প্রতিশ্রুতি দেওয়া হচ্ছিল, ততক্ষণ অবশ্য এ নীতি দূষনীয় ছিল না। কিন্তু এই ঐক্য প্রচেষ্টার সবচেয়ে জরুরী ঐ ব্যাপারটিই গান্ধীজী সম্পূর্ণ ভুলে গেলেন—তার কি ফল হল তা আমরা আজ সকলেই জানি।

৬৫. এদেশের সম্পদের মধ্য থেকে মুসলমান সমাজকে অবিরাম সুযোগ অনুমোদন করে করে ব্রিটিশ সরকার ভারতীয় সম্প্রদায়-গুলিকে বিচ্ছিন্ন করে রাখতে পেরেছিল। ১৯১৯ সালের কাছাকাছি মুসলমানদের আস্থা লাভের জন্য গান্ধীজীও একেবারে মরিয়া হয়ে উঠলেন এবং একটার পর একটা অসম্ভব প্রতিশ্রুতি দিয়ে চললেন।

অবশেষে তিনি মুসলমানদের একেবারে সর্ত না লেখা অথচ সই করা দলিল দিয়ে বসলেন। তিনি এদেশে খিলাফৎ আন্দোলন সমর্থন করে বসলেন। তিনি জাতীয় কংগ্রেসের সমর্থনও টেনে আনলেন এই আন্দোলনের পিছনে। সাময়িকভাবে গান্ধীজী সাফল্য লাভ করলেন বলে মনে হ'ল। সর্বভারতীয় মুসলমান নেতারা তার পিছনে এসে দাঁড়ালেন। এই ১৯২০-২১ সালে মিঃ জিন্নার চিহ্নমাত্র ছিল না। প্রকৃতপক্ষে, তখন আলিভ্রাতারাই ছিলেন মুসলমানদের নেতা। গান্ধীজীও এদের মুসলমান সমাজের প্রতিশ্রুত নেতা বলে স্বাগত জানালেন। তিনি এই আলিভাইদের জন্য কি না করলেন—অফুরন্ত সুযোগ আর স্তোকবাক্যে একেবারে আকাশে তুলে ছাড়লেন—কিন্তু যা তিনি চেয়েছিলেন, তা পেলেন না। মুসলমানেরা খিলাফৎ কমিটিকে কংগ্রেস থেকে সম্পূর্ণ পৃথক এক রাজনীতিভিত্তিক ধর্মীয় সংস্থা হিসাবেই রেখে দিল আর অচিরেই মোপলা বিদ্রোহ দেখিয়ে দিল, যে জাতীয় ঐক্যের স্বপ্ন গান্ধীজীর বুকে ছিল, যার জন্য তিনি এতবড় বাজি ধরেছিলেন, তার বিন্দুমাত্রও মুসলমানদের ছিল না। স্বভাবতঃ এসব ক্ষেত্রে যা হয়, এখানেও তাই হল—ব্যাপক পরিমাণ হিন্দুহত্যা, জোর করে অসংখ্যজনকে ধর্মান্তরকরণ, ধর্ষণ ও অগ্নি-সংযোগ। ব্রিটিশ সরকার বিদ্রোহের ফলে এতটুকুও বিচলিত হলেন না বরং কয়েক মাস পরে তাদের সমর্থনই করলেন। হিন্দু মুসলমান ঐক্যের আনন্দটুকু ভোগ করতে দিলেন গান্ধীজীকে। খিলাফৎ আন্দোলন ব্যর্থ হল, গান্ধীজীও পড়ে গেলেন। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ হল দৃঢ়তর আর মুসলমানেরা হল আরও ধর্মীয় গোঁড়ামীমত্ত। আর ফলটা হিন্দুদের ওপর হয়ে দাঁড়াল শাস্তিমূলক। কিন্তু বৃটিশ শাসকদের কৌশলে গান্ধীজী যতই অকুতোভয় হয়ে উঠতে থাকলেন ততই হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের ভৌতিক ছায়ার অনুসরণে নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দিতে থাকলেন। ১৯১৯ সালের আইন দ্বারা পৃথক নির্বাচক মণ্ডলীর রীতিকে আরও প্রবর্দ্ধিত করা হল, ধর্মভিত্তিক প্রতিনিধিত্ব শুধু বিধায়কমণ্ডলী বা স্থানীয় শাসন সংস্থাগুলিতেই নয়—মন্ত্রীমণ্ডলী

গঠনেও ঐ নীতি গৃহীত হল। চাকরীও দেওয়া হতে থাকল সম্প্রদায় ভিত্তিতে আর ব্রিটিশ প্রভুরা মুসলমানদেরই বেশি বেশি উচ্চপদ দিতে থাকলেন, তাদেব উৎকর্ষের জন্য নয়—স্বাধীনতার সংগ্রাম থেকে দূরে থাকবার জন্য এবং ইসলামে বিশ্বাসী বলে। সংখ্যালঘু সংরক্ষণের নাম করে সরকারের এই মুসলমান তোষণ, ভারত-রাষ্ট্রের রাজনৈতিক অবয়বকে ভেদ করে চলে গেল। মুসলমান মনের এই সার্বিক দূষণের প্রতিবেদক হিসাবে মহাত্মার ঐ অর্থহীন স্লোগানের কোন মূল্যই ছিল না। কিন্তু গান্ধীজী নরম হলেন না। তখনও তিনি হিন্দু মুসলমান-দের একক নেতৃত্বের আশায় মত্ত হয়ে রইলেন, আর যতই তিনি হারতে থাকলেন ততই তিনি উদ্ভট উপায়ে মুসলমানদের উৎসাহী করতে লেগে থাকলেন। পরিস্থিতি ক্রমেই খারাপ হতে থাকল এবং ১৯২৫ সালে এটা সকলের কাছেই স্পষ্ট হয়ে উঠল যে এ ব্যাপারে আগা-গোড়াই ইংরেজ সরকার জিতে এসেছে আর গান্ধীজী সেই প্রবাদের জুয়ারীর মত প্রতিবারেই বাজি চড়িয়েই চলেছেন। সিন্ধুপ্রদেশ ভাগ করায় এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ গঠনে সম্মতি দিলেন। জাতীয় সংগ্রামে মুসলমানেরাও অংশ নেবে এই মিথ্যা আশায় মুসলীম-লীগের একের পব এক অগণতান্ত্রিক দাবী মেনে চললেন। তিনি। এতদিনে আলিভাইদের প্রভাব কমে এসেছে। সে জায়গায় মঞ্চ দখল করেছেন জিন্না। তিনি কংগ্রেস এবং ইংরেজ দুপক্ষের কাছ থেকেই সুযোগ লুটতে থাকলেন। সরকার বা কংগ্রেস যে সুযোগ দেয়, সেটুকু নিয়েই তিনি আবার বেশীর জন্য দাবী তোলেন। বম্বে থেকে সিন্ধু প্রদেশ আর পাঞ্জাব থেকে উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ পৃথক করবার পরেই বসল গোল টেবিল বৈঠক। সেখানে সংখ্যা-লঘুদের প্রশ্নটাই গুরুতর হয়ে উঠল। ফেডারেশন গঠনের ব্যাপারে জিন্না একা বিরোধী হয়ে রইলেন। তখন গান্ধীজী নিজে শ্রম-মন্ত্রী ম্যাকডোন্যাল্ডকে সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারা মেনে নিতে বললেন। এর দ্বারা দেশব্যাপী অনৈক্যের বীজ আবার ছড়ান হ'ল। এই সাম্প্রদায়িকতার নীতি আরও দৃঢ়ভাবে প্রোথিত হ'ল ১৯৩৫ সালের

আইনের পুনর্গঠনে। মিঃ জিন্না কিন্তু এ পরিস্থিতির পুরো সুযোগ নিলেন। ফেডারেশন গড়বার কথা ছিল আর যা গড়া হলে ভারতবর্ষের জাতীয়তাবোধ সংহত হ'ত—মিঃ জিন্না তাকে কোন দিনই প্রসন্নভাবে গ্রহণ করেননি—আর তাই তা স্থগিদ রইল, কংগ্রেস বেশ ছলভরা নীতি গ্রহণ করল—'না-গ্রহণ না-বর্জন'—প্রকৃত প্রস্তাবে তারা সমর্থন করল সাম্প্রদায়িক বিভাজনকে—মৌন সম্মতি জানালেন। এল ১৯৩৯-৪০ সাল। যুদ্ধের সময়। মিঃ জিন্না খোলাখুলি একটা মনোবাঞ্ছা প্রকাশ করলেন—একটা স্বতঃপ্রবৃত্ত নিরপেক্ষতা—সেই সঙ্গে এও ঘোষণা করলেন যে মুসলমানদের অধিকার স্বীকার করলেই তিনি যুদ্ধে সমর্থন জানাবেন। ১৯৪০ সাল। যুদ্ধ শুরু হবার দশ মাসের মধ্যে মিঃ জিন্না দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে পাকিস্থানের দাবী তুললেন। ভারতের সব অঞ্চলেই যে হিন্দু-মুসলমানেরা বিমিশ্রভাবে বাস করে—একথা তিনি আমলই দিলেন না। ভারতের কোন প্রদেশে হয়ত হিন্দুরাই বেশি, মুসলমানেরা কম—কোথাও তার উল্টোটাও সত্যি। কিন্তু কোন প্রদেশেই হিন্দু বা মুসলমান কম সংখ্যায় বাস করতেন না। আর তাই ভারতবর্ষ ভাগ হলেও কিন্তু সংখ্যালঘু সমস্যা অমীমাংসিতই থেকে যাচ্ছে।

৬৬. পাকিস্থানের চিন্তাটাকে ব্রিটিশ সরকারের খুবই ভাল লাগল কারণ এর ফলে যুদ্ধের সময়ে তাদের বিব্রত করার পরিবর্তে হিন্দু-মুসলমানেরা নিজেরাই বিচ্ছিন্ন হয়ে রইল। যুদ্ধের প্রতিক্রিয়ার ব্যাপারে মুসলমানেরা বাধা দিলেন না, কংগ্রেস কখনও প্রতিবাদ করলেন কখন ও নীরব রইলেন। উল্টো দিকে হিন্দুসভা উপলব্ধি করলেন যে হিন্দু যুবকদের সামনে যুদ্ধ সামরিক-শিক্ষার এক সুযোগ এনে দিয়েছে। এই শিক্ষা আমাদের জাতির পক্ষে ছিল একান্ত প্রয়োজনীয় আর বৃটিশ সরকার ইচ্ছে করেই ত' এশিক্ষা থেকে আমাদের (হিন্দুদের) বঞ্চিত করে রেখেছিল। এই যুদ্ধ স্থল-নৌ বা বিমান বাহিনীর দরজা খুলে দিয়েছিল আর হিন্দুসভা হিন্দুদের সামরিক-শিক্ষায় শিক্ষিত

হয়ে ওঠার ওপর গুরুত্ব দিয়েছিল। এর ফলে ১/২ মিলিয়ন হিন্দু যুদ্ধ-বিদ্যা শিখেছিল এবং আধুনিক যুদ্ধের অস্ত্রাদি চালনায় দক্ষতা অর্জন করেছিল। আজ কংগ্রেস হিন্দুসভার ঐ দূরদৃষ্টির সুফল ভোগ করছে—তারা কাশ্মীরে যে সেনাদল প্রয়োগ করেছেন, ব্যবহার করেছেন হায়দ্রাবাদে তা তারা প্রস্তুত অবস্থাতেই পেয়েছেন এই সব মানুষেরই ঐ জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গির ফলে। ১৯৪২ সালে কংগ্রেস স্বাধীনতার নামে 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন শুরু করলেন। সব প্রদেশেই কংগ্রেসীরা সংহিস আস্ফালন করলেন। উত্তর বিহারে বোধহয একটা রেল-স্টেশনও বাকী রইল না, যা কংগ্রেসের অসহযোগ আন্দোলনকারীবা না পুড়িয়ে বা ধ্বংস না করে রেখেছিল। কংগ্রেসের সমস্ত বিরোধিতা সত্ত্বেও ১৯৪৫ সালের এপ্রিলে পরাজয বরণ করল জার্মানীরা আর ১৯৪৫ সালের আগষ্টে পরাজয় স্বীকার করল জাপানীরা। জাপানীদের প্রতিরোধ শক্তিকে একেবারে বিধ্বস্ত করে দিল অ্যাটমবোমা, আর ব্রিটিশ শক্তি কংগ্রেসী বিরোধের মুখেও জাপান ও জার্মানীকে জয করল। ১৯৪২-এর 'ভাবত ছাড়ো' আন্দোলন পূর্ণতঃ ব্যর্থ হ'ল। ব্রিটিশরা বিজয়মত্ত—কংগ্রেস নেতারা স্হিব করলেন তাদের সঙ্গে সমঝোতা করতে হবে। পরবর্ত্তী বৎসরগুলিতে কংগ্রেসের নীতিকে যথার্থভাবে 'যে কোন সর্ত্তে শান্তি' এবং 'যে কোন মূল্যে শক্তিশীর্ষে কংগ্রেস' বলে বর্ণনা করা যায়। কংগ্রেস ব্রিটিশদের সঙ্গে আপোষ করলেন। ব্রিটিশরা ওদের বসালেন শক্তিশীর্ষে, পরিবর্ত্তে কংগ্রেস জিন্নার সহিংস নীতির কাছে আত্মসমর্পণ করে ভারতবর্ষের এক তৃতীয়াংশে এক সম্পূর্ণ জাতিভিত্তিক এবং ধর্মভিত্তিক পৃথক রাষ্ট্র স্বীকার করে তার হাতে তুলে দিলেন আর এই হস্তান্তর প্রক্রিয়ায় কুড়ি লক্ষ লোক ধ্বংস হল। পণ্ডিত নেহেরু এখন বার বার ঘোষণা করেন যে কংগ্রেস ধর্ম-নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের পক্ষে আর যারা তাকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে মাত্র আগের বছরই কংগ্রেস ধর্মভিত্তিক সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র মেনে নিয়েছে, তাদের তিনি তীব্রভাবে ধিক্কার দেন। ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের পক্ষে তাঁর এই সানুরাগ গলাবাজী অতিরিক্ত সতীপনা দেখান ছাড়া আর কি?

৬৭. আলোচনাকক্ষে আহূত হবার পূর্বসর্ত্ত হিসাবে কংগ্রেস 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন প্রত্যাহার করেছিল, জাপানীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ব্রিটিশকে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল আর বড়লাট ওয়েভেলকেই ভারতরাষ্ট্রের প্রধান বলে মেনে নিয়েছিল।

৬৮. এই অধ্যায়ে সংক্ষেপে ভারত বিভাজনের যন্ত্রণার এবং গান্ধীজীকে হত্যার বিয়োগান্তক নাটকের পশ্চাদপট বর্ণনা করা হ'ল। এদুটি বিষয়ের কোনটি লিখতে বা মনে করতেও আমার আনন্দ হয় না কিন্তু ভারতবর্ষের জনগণ এবং বড় করে বললে সারা পৃথিবীর মানুষই জানুক, গত ত্রিশ বছর ধরে ব্রিটিশের সাম্রাজ্যবাদী নীতি এবং কংগ্রেসের সাম্প্রদায়িক মিলনের ভুল নীতি অনুসরণের ফলে ভারত কেমন করে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। কার্যক্ষেত্রে মহাত্মা বিশ্বাসঘাতকতার সম্মুখীন হ'ন। এর ফলে হিন্দু-মুসলমান ঐক্য হওয়া দূরে থাকুক, ঐক্যের বনিয়াদই বিধ্বস্ত হয়েছিল। পাঁচকোটি মুসলমান আজ আর আমার দেশবাসী নন। পশ্চিম পাকিস্থানের সংখ্যালঘু অমুসলমানদের হয় নির্ম্মমভাবে হত্যা ক'রে অথবা তাদের বহুকালের বাসস্থান থেকে উচ্ছেদ করে দেউলিয়া ক'রে ছাড়া হয়েছে—পূর্ব পাকিস্থানেও সেই একই নীতি অনুসরণ করা হচ্ছে। এগার কোটিরও বেশি গৃহহারা হয়েছেন যাদের মধ্যে চল্লিশ লক্ষের মত মুসলমান। এই ভয়াবহ পরিণামের পরেও যখন দেখলাম, গান্ধীজী মুসলমান তোষণের সেই পুরোন নীতি অনুসরণ করে চলেছেন, তখন আমার রক্ত ফুটতে থাকল, আমি তাকে আর সহ্য করতে পারলাম না। আমি ব্যক্তিগত ভাবে গান্ধীজীর সম্পর্কে কঠোর শব্দ প্রয়োগ করতে চাই না, আবার তার কর্মপন্ধতি ও নীতির ওপর থেকে আমার তীব্র অনীহা ও অসম্মতি গোপনও করতে চাই না। 'বিভেদ আনো এবং শাসন কর' নীতি অনুসরণ করে ব্রিটিশ সরকার যা করতে চাইতেন, গান্ধীজী তাকেই কৃতকার্যতার সঙ্গে সম্পাদন করেছিলেন। ভারত বিভাজনে তিনি ব্রিটিশদের সহায়তা করেছেন এবং আমি নিশ্চিত নই—তাদের শাসন সত্যিই শেষ হয়েছে কিনা!

৬৯. এমনি করে গত বত্রিশ বছর ধরে ক্রমোবর্ধমান যে ক্রোধ আমাকে উত্তেজিত করছিল, মুসলমানদের সমর্থনে গান্ধীজীর এই শেষ অনশন শুরু করায় সেই ক্রোধ অংকুশ তাড়িত উন্মাদনায় তীব্র হয়ে উঠল। আমি সিদ্ধান্ত নিলাম যে গান্ধীজীর বেঁচে থাকাকে আর প্রলম্বিত হতে দেওয়া যায় না। এখুনি এর সমাপ্তি ঘটান দরকার। ভারতবর্ষে ফিরে আসার পর থেকেই গান্ধীজীর মধ্যে একটা প্রভুত্বব্যঞ্জক আত্মসর্বস্ব মানসিকতা গড়ে উঠেছিল যার ফলে তিনি ভাবতেন কি ভাল আর কি মন্দ তা বিচার করবার চূড়ান্ত অধিকারী ছিলেন তিনি একা। দেশ যদি তার নেতৃত্ব চায় তবে তার এই অভ্রান্ত মানসিকতাকেও মেনে নিতে হবে—আর তা যদি না করা হয় তবে তিনি কংগ্রেস থেকে দূরে দাঁড়িয়ে নিজের গোঁ ধরে চলবেন। আবার গান্ধীজীর এই মানসিকতার মাঝামাঝি রফা করার কোন স্থান ছিল না। হয় কংগ্রেসকে তাঁর কাছে আত্মসমর্পন করতে হ'ত, তাঁর উৎকেন্দ্রিকতা, খামখেয়াল, বিচিত্র ধর্মবোধ এবং আদিম অনুভবের খেলার পুতুল হয়ে থাকতে হ'ত—**নতুবা তাকে ছাড়াই চলতে হ'ত**। তিনি একাই ছিলেন প্রত্যেকের এবং প্রত্যেক ব্যাপারের একমাত্র বিচারক, গণ-অসহযোগ আন্দোলনের একমাত্র নিয়ন্ত্রক মস্তিষ্ক ছিলেন তিনি—সেই আন্দোলনের পদ্ধতি আর কেউ জানতেন না—তিনি একাই জানতেন কখন শুরু করতে হবে আর কখন আন্দোলন তুলে নিতে হবে। এতে আন্দোলন সফল হতে পারে বা ব্যর্থ হতে পারে, অবর্ণনীয় বিপর্যয় বা রাজনৈতিক হতাশা আসতে পারে—মহাত্মার অভ্রান্ততার কাছে তার পার্থক্য সামান্য। 'একজন সত্যাগ্রহী কখনও ব্যর্থ হয় না'

তার অভ্রান্ততা প্রমাণে এটাই ছিল মূলতত্ব—আর তিনি ছাড়া আর কেউ জানতেনও না - কে ছিলেন প্রকৃত সত্যাগ্রহী। এমনি করে নিজের মামলা বিচারের তিনিই ছিলেন পরামর্শ দাতার দল ( জুরি ), তিনিই ছিলেন বিচারক। এই শিশুসুলভ অন্তঃসারশূন্যতা এবং এক গুঁয়েমীর সঙ্গে তার জীবনযাত্রাব অতি কৃচ্ছ্রতা, ছেদহীন কর্মপ্রয়াস ও মহৎ চরিত্রবত্তা মিশে গান্ধীজীকে ভয়ংকর এবং অপ্রতিরোধ্য করে তুলেছিল। বহু মানুষই তার রাজনীতিকে যুক্তিহীন ভাবতেন কিন্তু সে অবস্থায় হয় তাকে নিজেকে কংগ্রেস থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিতে হত, না হয় গান্ধীজীর পায়ের তলায় তাঁর বুদ্ধিবত্তাকে লুটিয়ে দিয়ে তা নিয়ে যা খুশি করবার অধিকার তাকে দিতে হ'ত। এমন এক দায়িত্ব-হীন পদমর্যাদা লাভ করে গান্ধীজী মারাত্মক ভুলের পর মারাত্মক ভুল করবাব, ব্যর্থতার পর ব্যর্থতা অর্জনেব, বিপর্য্যয়ের পর বিপর্য্যয় সৃষ্টির অপরাধে অপরাধী। তাঁর রাজনৈতিক প্রাধান্য লাভের পর থেকে তেত্রিশ বছরের মধ্যে তাঁর পক্ষে একটিও রাজনৈতিক বিজয় দাবী করা যায় না। তাঁর এই অবিসম্বাদী নেতৃত্বের বত্রিশ বছরের মধ্যে 'তিনি একটার পর একটা যে মারাত্মক ভুল করে গেছেন তা নিচে আমি একটু বিশদ করেই বলছি।

৭০. গান্ধীজী তাঁর কর্মপন্থা কার্যকর করতে গিয়ে হাতুড়ে ডাক্তারের সর্বরোগহর পেটেণ্ট অসুধের মত যে সব নীতি ও আদর্শের কথা বলতেন, সেগুলি যে অসংখ্য ক্ষতিসাধন করেছে—সেগুলি সম্পর্কে সংক্ষেপে বলব। এর সর্বনাশা ফলের কথা এখন আমরা জানি। নিচে তার কতকগুলি বর্ণনা করা হল ঃ—

ক. **খিলাফৎ—**প্রথম বিশ্বমহাযুদ্ধের ফলে তুর্কী, আফ্রিকা এবং মধ্য-প্রাচ্যের সব সাম্রাজ্যই হারায়। ইউরোপেও রাজকীয় সম্মান যেতে বসে তার—এবং ১৯১৪ সালে ইউরোপীয় ভূভাগে সামান্য একটুকরো জমি পড়ে থাকে। তরুণ তুর্কীরা সুলতানকে সিংহাসন ত্যাগ করতে বাধ্য করে আর সুলতানের অবলুপ্তির পর খিলাফৎও লুপ্ত হয়। ভারতীয় মুসলমানেরা খিলাফতে ভক্তিমান তাই তারা দৃঢ়ভাবে এবং

আন্তরিকতার সঙ্গে বিশ্বাস করত যে ব্রিটেনই সুলতান এবং খিলাফতের পতন ঘটিয়েছে। তাই তারা খিলাফতের পুনরুজ্জীবনের উদ্দেশ্যে অভিযান শুরু করল। এই ত' সুবিধাবাদীর সুযোগের মুহূর্ত! মহাত্মা এক ভুল ধারণা করে বসলেন যে খিলাফৎ আন্দোলনে সাহায্য করে তিনি ভারতে মুসলমানদেরও নেতা হয়ে বসবেন। হিন্দুদের নেতা ত' তিনি আছেনই—আর এই-ভাবে যে হিন্দু মুসলমান ঐক্য পাওয়া যাবে, তার ফলে ব্রিটিশরা তাড়াতাড়ি স্বরাজে রাজী হবে। কিন্তু আবারও গান্ধীজী হিসেবে ভুল করলেন। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসকে খিলাফৎ আন্দোলনের সঙ্গে এক করে ফেলার নির্দেশে তিনি স্বেচ্ছাপ্রবৃত্তভাবে ধর্মীয় উপাদানকে রাজনীতির সঙ্গে মিশিয়ে দিলেন—পরবর্তীকালে যে ভুল প্রমাণিত হ'ল বহু ক্ষতি ও তীব্র বেদনাক্ষয় বিপর্যয়ে। কারণ যে মুহূর্তে খিলাফৎ ফিরিয়ে আনার আন্দোলন খানিকটা সাফল্যের দিকে এগুলো, অমনি মুসলমান-দের মধ্যে (প্রাগ্রসর চিন্তার) যে দল খিলাফৎ আন্দোলনকে সমর্থন করতেন না—তারা কালরেখার বাইরে চলে গেলেন আর আলি ভাইদের মত যারা ছিলেন এই আন্দোলনের মাথা, তারা জনপ্রিয়তার ঢেউ-এর উচ্ছ্বাসে একেবারে তুঙ্গে উঠে গেলেন—তাদের সামনের সব বাধা ভেসে গেল। মিঃ জিন্না অনুভব করলেন তিনি নিঃসঙ্গ। কয়েক বছর তিনি বিবেচনার মধ্যেই থাকলেন না। কিন্তু যাই হোক, আন্দোলন ব্যর্থ হ'ল। আমাদের ব্রিটিশ প্রভুরা ন্যায্য কারণেই আলোড়িত হয়েছিলেন এবং কয়েক বছরের মধ্যেই তারা দমননীতি ও মণ্টেগু-চেমসফোর্ড সংস্কারের যৌথ প্রতিক্রিয়ায় খিলাফৎ আন্দোলনের ঢেউ কাটিয়ে উঠলেন। মুসলমানেরা কিন্তু খিলাফৎ আন্দোলনকে কংগ্রেস থেকে দূরেই সরিয়ে রাখল—তারা কংগ্রেসের সমর্থনকে স্বাগত জানাল কিন্তু কখনই কংগ্রেসের সঙ্গে মিশল না। যখন আন্দোলনে ব্যর্থতা এলো, হতাশায় মরিয়া হয়ে উঠল মুসলমানেরা, আর তাদের রাগ এসে পড়ল হিন্দুদের ওপর। ভারতের বিভিন্ন স্থানে অসংখ্য দাঙ্গা শুরু হল—সব জায়গাতেই লক্ষ্যবস্তু হল হিন্দুরা। মহাত্মার হিন্দু-মুসলমান ঐক্য এক মরীচিকায় পর্যবসিত হ'ল।

**খ. মোপলা বিদ্রোহ ॥** মালাবার, পাঞ্জাব, বঙ্গদেশ আর উত্তর-পশ্চিম-সীমান্ত প্রদেশেই হিন্দুদের ওপর অত্যাচার হয়েছে বারম্বার। মোপলা-বিদ্রোহ (এই নামেই একে বর্ণনা করা হয়) হল হিন্দুর ধর্ম-সম্মান-জীবন ও সম্পত্তির ওপর সবচেয়ে সংবন্ধ এবং প্রলম্বিত আক্রমণ। শত শত হিন্দুকে জোর করে ধর্মান্তরিত করা হয়েছিল, মহিলাকে ধর্ষণ করা হয়েছিল। যে ধর্মীয় নীতির ফলে সারা ভারত-ব্যাপী এত বিপর্যয় টেনে আনলেন যে মহাত্মা—তিনি কিন্তু নীরব রইলেন। এই আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে মহাত্মা কিন্তু একটি কথাও উচ্চারণ করলেন না। তিনি কংগ্রেসকেও এমন কোন কার্যকর পন্থা গ্রহণ করতে দিলেন না যাতে এমন আক্রমণের পুনরাবৃত্তি না ঘটে। উল্টো দিকে তিনি এতদূর গেলেন যে শত শত জোর করে ধর্মান্তরকরণের ঘটনাকে শুধু অস্বীকার করলেন না বরং তাঁর 'ইয়ং ইণ্ডিয়া' পত্রিকায় একটি মাত্র জোর করে ধর্মান্তরকরণ হয়েছে বলে লিখলেন। তাঁর মুসলমান বন্ধুরা তাঁকে জানিয়েছিলেন যে তাঁর ঐ তথ্য ভুল—মালাবারে সত্য-সত্যই জোর করে অসংখ্য মানুষকে ধর্মান্তরিত করা হয়েছিল—কিন্তু মহাত্মা কখনই ঐ ভুল সংশোধন করলেননা বরং তিনি এক অসম্ভবের প্রান্তে উপনীত হয়ে মোপলাদেরই জন্য সাহায্য-ভাণ্ডার গড়ে তুলতে লাগলেন—তাদের দ্বারা অত্যাচারিতদের জন্য নয়। কিন্তু হায়—এত করেও হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যের পবিত্র ভূমি দেখা গেল না।

**গ. আফগান আমীর চক্রান্ত ॥** খিলাফৎ আন্দোলন ব্যর্থ হলে আলিভাইয়েরা স্থির করলেন যে তারা এমন কিছু করবেন যাতে খিলা-ফৎ মানসিকতাটা টিকে থাকে। তারা জিগির তুললেন যে যারাই খিলা-ফতের শত্রু, তারাই ইসলামের শত্রু। আর যেহেতু তুর্কীর সুলতানের পরাজয় এবং সিংহাসনচ্যুতির প্রধান দায় ব্রিটিশের, তাই ব্রিটিশকে তীব্র শত্রু হিসাবে গণ্য করা যে কোন একনিষ্ঠ মুসলমানেরই পবিত্র-কর্তব্য। এই উদ্দেশ্যে তাঁরা আফগানিস্থানের আমীরদের এক গোপন ষড়যন্ত্রে ভারত আক্রমণ করতে আহ্বান জানালেন—ভেতর থেকে পূর্ণ সহযোগিতার আশ্বাস দিলেন। এই ষড়যন্ত্রের পিছনে দীর্ঘ ইতিহাস

আছে। আলিভাইয়েরা কখনই এই ষড়যন্ত্রে তাদের দায়িত্ব অস্বীকার করেন নি। মহাত্মা তার হিন্দু-মুসলমান মৈত্রী পাওয়ার কৌশল হিসাবে আলিভাইদের সম্পদে বিপদে সমর্থন করে চললেন। তিনি প্রকাশ্যে তাদের প্রতি প্রীতিবর্ষণ করলেন এবং খিলাফৎ পুনঃ-প্রতিষ্ঠায় অকুণ্ঠ সমর্থনের প্রতিজ্ঞা করলেন। এমন কি আমীরদের ডেকে ভারত আক্মণের ব্যাপারেও মহাত্মা আলিভাইদের সমর্থন করলেন।—তিলমাত্র সন্দেহের অবকাশ না রেখে এটা প্রমাণিত হয়েছে। প্রয়াত শাস্ত্রীজি, এলাহাবাদ থেকে প্রকাশিত 'দি লিডার' পত্রিকার সম্পাদক মিঃ সি. ওয়াই. চিন্তামণি এবং মহাত্মাজীর আজীবন বন্ধু প্রয়াত রেভারেণ্ড সি. এফ. এণ্ড্রুজ তাঁকে স্পষ্ট বলেছিলেন যে আফগানিস্হানের আমীরদের ভারত আক্রমণের নিমন্ত্রণের ব্যাপারে মহাত্মাজী যে আলিভাইদের সমর্থন করেছেন তা তার বক্তৃতায় এবং লেখায় স্পষ্টভাবেই প্রকাশিত। মহাত্মার সেকালের লেখা থেকে নিম্নোদ্ধৃত অংশ একথা স্পষ্টভাবেই প্রমান করবে যে মুসলমান তোষণের সেই পেয়ে বসা একই প্রত্যাশার বশে তিনি নিজের দেশকেও ভুলে গেছিলেন এবং স্বদেশে আর এক বিদেশী শাসককে আক্রমণকারী হিসাবে আহ্বান জানানোর সরিক হয়ে পড়েছিলেন। মহাত্মা এই বলে সেই আক্রমণকে সমর্থন করেছিলেন ঃ—

**'কেন যে আলিভাইদের গ্রেপ্তার করা হতে চলেছে, চারিদিকে এমনই গুজব, আর কেন যে আমি বাইরে থাকছি তা আমি বুঝতে পারছি না। আমি যা করব না এমন কোন কাজ তারা করেনি। তারা যদি আমীরদের কাছে সংবাদ পাঠিয়ে থাকে, তবে আমিও কাউকে আমীরদের কাছে পাঠাব যে তাদের বলে আসবে যে আমি যতক্ষণ তাদের সাহায্য করব, ততক্ষণ কোন ভারতবাসী তাদের তাড়িয়ে দিতে ইংরেজ সরকারকে সাহায্য করবে না।'**

ব্রিটিশদের গুপ্তচর বিভাগ এই ষড়যন্ত্র ভেঙ্গে দেয়। আলিভাইদের ভারত আক্রমণের এই হাস্যকর পরিকল্পনা থেকে কোন লাভই হয়নি

আর মহাত্মার হিন্দু-মুসলমান ঐক্য যত দূরে থাকবার তত দূরেই থেকে গেছে।

ঘ. (১) **আর্যসমাজের ওপর আক্রমণঃ**—গান্ধীজী ১৯২৪ সালে কোন প্ররোচনা ছাড়াই আর্য-সমাজের ওপর সম্পূর্ণ অযথা আক্রমণ করে মুসলমানদের প্রতি তার ভালবাসার একগুঁয়েমি প্রকাশ করলেন। সমাজীদের করা কাজের এবং না-করা কাজের থেকে অসংখ্য কল্পিত পাপের প্রতি প্রকাশ্যে তীব্র ধিক্কার জানালেন গান্ধীজী। আক্রমণগুলি ছিল সম্পূর্ণ অসমর্থনযোগ্য, অসংযত এবং ওঁর অযোগ্য—কিন্তু যাতেই মুসলমানদের প্রীত করা যায় তাতেই ছিল গান্ধীজীর হৃদয়-কামনা। আর্যসমাজ সুদৃঢ় অথচ সংযত প্রত্যুত্তর দিল—গান্ধীজী দীর্ঘকাল নীরব রইলেন—কিন্তু গান্ধীজীর ক্রমো-বর্দ্ধমান রাজনৈতিক প্রভাব, আর্যসমাজকে দুর্বল করে দিল। স্বামী দয়ানন্দের কোন অনুচরের পক্ষেই সম্ভবতঃ রাজনীতিতে গান্ধীবাদী কংগ্রেসী হওয়া সম্ভব ছিল না—এই দুই ছিল একত্রিত হওয়ার পক্ষে সম্পূর্ণ অযোগ্য। কিন্তু পদ ও নেতৃত্বের মোহে অনেক আর্য-সমাজীই দুই নৌকোয় পা দিয়ে চলতেন। তারা একই সঙ্গে আর্য-সমাজী ও গান্ধীবাদী কংগ্রেসী বলে দাবী করতেন। এরই ফলে বছর চারেক আগে সিন্ধু প্রদেশের সরকার সত্যার্থ প্রকাশের ওপর নিষিদ্ধাদেশ চাপিয়ে দেয় আর আর্য-সমাজ সব মিলিয়ে একে নীরবে মেনে নেয়। ফলে হিন্দুদের সামাজিক ও ধর্মীয় জীবনে আর্য-সমাজের প্রভাব এর পর থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে পঙ্গু হয়ে যায়। ব্যক্তিগতভাবে আর্য-সমাজীরা প্রত্যেকেই কট্টর জাতীয়তাবাদী। প্রয়াত লালা লাজপৎ রায় এবং স্বামী শ্রদ্ধানন্দ—আমি মাত্র দুজনের নাম বলছি—ছিলেন গোঁড়া আর্য-সমাজী অথচ জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তাঁরা ছিলেন অগ্রগণ্য কংগ্রেসী নেতা। তারা গান্ধীজীর অন্ধ-সমর্থক ছিলেন না। তারা নিশ্চিতভাবে গান্ধীজীর মুসলমান ঘেঁষা নীতির বিরোধী ছিলেন এবং এ ব্যাপারে প্রকাশ্যে বিরোধিতা করে গেছেন। কিন্তু সেইসব মহৎ মানুষেরা আজ আর নেই। আমরা জানি যে আর্য-

সমাজের নীতি যেমন ছিল তেমনিই আছে। – কিন্তু আজ তারা জানে কম ; একটি স্বার্থান্বেষী অংশ তাকে অযোগ্য নেতৃত্ব দিচ্ছে। এক সময়ে সমাজ যে বেগ ও শক্তি বহন করত, আজ আর তা নেই।

ঘ. (২) আর্য-সমাজের ওপর গান্ধীজীর এই আক্রমণ মুসলমান-দের মধ্যে তার জনপ্রিয়তা বাড়ায় নি কিন্তু কয়েক মাসের মধ্যেই এক তরুণ মুসলমানকে শ্রদ্ধানন্দকে খুন করতে প্ররোচিত করেছিল। আর্য-সমাজকে যে প্রতিক্রিয়াশীল দল বলে অভিযোগ করা হয়েছিল—তা ছিল প্রচণ্ডভাবে মিথ্যা। সকলেই জানেন যে প্রতিক্রিয়াশীল দল হওয়া দূরে থাকুক, তারা ছিলেন হিন্দুদের সামাজিক পুনর্গঠনের অগ্রদূত। অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের জন্য আর্যসমাজ শতবর্ষব্যাপী কাজ করে চলেছে– গান্ধীজীর জন্মেরও আগে থেকে। বিধবার পুনর্বিবাহকে আর্য-সমাজ জনপ্রিয় করে তুলেছে। আর্য-সমাজ জাতিভেদ প্রথাকে ধিক্কার দিয়ে এসেছে। তারা সামাজিক একতার দীক্ষা দিয়েছে—এই ঐক্যে তারা শুধু হিন্দুদের নয়– হিন্দু-সমাজের বাইরের কেউ তাদের নীতিকে মানলে, তাকে নিতেও তাদের আপত্তি ছিল না। গান্ধীজী কিছুদিনের জন্য নীরব ছিলেন। কিন্তু তাঁর নেতৃত্বের প্রভাবে আর্য-সমাজের ওপর তাঁর ভিত্তিহীন আক্রমণের কথা স্বদেশবাসীরা ভুলে গেল – আর্য-সমাজও বেশ খানিকটা দুর্বল হয়ে পড়ল। আর্য-সমাজের প্রতিষ্ঠাতা দয়ানন্দ সরস্বতীর কাছে হিংসা-অহিংসার প্রশ্ন ছিল না। তাঁর শিক্ষার মধ্যে হিংসা নিবারিত হয় নি – নৈতিকভাবে অনিবার্য হলেই তা অনুমোদিত ছিল। এ নিয়ে আর্য-সমাজী নেতাদের মধ্যে একটা দ্বিধা ছিল—কংগ্রেসে তারা যোগ দেবেন কি না! কারণ গান্ধীজী অহিংসার ওপর জোর দিতেন আর স্বামী দয়ানন্দ এ সম্পর্কে কোন দৃঢ় নীতি নির্ধারণ করেন নি। কিন্তু দয়ানন্দ স্বামী লোকান্তরিত হয়েছিলেন আর গান্ধীজী নামক নক্ষত্র রাজনৈতিক আকাশে ক্রমেই উজ্জ্বল হয়ে আসছিল।

**ঙ. সিন্ধুর বিযুক্তিকরণ॥** ১৯২৮ সালের কাছাকাছি জিন্নার

প্রতিপত্তি খুব বেড়ে গেছিল আর মহাত্মা ইতঃমধ্যেই মিঃ জিন্নার অনেকগুলি অন্যায় ও অযৌক্তিক দাবীতে সম্মতি দিয়ে বসেছিলেন—এজন্য মূল্য দিতে হয়েছিল ভারতীয় গণতন্ত্রের, ভারতীয় জাতির এবং হিন্দুদের। বম্বে প্রেসিডেন্সী থেকে সিন্ধু প্রদেশকে বিচ্ছিন্ন করে নেওয়াতেও মহাত্মা সম্মতি জানালেন এবং সিন্ধুর হিন্দুদের ছেড়ে ছিলেন সাম্প্রদায়িক নেকড়েদের মুখে। করাচি, সুক্কুর শিকারপুর এবং সিন্ধুপ্রদেশের আরও বহু জায়গায় দাঙ্গা দেখা দিল—সব জায়গাতেই নির্যাতিত হ'ল শুধু হিন্দুরা—হিন্দু-মুসলমান ঐক্য দিগন্ত থেকে আরও পিছিয়ে গেল।

**চ. কংগ্রেস থেকে লীগের বিদায় গ্রহণ ॥** এক একটা পরাজয় ঘটে আর গান্ধী তার হিন্দু-মুসলমান ঐক্য গড়ে তোলার পদ্ধতির ওপর আরও ঝুঁকে পড়েন। যে জুয়ারী অনেক হেরেছে সে যেমন আরও বেপরোয়া হয়ে প্রতিবারই তার পণের মাত্রা বাড়ায় এবং অসমর্থনযোগ্য ফলাফল টেনে আনে, গান্ধীজীও তেমনি জিন্নাকে শান্ত করে তাঁর নেতৃত্বে ভারতীয় স্বাধীনতা যুদ্ধে সামিল করতে যা খুশি করতে থাকলেন। কিন্তু কংগ্রেস থেকে মুসলমানদের দূরে থাকবার মানসিকতা বছরের পর বছর বেড়েই চলল, আর ১৯২৮ সালের পর মুসলীমলীগ কংগ্রেসের সঙ্গে একত্রে কোন কিছু করাকেই অস্বীকার করল। ১৯২৯ সালে লাহোর অধিবেশনে কংগ্রেস যখন পূর্ণ স্বাধীনতার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল, তখন মুসলমান প্রতিনিধিরা লক্ষ্যণীয়ভাবে অনুপস্থিত থেকে কংগ্রেস থেকে তাদের দূরে থাকার মানসিকতা আরও স্পষ্টভাবে প্রকাশ করে দিল। এরপর থেকে হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের আশা কেউ না রাখলেও গান্ধীজী কিন্তু অটল আশাবাদী থেকে গেলেন এবং মুসলমানদের সাম্প্রদায়িকতার কাছে আরও আরও বেশি করে আত্মসমর্পন করতে থাকলেন।

**ছ. গোল-টেবিল বৈঠক ও সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা ॥** ভারত ও ইংলণ্ডের ব্রিটিশ কর্ত্তারা এ কথা স্পষ্ট বুঝে ফেলেছিলেন যে ভারতের পক্ষে আরও বড় এবং যথার্থ এক প্রস্থ শাসনতান্ত্রিক

পরিবর্ত্তন অত্যন্ত জরুরী এবং অত্যাবশ্যক হয়ে পড়েছে—তাদের দুর্নীতিগ্রস্থ 'বিভাজন ও শাসন' নীতি বা তার ফলে সৃষ্ট সাম্প্রদায়িক বিবাদও পরিণামে ভারতে ব্রিটিশ শাসনকে স্থায়িত্ব বা নিরাপত্তা কোনটিই দিতে পারে নি। তাই তারা ১৯২৯ সালের শেষ দিকে স্থির করে ফেললেন পরবর্ত্তী বৎসরের গোড়ার দিকে তারা ইংলণ্ডে এক গোল-টেবিল বৈঠক ডাকবেন এবং ঐ মর্মে এক ঘোষণা করবেন। তখন মিঃ র‍্যামসে ম্যাকডোনাল্ড ছিলেন প্রধান মন্ত্রী আর শ্রমিকদল গঠন করেছিল সরকার। কিন্তু এতেও দেরী হয়ে গেছিল। এ ঘোষণা থাকা সত্বেও লাহোর অধিবেশনে কংগ্রেস পূর্ণ স্বাধীনতার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল এবং গোল-টেবিল বৈঠক বর্জনের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। এছাড়াও কয়েক মাসের মধ্যে লবণ-আইন অমান্য আন্দোলন শুরু হয়েছিল। এই আন্দোলন বিস্ময়কর উন্মাদনার সৃষ্টি করেছিল—লবণ আইনের বিধি ভঙ্গ করে কারাগার বরণ করে নিয়েছিল প্রায় ৭০,০০০ মানুষ। যাই হোক শীঘ্রই প্রথম গোল-টেবিল বৈঠক বর্জন করার জন্য কংগ্রেস দুঃখ প্রকাশ করল এবং ১৯৩১ সালের করাচি সম্মেলনে স্থির হল যে গোল-টেবিল বৈঠকের দ্বিতীয় পর্যায়ে কংগ্রেসের প্রতিনিধি হিসাবে গান্ধীজী একা যাবেন। এই সম্মেলনের বিবরণী পাঠ করলে যে কেউ বুঝবেন এই বৈঠকের পরিপূর্ণ ব্যর্থতার সবচেয়ে বড় কারণ গান্ধীজী। এই গোল-টেবিল বৈঠকের একটি সিদ্ধান্তও ভারতের গণতন্ত্র বা জাতীয়তার স্বপক্ষে ছিল না। অবশেষে মহাত্মা এতদূর গেলেন যে মিঃ র‍্যামসে ম্যাক্‌ডোনাল্ডকে আহ্বান করে নিয়ে এলেন 'সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা' নামক নীতিটি ঘোষণার জন্য—এর দ্বারা অনৈক্য সৃষ্টিকারী সাম্প্রদায়িক শক্তি-গুলিকেই জোরদার করা হল—গত চব্বিশ বছর ধরে রাজনীতির দেহকে ইতঃমধ্যে এইসব শক্তিই দীর্ন করে তুলেছিল। এমনি করে ভারতের আইনসভায় সাম্প্রদায়িক নির্বাচক মণ্ডল ও সাম্প্রদায়িক ভোটাধিকারকে আগ বাড়িয়ে ডেকে আনার প্রত্যক্ষ এবং প্রকৃত দায়িত্ব মহাত্মাতেই বর্ত্তায়। মিঃ র‍্যামসে ম্যাক্‌ডোনাল্ড যখন সাম্প্রদায়িক

বাঁটোয়ারা পড়ছিলেন, তখন মহাত্মা তার বিরোধিতা করার কথা বাতিল করে দিয়েছিলেন আবার আইনসভার সদস্যদের বলেছিলেন একে 'না গ্রহণ না বর্জন' করতে—এতে বিস্মিত হবার কিছু নেই। যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির জন্য গান্ধীজী গত পনের বছর ধরে এত বাজী ধরলেন, তিনি নিজেই তার ওপর মারলেন কুড়ুলের ঘা। সন্দেহ নেই যে ১৯৩৫ সালের ভারত-শাসন আইনে সংখ্যালঘু রক্ষার নামের আড়ালে কি কেন্দ্র কি প্রদেশে ধর্মভিত্তিক নির্বাচন ও নির্বাচক মন্ডল গঠনের এমনকি সংখ্যালঘুদের বিশেষত মুসলমান-দের আনুপাতিকভাবে বেশি গুরুত্ব দেবার এক চিরস্থায়ী ও আইন-সম্মত স্বীকৃতি দেওয়া হল।

সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে যারা নির্বাচিত হয়ে আসবেন, স্বাভাবিক ভাবেই তারা হবেন সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন। সাম্প্রদায়িকতা আর জাতীয়তার মধ্যের সমুদ্রের ব্যবধান পূরণ করতে তাদের কোন আগ্রহ থাকা সম্ভব নয়। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ভিত্তিতে কোন সংসদীয় দলগঠন করা অসম্ভব হয়ে উঠল। হিন্দু আর মুসলমানেরা দুই ভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে গেল, শত্রু-ভাবাপন্ন দুই দল হিসাবে কাজ করতে শুরু করল—বিচ্ছিন্নতার গতিবেগ আরও বেড়ে গেল। প্রায় সর্বত্র হিন্দুরা মুসলমানদের সাম্প্রদায়িক উচ্ছৃঙ্খলতার শিকার হ'ল। হিন্দু এবং মুসলমানদের মধ্যে ঐক্যের বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা সম্পর্কেও যখন প্রত্যেকটি মানুষ চরম হতাশ—মহাত্মা কিন্তু তার শূন্যগর্ভ তত্বকে পুনরাবৃত্তি করে চললেন। [ এখানে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা গ্রহণের বিরুদ্ধে পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের বক্তৃতা উদ্ধৃতি করা হয়েছিল ]।

**জ. মন্ত্রীত্ব গ্রহণ ও দলবদ্ধভাবে পদত্যাগ :**—১৯৩৭ সালের ১লা এপ্রিল থেকে ১৯৩৫ সালের ভারত সরকার বিধি বলে প্রাদেশিক স্বায়ত্ব-শাসন চালু করা হ'ল। ব্রিটিশ কর্মচারীরা যে যেখানে ছিলেন তাদের সেখানেই সম্পূর্ণ সংরক্ষিত রাখার জন্য অসংখ্য রক্ষাকবচ, বিশেষ ক্ষমতা ও সংরক্ষণ বিধি যুক্ত ছিল। তাই কংগ্রেস প্রথমে মন্ত্রীসভায়

যোগ দিতে অস্বীকার করল, কিন্তু অল্প দিনের মধ্যেই বুঝল, সব প্রদেশেই মন্ত্রীসভা গঠিত হয়েছে তাদের মধ্যে অন্ততঃ পাঁচটি মন্ত্রীসভা স্বাভাবিক ভাবেই কাজকর্ম চালাচ্ছে। অন্য ছটি প্রদেশে সংখ্যালঘুরাই মন্ত্রীসভা গঠন করেছে এবং তাদের জাতিগঠন পরিকল্পনায় জোর দিয়েছে। কংগ্রেস এও অনুভব করল যে তাদের ঐ ফাঁকা নিষেধাত্মক নীতি আঁকড়ে থাকলে সবই নষ্ট হবে। তাই ১৯৩৭ সালের ১লা জুলাই মন্ত্রীসভায় অংশ নেবার সিদ্ধান্ত নিল। কিন্তু তা করতে গিয়ে করে বসল আর এক মরাত্মক ভুল। মন্ত্রীসভায় কার্যকরী অংশ দিতে গিয়ে বাদ দেওয়া হ'ল মুসলীম লীগ্ প্রার্থীদের—তারা সেই সব মুসলমানদেরই নিয়েছিলেন যারা ছিলেন কংগ্রেসের লোক। যেদেশে কোন রকম সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিত্বের কথা না মেনে, সার্বজনীন ভোটাধিকার প্রয়োগ করা হয়, সেখানে এটাই মন্ত্রীসভা গড়বার প্রকৃত নীতি। কিন্তু সাম্প্রদায়িক নির্বাচক মণ্ডল এবং সাম্প্রদায়িক ভোটাধিকার এবং বিচ্ছিন্নতার আরও সব রীতিনীতি মেনে নেওয়ার পর মুসলীম লীগের সভ্যদের বাদ দেওয়াটা মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়, বিশেষতঃ যে সব প্রদেশে মুসলমানেরা সংখ্যালঘু সেখানে বেশিরভাগ মুসলমানের প্রতিনিধি ত' ছিলেন এরাই। জাতীয়তাবাদী মুসলমানেরা, যারা মন্ত্রী হয়েছিলেন তারা মুসলীম লীগের লোকেরা যে অর্থে মুসলমানদের প্রতিনিধি, ওরা সে অর্থে ছিলেন না। আর তাই এদের মন্ত্রীসভায় না নেওয়ায় সাম্প্রদায়িক দল বলে কংগ্রেসের প্রতি যে অভিযোগ করা হ'ত, তাকেই আইনসম্মত স্বীকৃতি দেওয়া হ'ল। অন্যদিকে মুসলমানেরা কংগ্রেসের নিয়ন্ত্রণে যেতে সম্পূর্ণ অনিচ্ছুক ছিল, তাদের মঙ্গলের জন্য কোন সংরক্ষণের দাবীও ছিল না। গভর্ণররা ত' ছিলেনই। তারা তাদের সহানুভূতিসম্পন্ন সমর্থন করবার জন্য সর্বদাই প্রস্তুত এবং ইচ্ছুক ছিলেন। কিন্তু মুসলীম লীগের সভ্যদের মন্ত্রীত্ব থেকে বাদ দেওয়ার ব্যাপারটা জিন্নাকে কৌশলগত সুবিধা করে দিল আর তিনিও তাকে পুরো কাজে লাগালেন। আর এর ফলে ১৯৩৯ সালে কংগ্রেস যখন সগর্বে পদত্যাগ করল তখন গোটা ব্যাপারটা মুসলীম লীগ

ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের হাতে গিয়ে পড়ল। ১৯৩৫ সালের ভারত সরকার আইনের ৯৩ ধারা বলে গভর্ণররা কংগ্রেস প্রধান প্রদেশগুলির দায়িত্ব নিলেন, মুসলীম লীগ মন্ত্রীরা তাদের পদেই রইলেন এবং অবশিষ্ট প্রদেশগুলির দায়িত্ব তারাই পেলেন। গভর্ণররা স্পষ্টভাবেই মুসলমান ঘেঁসা এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী নীতি অনুমোদিত ভাবে রাজকার্য চালাতে থাকলেন আর একদিকে মুসলমান মন্ত্রীমণ্ডলী আর অন্যদিকে মুসলমান ঘেঁসা গভর্ণরদের সমর্থনে দেশের সর্বত্র সাম্প্রদায়িকতা মাথাচাড়া দিয়ে উঠল। গান্ধীজীর হিন্দু-মুসলমান ঐক্য স্বপ্ন হয়ে দাঁড়াল। এর থেকে খারাপ কিছু হলেও গান্ধীজী পরোয়া করতেন না। তাঁর উচ্চাশা ছিল হিন্দুদের মত মুসলমানদেরও নেতা হবার। আর কংগ্রেস এমনি করে মন্ত্রীত্ব থেকে পদত্যাগ করে আরএকবার গণতন্ত্র এবং জাতীয়তাবোধকে বলি দিলেন। মহাত্মীয় একগুঁয়েমির বেদীমূলে হিন্দুদের ধর্মীয়, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক—সবরকম মৌলিক অধিকার উৎসর্গীত হ'ল।

**ঝ. যুদ্ধের সুযোগ নিল লীগ**। পাঁচ পাঁচটি প্রদেশে মুসলীম লীগ সরকার আর আরও ছটি প্রদেশে মুসলীম লীগ প্রভাবিত সরকার গঠিত হওয়ায় যে পরিস্থিতি গড়ে উঠল তাতে উৎসাহিত হয়ে জিন্না পুরোদমে এগিয়ে চললেন। কংগ্রেস যুদ্ধের বিরোধিতা করেছিল যেন তেন প্রকারে। মিঃ জিন্না এবং লীগ একটা ভারী বিচিত্র নীতি গ্রহণ করল। তারা নিরপেক্ষ থাকল এবং কোনক্রমেই সরকারকে বিব্রত করল না। কিন্তু পরের বছর লাহোর অধিবেশনে মুসলীম লীগ যুদ্ধে সহযোগিতার সর্ত হিসাবে ভারত বিভাগের দাবী সিদ্ধান্ত হিসাবে গ্রহণ করল। লাহোর সিদ্ধান্তের কয়েক মাসের মধ্যেই লর্ড লিনলিথগো মুসলমানদের ভারত বিভাগের নীতিতে পূর্ণ সমর্থন জানালেন। তিনি সরকারী নীতি বিষয়ে এক ঘোষণায় মুসলমানদের আশ্বাস দিলেন যে ভারতের জাতীয় জীবনের সর্বপ্রকার উপাদানের সম্মতি না নিয়ে রাজনৈতিক গঠনতন্ত্রের কোন পরিবর্ত্তন করা হবে না। ভারতের বড়লাটের এই আশ্বাস বাক্যে মুসলীম লীগ এবং

মুসলমানেরা এই দেশের রাজনৈতিক অগ্রগতির ওপর এককায়েমী মঞ্জুরীনামা পেয়ে গেল। সেদিন থেকে অনৈক্যের প্রসার বেড়ে চল্ল ক্রমোবর্দ্ধমান বেগে। স্থল-নৌ বা বিমান সৈন্যদলে মুসলমানদের যোগ দেওয়ার ওপরে মুসলীম লীগ কোন নিষেধনামা জারী করেনি আব তাই মুসলমানেবা বহু সংখ্যায় যোগ দিতে থাকল। ভারতীয় সৈন্যদলে মুসলমানদের শতকরা হার আদৌ না কমলেও পাঞ্জাবের মুসলমানেরা তাদের ক্ষোভ প্রকাশ করল। প্রকৃত পক্ষে তাদের লক্ষ্য ছিল পরবর্ত্তী কালের মুসলমানরাষ্ট্রের জন্য প্রস্তুতি—আজ যা কাশ্মীরে করা হচ্ছে। আর বিশ্বযুদ্ধের গত ছ'বছরের মধ্যে মুসলমানেরা ত' কখনই সরকারকে বিব্রত করেনি। (এখানে প্রয়াত সিকান্দার হায়াৎখান গত বিশ্বযুদ্ধের সময় কায়রোতে সশস্ত্র বাহিনীর সামনে যে বক্তৃতা দেন তা উল্লেখ করা হয়)। তারা যা চেয়েছিল, তা হচ্ছে এই যে তাদের পূর্ণ সম্মতি ভিন্ন ভারতের গনতান্ত্রিক কোন পরিবর্ত্তন করা হবে না আর তাদের সম্মতি পাওয়া যাবে যদি পাকিস্থান স্বীকার করা হয়। প্রকৃত প্রস্তাবে ১৯৪০ সালের আগষ্টে লর্ড লিনলিথগো এ আশ্বাস তাদের দিয়েই দিয়েছিলেন।

ঞ. **ক্রিপ্‌সের বিভাজন প্রস্তাব গ্রহণ**॥ কংগ্রেস নিজেই তার মনের খবর জান্‌ত না যে সে যুদ্ধটা সমর্থন করবে, না বিরোধিতা করবে, না কি নিরপেক্ষ থাকবে! একটার পর একটা করে তাদের এই সব কটা মানসিকতারই প্রকাশ ঘটেছিল—কখনও তাদের বক্তৃতায়, কখনও তাদের গৃহীত সিদ্ধান্তে, কখনও সংবাদপত্রের প্রচারে, কখনও আরো অন্য উপায়ে। স্বভাবতঃ সরকার ভাবল, বাক্‌বাহুল্যে নিন্দা করা ছাড়া কংগ্রেসের নিজস্ব কোন ইচ্ছা নেই। কোন বাধা বিপত্তি ছাড়াই ১৯৪২ পর্যন্ত যুদ্ধ চল্‌ল। সরকার যুদ্ধের প্রয়োজনের জন্য সব লোক, সব টাকা এবং সব উপাদানই পেতেন। সরকারের সব রকম ঋণই সম্পূর্ণ সরবরাহ করা হয়েছিল। ১৯৪২ সালে এল ক্রিপ্‌স কমিশন। সে কংগ্রেসকে কতকগুলি বাসী পচা আশ্বাস দিল, পশ্চাদপটে তার সঙ্গে জুড়ে দেওয়া ছিল ভারত

বিভাগের স্পষ্ট ইঙ্গিত। স্বভাবতঃ মিশন ব্যর্থ হল। কিন্তু কংগ্রেস মিশনের প্রস্তাবগুলো প্রত্যাখ্যান করতে গিয়ে তার গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদের প্রতি বিশ্বাসের পুনঃ ঘোষণার ভান করা সিদ্ধান্তের শেষে বিভাজন তত্ত্ব মেনে নিলেন। ১৯৪২ সালের এপ্রিল মাসে এলাহাবাদের সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটির এক অধিবেশনে প্রায় সর্বসম্মতিক্রমে ভারত বিভাগের প্রস্তাব ধিক্কৃত হল—বিরোধিতা করলেন বর্ত্তমান গভর্ণর জেনারেল মিঃ সি রাজাগোপাল-আচারী আর তার আধ ডজন সমর্থক—তথাকথিত জাতীয়তাবাদী মুসলমান মৌলানা আজাদ ছিলেন তখনকার কংগ্রেস সভাপতি। 'কয়েকমাস পরে তিনি এক রুলিং জারি করলেন যে কংগ্রেসের কার্যকরী সমিতি পাকিস্থানের নীতির প্রতি যে সমর্থন জানিয়েছিল, তার ওপর এলাহাবাদ সিদ্ধান্তের কোন প্রভাব কার্যকর হবে না। তখন কংগ্রেসের বুদ্ধি-সুদ্ধি সম্পূর্ণ লোপ পেয়েছে। ব্রিটিশ সরকার মুসলমান মন্ত্রী ও মুসলমান ঘেঁসা গভর্ণরদের দিয়ে দেশকে সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে রেখে চলেছেন। রাজন্যবর্গ যুদ্ধের সঙ্গে নিজেদের সম্পূর্ণ সামিল করে ছিলেন। ভারতের শ্রমিক শ্রেণী নিজেদের বিচ্ছিন্ন করতে চায়নি, ধনী শ্রেণী কংগ্রেসকে মুখে সমর্থন করল কিন্তু কাজের বেলা যত বেশি উচ্চমূল্যে পারল, সরকারকে তার প্রয়োজনের জিনিস সরবরাহ করে কার্যতঃ সরকারকে সমর্থন করল। এমন কি খদ্দর অনুরাগীরাও কম্বল সরবরাহ করলেন। কংগ্রেস এই সার্বিক পঙ্গুত্ব থেকে বেরিয়ে আসবার কোন পথই দেখতে পেল না। তারা ছিল সরকারের বাইরে—তাদের ক্ষীণ বিরোধিতা সত্ত্বেও সরকার দিব্য চলে যাচ্ছে।

**ট. কংগ্রেসের 'ভারত ছাড়ো' লীগের 'ভাগ কর ও ভারত ছাড়ো'**। নেহাৎ মরিয়া হয়েই গান্ধীজী 'ভারত ছাড়' নীতির সঙ্গে জড়িয়ে গেলেন। এ নীতি কংগ্রেস অনুমোদন করল। এই আন্দোলনকে বিদেশী শাসকদের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় বিদ্রোহ বলা হয়। গান্ধীজী নির্দ্দেশ দিলেন, 'হয় কর নয় মর'। নেতাদের দ্রুত

বন্দী করা হয়েছিল এবং রাখা হয়েছিল কারা প্রাচীরের অন্তরালে।
এছাড়া কয়েক সপ্তাহ ধরে কংগ্রেসের লোকেরা হিংসাত্মক গুপ্ত কাজ করেছিল। কিন্তু মাস তিনেকেরও কম সময়ে সরকার দৃঢ়তা ও বিচক্ষণতার সঙ্গে এ আন্দোলনকে শ্বাসরুদ্ধ করে বিনাশ করলেন। আন্দোলন অচিরে বন্ধ হয়ে গেল। যা পরে রইল তা হ'ল জেলের বাইরে থাকা কংগ্রেস সমর্থকদের আর কংগ্রেসী কাগজের কতকগুলি করুণ আবেদন। ওরা যে 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন নিজে থেকেই থেমে গেছে, সে আন্দোলন তুলে নেবার আগে নেতাদের মুক্তি চাইলেন। গান্ধীজী নিজেও নিজের মুক্তির জন্য একবার অনশন করলেন—কিন্তু জার্মানরা নিশ্চিত ভাবে পরাজিত না হওয়া পর্যন্ত নেতাদের জেলের ভেতরেই থাকতে হল। আমাদের সাম্রাজ্যবাদী প্রভুরা কিন্তু সব সময়েই জয়ী হয়ে রইলেন। মিঃ জিন্না প্রকাশ্যে ভারত ছাড়ো আন্দোলনের বিরোধিতা করেছেন কারণ এটা ছিল মুসলমানদের স্বার্থ বিরোধী আর তাই তিনি এক প্রতি-আওয়াজ তুললেন 'ভাগ কর এবং ভারত ছাড়ো'। গান্ধীজীর হিন্দু মুসলমান ঐক্য কোথায় এসে দাঁড়াল!

**৯. হিন্দী বনাম হিন্দুস্থানী**। ভারতের জাতীয় ভাষার প্রশ্নে মহাত্মাজীর যে বিকৃত মানসিকতা ফুটে উঠেছে—তাছাড়া আর কোথাও তার অবাস্তব হিন্দু মুসলমান নীতি এমন নির্বোধ ভাবে আর প্রকাশিত হয়নি ভাষাতাত্ত্বিক পরীক্ষায় হিন্দীরই এদেশের জাতীয় ভাষা হিসাবে স্বীকৃত হবার দাবী সবচেয়ে বেশি। ভারতে জীবন শুরু করবার সূচনায় গান্ধীজী হিন্দীকেই অনুপ্রাণিত করেছেন। কিন্তু যেই দেখলেন যে মুসলমানেরা হিন্দী পছন্দ করছে না, অমনি তার মত বদলে গেল, অমনি তিনি যাকে আমারা হিন্দুস্থানী বলি, তার প্রচারক হিসাবে দেখা দিলেন। ভারতবর্ষের সবাই জানেন, হিন্দুস্থানী বলে কোন ভাষা নেই, এর কোন ব্যাকরণ নেই, এর কোন শব্দভাণ্ডার নেই, এটা একটা উপভাষামাত্র—এটা বলা হয়, এতে সাহিত্য রচিত হয় না। এটা একটা শঙ্কর ভাষা, হিন্দী

আর উর্দুর মিলনে গঠিত ; মহাত্মার কুযুক্তিও একে জনপ্রিয় করতে পারল না। কিন্তু তবু শুধু মুসলমানদের তুষ্ট করবার অভিপ্রায়েই তিনি একা ভারতের জাতীয় ভাষা হিসাবে হিন্দুস্থানীর কথা বলে চললেন। তাঁর অন্ধভক্তেরা অবশ্য অন্ধভাবেই তাঁকে সমর্থন করে চললেন এবং ঐ শঙ্কর ভাষা ব্যবহার করা শুরু হ'ল। তিনি 'বাদশাহ রাম' এবং 'বেগম সীতা' জাতীয় শব্দ ব্যবহার শুরু করলেন কিন্তু কৈ তিনি মিঃ জিন্নাকে শ্রীযুক্ত জিন্না বা মৌলানা আজাদকে ত' পণ্ডিত আজাদ বলতে সাহস পেলেন না! তার সমস্ত পরীক্ষাই ছিল হিন্দুদের ওপর —হিন্দুদের ক্ষতি সাধন করে। একরোখা রাস্তার মত ছিল তার হিন্দু মুসলমান ঐক্যের বুলি। হিন্দী ভাষার মাধুর্য ও শুদ্ধতাকে মুসলমানদের জন্য ব্যাভিচারী করে তুলতে হবে—কিন্তু সমস্ত ভারতের অন্য অংশ দূরে থাক কংগ্রেসীরাও তার এই টোটকা হজম করতে রাজী হল না। তিনি হিন্দুস্থানীর সমর্থনে জিদ্ করে যেতে থাকলেন। কিন্তু হিন্দুদের বৃহত্তর অংশই প্রমাণ করলেন যে তারা অনেক বেশি শক্তিশালী, তারা তাদের সংস্কৃতি ও মাতৃভাষার প্রতি অনেক বেশি অনুরক্ত— মহাত্মার হুকুমের কাছে নত হতে তারা অস্বীকার করল। ফলে গান্ধীজী আর হিন্দী পরিষদে থাকলেন না—পদত্যাগ করলেন। কিন্তু তার অশুভ প্রভাব রয়েই গেল এবং আজও ভারত সরকার হিন্দী না হিন্দুস্থানী— কাকে ভারতের জাতীয়ভাষা করবেন তা নিয়ে দ্বিধা করছেন। গড় মেধার মানুষের নিম্নতম সাধারণ বুদ্ধিও একথা স্পষ্ট বুঝবে যে শতকরা আশি ভাগ মানুষের ভাষাই জাতীয় ভাষা হবে কিন্তু মুসলমানদের জন্য তাঁর বাহ্যাড়ম্বরপূর্ণ সমর্থনের জন্য তিনি যখন হিন্দুস্থানীর প্রতি তাঁর পক্ষপাতের কথা বলে যেতে থাকলেন তখন তা নিতান্ত মূর্খোচিত বলেই মনে হতে থাকল। সৌভাগ্যবশে হিন্দী ভাষা এবং দেবনাগরী হরফের পক্ষে লক্ষ লক্ষ প্রচারক আছে। উত্তর প্রদেশের সরকার হিন্দীকে তাদের প্রাদেশিক ভাষা হিসাবে গ্রহণ করেছেন। ভারত সরকার সমগ্র সংবিধানের খসড়াটি বিশুদ্ধ হিন্দীতে অনুবাদ করবার জন্য একটা সমিতিও গঠন করেছেন। এখন সংসদীয়

কংগ্রেস সভ্যরা হিন্দীর পক্ষে গ্রহণীয় মতটিকে গ্রহণ করবেন না একটা বিদেশী ভাষাকে বৃহত্তর ভারতীয় জনমন্ডলীর ওপর চাপিয়ে দেবার মত উন্মাদীয় প্রচেষ্টাকে মেনে মহাত্মাজীর প্রতি তাদের আনুগত্য দেখাবেন, তা নির্ভর করছে কংগ্রেস দলের ওপর। বাস্তব দিক থেকে দেখলে হিন্দুস্হানী উর্দুরই নামান্তর মাত্র। গান্ধীজী কিন্তু হিন্দীর বদলে উর্দু গ্রহণের ওকালতি করতে সাহস পেলেন না। আর তাই হিন্দুস্হানীর ঘোমটা পরিয়ে উর্দুকে চোরা পথে চালাবার এই ছলনা। কোন জাতীয়তাবাদী হিন্দুর কাছে উর্দু নিষিদ্ধ নয়—কিন্তু হিন্দুস্হানীর ছদ্মবেশে উর্দুকে চোরাচালানের এই চেষ্টা একটা জালিয়াতি এবং শাস্তিযোগ্য অপরাধ। মহাত্মা তাই করবার চেষ্টা করেছিলেন। শুধু মুসলমানেরা খুশি হবে বলেই একটা উপভাষাকে ভাষার মর্যাদা দিয়ে হিন্দুস্হানী নামে বিদ্যালয়ের শিক্ষাসূচীতে এবং শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে চালাবার এই চেষ্টা মহাত্মাজীর পক্ষে এক নিম্ন শ্রেণীর সাম্প্রদায়িকতার দৃষ্টান্ত। এগুলি সবই হিন্দুমুসলমান ঐক্যের জন্য।

ড **বন্দেমাতরম্ গাওয়া চলবে না**। মুসলমানদের জন্য গান্ধীজীর যে বিমুগ্ধতা, তাদের নেতৃত্ব পাবার জন্য তাঁর মধ্যে যে অসংশোধনীয় তীব্র আকাঙ্খা—তার জন্য তিনি ঠিক কি বেঠিক বা সত্য কি ন্যায় কিছুই বিচার করতেন না এবং প্রয়োজনে হিন্দুদের মানসিকতাকে অবনমিত করতেও দ্বিধা করতেন না—সব মিলিয়ে এটাই ছিল মহাত্মার উপচিকীর্ষার সর্বোচ্চ সীমারেখা। এ কথা সকলেই জানে যে কিছু সংখ্যক মুসলমান সুবিখ্যাত 'বন্দেমাতরম্' গানটিকে পছন্দ করেন না আর তাই মহাত্মা এর পর থেকে এই গান গাওয়া বা আবৃত্তি করা যেখানেই পারতেন বন্ধ করতেন। এই গান প্রায় একশ বছর ধরে বাঙ্গালীদের জাতিকে অন্য একজন মানুষের মত উঠে দাঁড়াতে অন্তরোৎসারিত অনুপ্রেরণা সঞ্চার করার জন্য সম্মানিত হয়ে আসছে। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ প্রতিরোধ আন্দোলনে এই সংগীত আরও গুরুত্ব ও জনপ্রিয়তা লাভ করে। সংখ্যাতীত জনসভায় যখনই এ গান গাওয়া

হয়েছে, বাঙ্গালীরা প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেছে—মাতৃভূমির জন্য নিজেকে উৎসর্গ করেছে। ব্রিটিশ শাসকেরা এর অন্তর্নিহিত অর্থ বুঝত না। এর সাধারণ অর্থ 'মাতৃভূমি তোমায় প্রণাম'—তারা এই গানটিকে বছর চল্লিশেক আগে কিছুদিনের জন্য নিষিদ্ধ করে দিয়েছিল—এর ফলে সারাদেশব্যাপী গানটি আরও জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। কংগ্রেস ও অন্যান্য জাতীয় সমাবেশে এ গান গাওয়া শুরু হয়ে যায়। কিন্তু যেই কোন একজন মুসলমান গান্ধীজীকে তার আপত্তি জানালেন, অমনি তিনি এই গানটির পেছনে যে জাতীয় মানসিকতা রয়েছে তাকেও অসম্মান করতে শুরু করলেন, কংগ্রেসকেও এই গানটিকে জাতীয় সংগীত না করবার জন্য জেদ করতে থাকলেন। আজ এর বদলে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'জনগণ মন' গাইতে বলা হচ্ছে। এমন একটি বিশ্বখ্যাত সংগীতের বিরুদ্ধে এমন নির্লজ্জ কাজের চাইতে হতাশার এবং বেদনার আর কি থাকতে পারে? এর কারণ কি না একজন অজ্ঞ ধর্মোন্মাদ একে পছন্দ করেন নি। এগুবার প্রকৃত পথ ছিল অজ্ঞটিকে জ্ঞানালোকে প্রদীপ্ত করা, তাকে সংস্কার মুক্ত করা। কিন্তু ত্রিশ বছর ধরে অসীম জনপ্রিয়তা ও অবিসংবাদী নেতৃত্বের অধিকারী হয়েও গান্ধীজী এ নীতি গ্রহণের সাহস সঞ্চয় করতে পারলেন না। তাঁর হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের ধারণা হচ্ছে মুসলমানেরা যাই চাক না কেন তার সঙ্গে আপোষ করা, আত্মসমর্পন করা এবং মেনে নেওয়া। আশ্চর্য হবার কিছুই নেই গান্ধীজীর মনের মধ্যে বাসা বেঁধে থাকা ঐ ঐক্য কখনও আসে না, আসতে পারে না।

ঢ. **'শিব-ভবানী' নিষিদ্ধ।** গান্ধীজী শিবভবানীর প্রকাশ্য পাঠ বা আবৃত্তি নিষিদ্ধ করেন। এটি একজন হিন্দু কবির ৫২টি সুন্দর কবিতার এক সংকলন। এই গ্রন্থে তিনি শিবাজীর মহাশক্তি এবং কিভাবে তিনি হিন্দু সমাজ ও হিন্দু ধর্ম রক্ষা করেছেন—তার বর্ণনা করেছেন। এর ধ্রুবপদের অর্থ হচ্ছে: শিব যদি না থাকতেন তবে সমগ্র জগত ইসলামে পরিণত হ'ত। এখানে শিবভবানী কাব্যের সমাপ্তি সূচক পদটি আবৃত্তি করা হয়েছিল—

কাশীজী কা কলা জাতি মথুরা মস্‌জিদ্‌ হোতি।
শিবাজী জী ন হোতে তো সুন্নৎ হো সবকী।

শিবাজী যদি না জন্মাতেন তবে কাশীর গৌরব ধ্বংস হ'ত, মথুরা হত মসজিদ, সকলেই মুসলমান হয়ে যেত। ]

সমকালের ইতিহাস থেকে এ ছিল লক্ষ লক্ষ মানুষের আনন্দের সামগ্রী, এ ছিল সাহিত্যের এক সুন্দর সৃষ্টি। গান্ধীজী কি ধার ধারেন এসবের! হিন্দ-মুসলমান ঐক্যই বটে।

**ণ. সুরাবর্দ্দীর পৃষ্ঠপোষকতা॥** লর্ড ওয়েভেল যখন পণ্ডিত নেহেরুকে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গড়তে আহ্বান করলেন এবং মুসলীম লীগ তাতে যোগ দিতে অস্বীকার করল—তখন লীগ ঘোষণা করল পণ্ডিত নেহেরু যে কোন সরকার গড়লেই তারা ১৯৪৬ সালের ১৫ আগস্ট থেকে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম শুরু করবে। পণ্ডিত নেহেরু দায়ভার গ্রহণের সপ্তাহ দুয়েকের কিছু বেশি আগে কলকাতায় খোলাখুলি ভাবে হিন্দু হত্যা শুরু হ'ল এবং অপ্রতিহত বেগে চলল তিন দিন। কলকাতা থেকে প্রকাশিত 'স্টেট্‌সম্যান্‌' পত্রিকায় সেই তিন দিনের বিভীষিকার বিবরণ পাওয়া যাবে। সে সময়ে ভাবা হয়েছিল যে, যে সরকার তার নাগরিকদের ওপর এমন আক্রমণ অনুমোদন করে, তাকে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হবে। এমন ইঙ্গিতও পাওয়া গেছিল যে সুরাবর্দী সরকারকে বরখাস্ত করা হবে। কিন্তু সমাজবাদী গভর্ণর ভারতসরকার আইনের ৯৩ ধারা বলে শাসনভার তুলে নিতে রাজী হলেন না। যাইহোক গান্ধীজী গেলেন কলকাতায় এবং এই সমস্ত হত্যাকাণ্ডের রচনাকারের সঙ্গে এক বিস্ময়কর বন্ধুত্ব গড়ে তুললেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি সুরাবর্দী এবং মুসলীম লীগের হয়ে মধ্যস্থতা শুরু করলেন। ঐ তিন দিন ধরে যে হিন্দুহত্যা চল্‌ল—জীবন ও সম্পত্তি রক্ষার জন্য কলকাতার পুলিশ একটুও চেষ্টা করল না। আইন শৃঙ্খলার রক্ষকদের চোখের ওপর এবং নাকের ডগায় সংখ্যাতীত হত্যা ও বলাৎকারের ঘটনা ঘটল—কিন্তু গান্ধীজীর তাতে কি আসে যায়। তাঁর কাছে যে সুরাবর্দী প্রশংসার জিনিস। তার থেকে তিনি সরে

আসবেন কি করে? প্রকাশ্যে তিনি সুরাবর্দীকে ধর্মার্থ-প্রাণ (শহীদ) বলে বর্ণনা করলেন। অবাক হবেন না, দুমাসের মধ্যে নোয়াখালিতে এবং ত্রিপুরায় মুসলমান ধর্মোন্মত্ততার উৎকট বহিঃপ্রকাশ ঘটল। আর্যসমাজের এক প্রতিবেদনে জানা যায় ৩০,০০০ হিন্দু রমনীকে জোর করে ধর্মান্তরিত করা হয়েছিল। তিন লক্ষেরও বেশি হিন্দুকে হত বা নিহত করা হয়েছিল। কত কোটি টাকার সম্পত্তি যে লুট বা ধ্বংস করা হয়েছিল তার কথা বলা যাবে না। গান্ধীজী তখন নোয়াখালিতে এক পরিদর্শনে গেলেন। বলা হল তিনি একা গেলেন। একথা সকলেই জানে যে তিনি যেখানেই গেছেন, সেখানেই সুরাবর্দী তাকে রক্ষার দায়িত্ব নিয়েছেন। তা সত্বেও তিনি নোয়াখালি জেলায় ঢুকতে সাহস পেলেন না। এই সমস্ত দাঙ্গা, জীবন ও সম্পত্তির বিনাশ—সবই ঘটেছিল সুরাবর্দী যখন প্রধানমন্ত্রী—আর অন্যায়ের এত বড় একজন দানব আর সাম্প্রদায়িকতার মত তীব্র বিষের মত একজন মানুষকে গান্ধীজী এক অযৌক্তিক উপাধি দিলেন 'শহীদ'।

ত. **হিন্দু ও মুসলমান রাজন্যদের প্রতি আচরণ**॥ গান্ধীজীর অনুগতেরা খুব নিপুণভাবেই জয়পুর, ভাবনগর এবং রাজকোটের হিন্দু রাজন্যবর্গকে অপমানিত করেছিলেন। এক হিন্দু রাজন্যের বিরুদ্ধে এক কাশ্মীরী বিদ্রোহীকে এরা সমর্থনও করে না। মুসলমান রাজ্যের জন্য গান্ধীজী যা করেন এটা তারই উল্টো দিক। গোয়ালিয়রে মুসলীম লীগের সঙ্গে এমনই এক ষড়যন্ত্র হয়। এর ফলে চারবছর আগে বিক্রম-ক্যালেণ্ডারের দ্বি-সহস্র বর্ষপূর্ত্তি উৎসব বাতিল করে দিতে বাধ্য হন। মুসলমানদের বিক্ষোভ ছিল সম্পূর্ণ সম্প্রদায়ভিত্তিক। মহারাজও ছিলেন উদারপন্থী এবং নিরপেক্ষ শাসক। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিও স্বচ্ছ ছিল। সাম্প্রতিক কালে কয়েকটি সাধারণ হিন্দু-মুসলমান সংঘর্ষ হয়। যেহেতু মুসলমানের নিহতের সংখ্যা বেশি ছিল, তাই বিস্ফোরকের তেজে উদ্দীপ্ত গান্ধীজী মহারাজের কাছে ফেটে পড়েন।

**থ. গান্ধীজীর আমরণ অনশন।** ১৯৪৩ সালে গান্ধীজী যখন আমরণ অনশন করছিলেন, তখন একান্ত কাছের এবং প্রিয়জনরাই তার কাছে গিয়ে স্বাস্থ্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে অনুমতি পেতেন। কাউকেই রাজনৈতিক কথা বলতে অনুমতি দেওয়া হ'ত না। রাজা গোপাল আচারী কিন্তু বেআইনীভাবে গান্ধীজীর ঘরে যান এবং পাকিস্থান মেনে নেওয়ার এক ষড়যন্ত্র পাকিয়ে তোলেন। গান্ধীজী তাকে জিন্নার সঙ্গে এ বিষয়ে যোগাযোগ করতে বলেন। পরবর্ত্তী সময়ে ১৯৪৪ সালের শেষ দিকে গান্ধীজী মিঃ জিন্নার সঙ্গে এ বিষযে তিন সপ্তাহ ধরে কথা বলেন এবং প্রকৃতপক্ষে আজ যাকে পাকিস্থান বলা হচ্ছে তা দিতে চান। তিনি রোজ মিঃ জিন্নার বাড়িতে যেতেন, তাকে তোষামোদ করতেন, প্রশংসা করতেন, আলিঙ্গন করতেন—কিন্তু 'বুকের এক পাউণ্ড মাংসের' দাবীর মত পাকিস্থানের দাবী কিন্তু ছাড়াতে পারা গেল না। হিন্দু-মুসলমান ঐক্য নেতিবাচক দিকেই এগুতে থাকল।

**দ. দেশাই লিয়াকৎ চুক্তি ॥**

১৯৪৫ সালে এল কুখ্যাত দেশাই লিয়াকৎ চুক্তি। একটা জাতীয় গণতান্ত্রিক দল হিসাবে কংগ্রেসের অপমৃত্যুর যেটুকু বাকী ছিল তার সবটুকুই শেষ হল এই চুক্তিতে। তখন ভুলাভাই দেশাই ছিলেন দিল্লীর কেন্দ্রীয় আইন-সভার কংগ্রেসের পরিষদীয় দলের নেতা আর লিয়াকৎ আলি খান ছিলেন ঐ সভারই লীগের পরিষদীয় দলের নেতা। যুদ্ধ শুরু হওয়া থেকে ভারতীয় রাজনীতিতে যে জট পাকিয়ে উঠছিল তার মীমাংসার জন্য তারা ব্রিটিশ সরকারের কাছে যৌথভাবে এক সম্মেলনের দাবী জানালেন। ১৯৪২ সালের সিদ্ধান্ত অনুসারে কংগ্রেস যে 'ভারত ছাড়' আন্দোলন শুরু করে সেই থেকে কংগ্রেসের প্রায় সব নেতারাই ছিলেন জেলে। তাই বোঝা যায় দেশাই কোন স্তরের কোন কংগ্রেসী নেতার সঙ্গেই আলোচনা না করে নিজেই এ সিদ্ধান্ত নেন। দেশাই ঐ সম্মেলনে মুসলমান ও কংগ্রেসের সমান প্রতিনিধিত্বের প্রস্তাব রাখলেন আর এরই ভিত্তিতে বড়লাট এই সম্মেলন ডাকতে স্বীকৃত হলেন। তদানীন্তন বড়লাট এই যৌথ

আবেদন পেয়ে বিমানযোগে লণ্ডনে গিয়ে শ্রমিক দলের সরকারের কাছ থেকে এই সম্মেলন অনুষ্ঠানের সম্মতি নিয়ে ফিরে এলেন। এর সরকারী বিবৃতি প্রকাশিত হলে গোটা দেশ স্তব্ধ হয়ে গেল। কারণ এটা গণতন্ত্র ও জাতীয়তার সঙ্গে সমান বিশ্বাসঘাতকতা এবং এর এক পক্ষের দায় পড়ল কংগ্রেসের ওপর। আবার ভারতীয় গণতন্ত্রকে পিছন থেকে ছুরি মারা হ'ল—ন্যায়ের সমস্ত নীতি হল উপেক্ষিত।

পরে বোঝা গেল এ প্রস্তাবে মহাত্মার আশীর্বাদ আছে আর প্রকৃতপক্ষে তাকে আগেই জানিয়ে এবং তার সম্মতি নিয়েই এ প্রস্তাব করা হয়েছিল। কংগ্রেস দলের সকলের সম্মতিতে দেশের ২৫% লোককে ৫০% ভাগের সমান করা হল আর ৭৫% লোককে নামিয়ে আনা হল ৫০% ভাগে। বড়লাটও সম্মেলন অনুষ্ঠানের কয়েকটি সর্ত্ত যোগ করে দিলেন। সেগুলি হ'ল,

(১) জয় না হওয়া পর্যন্ত জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে কংগ্রেস ও সব রাজনৈতিক দলের নিঃসর্ত্ত সমর্থনের মুচলেখা।

(২) একটা সম্মিলিত সরকার গঠিত হবে যাতে কংগ্রেস ও মুসলীমরা পাঁচজন করে প্রতিনিধি পাঠাবে—এছাড়া শিখ ও অন্যান্য সংখ্যালঘু ও অনুন্নত শ্রেণীর একজন করে প্রতিনিধি থাকবে।

(৩) ভারত ছাড় আন্দোলন নিঃসর্ত্তে তুলে নিতে হবে এবং ফলতঃ ঐ ব্যাপারে আটক কংগ্রেসী নেতারা মুক্তি পাবেন।

(৪) সমস্ত রকম শাসনতান্ত্রিক সংস্কার হবে ১৯৩৫ সালের ভারতসরকার আইনের চৌহদ্দির মধ্যে।

(৫) গভর্ণর জেনারেল এবং ভাইসরয় গঠনতান্ত্রিক যে ক্ষমতায় আছেন বর্ত্তমানে, নতুন অবস্থাতেও ঠিক তেমনি থাকবেন অর্থাৎ তারা থাকবেন সরকারের শীর্ষে।

(৬) যুদ্ধশেষে পূর্ণ স্বাধীনতার প্রশ্ন গণপরিষদের মাধ্যমে মীমাংসিত হবে।

(৭) এগুলি যদি কোন পরিমার্জন ছাড়াই গৃহীত হয় তবে বড়-

লাট সমস্ত মন্ত্রীত্বের দায়িত্ব ক্রমে ২ ধারা অনুসারে গঠিত সরকারকে তুলে দেবেন।

যে মানুষেরা মাত্র তিন বছর আগে পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য 'ভারত ছাড়' আন্দোলন শুরু করেছিলেন, এবং জনগণকে তাদের বিদ্রোহী সত্তাকে পূর্ণ কাজে লাগাতে বলেছিলেন 'হয় মর নয় কর'—তারাই ব্রিটিশ ভাইসরয়ের বেঁধে দেওয়া সর্ত্ত ও বিধি মেনে মন্ত্রীত্ব গ্রহণের জন্য নিজেদের নিবেদন করলেন। প্রকৃত ঘটনা যা তা হচ্ছে এই যে, 'ভারত ছাড়' আন্দোলন ব্যর্থ হয়েছিল আর কংগ্রেসেরও কোন বিকল্প কর্মসূচী ছিল না। ঘটনাবলীও এমনভাবে ঘুরছিল যে কংগ্রেস তাকে গ্রহণ করবে কি না, সেটাই হয়ে উঠেছিল বড় প্রশ্ন। কংগ্রেসের এই দেউলিয়া অবস্থায় একমাত্র লাভবান হয়েছিলেন মিঃ জিন্না। পরবর্ত্তী সমস্ত আলোচনায় মুসলমান প্রতিনিধিত্ব ৫০% মেনে নেওয়ায় তিনি কৌশলগত সুবিধা অর্জন করেছিলেন। যদিও সম্মেলন ব্যর্থ হল, হিন্দু-মুসলমান ঐক্য মিললন না—মাঝখান থেকে তুড়ি মেরে বেরিয়ে গেল দ্বিজাতি-তত্ত্ব আর পাকিস্থানের দাবী।

**ধ. কেবিনেট মিশন প্ল্যাণ্ট্।।**

১৯৪৬ সালের গোড়ার দিকে ভারতে এলো কেবিনেট মিশন। এই মিশনে ছিলেন তখনকার ভারত-সচিব লর্ড লরেন্স, যুদ্ধ সচিব মিঃ আলেকজেণ্ডার এবং স্যার স্ট্যাফোর্ড্ ক্রিপস্। ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ এটলি পার্লামেণ্টে এদের ভূমিকা বর্ণনা করলেন। আবেগ-দীপ্ত ভাষায় মিঃ এটলি ব্রিটিশ সরকারের মনোভাব প্রকাশ করলেন যে, যদি ভারত কোন সর্বসম্মতঃ পরিকল্পনায় সম্মত হয়, তবে ব্রিটিশ সরকার যত দ্রুত সম্ভব ক্ষমতা হস্তান্তর করে দিতে দৃঢ়সংকল্প। এই সম্মতিটাই ছিল এই কমিশনের কেন্দ্রবিন্দু কিন্তু এটাই ছিল মারাত্মক। সংযুক্ত ভারতের জন্য কংগ্রেস সত্যিই সম্মত ছিল, কিন্তু তার-এ প্রত্যয়ে সে দৃঢ়তা ছিল না।—তাদের দৃঢ়তার অভাব ছিল। পক্ষান্তরে মিঃ জিন্না ছিলেন বিভক্ত ভারতের পক্ষপাতী কিন্তু তিনি দৃঢ়তার সঙ্গেই দাবী করেছিলেন। এই দুই বিরুদ্ধ মতের মধ্যে কোন সম-

ঝোতায় পৌঁছান অসম্ভব বলেই মনে হল কমিশনের। তারা দু'দলের সংগে বেসরকারী ভাবে আলোচনা করলেন এবং শেষ পর্যন্ত ১৯৪৬ সালের ১৫ই মে তাদের সিদ্ধান্ত জানালেন। তারা দশটি যুক্তিতে ভারত বিভাগের প্রস্তাবকে বাতিল করে দিলেন এবং ভারতের ঐক্যবদ্ধ থাকার প্রয়োজনীয়তার কথা দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করে পাকিস্থানকে পেছন দরজা দিয়ে বেরই করে দিলেন। মিশন তার প্রস্তাবের পঞ্চদশ অনু-চ্ছেদে স্বাধীন ভারতবর্ষের গঠনতন্ত্র প্রস্তুতির জন্য এক নিয়মতান্ত্রিক সভা গড়বার জন্য ব্রিটিশ সরকারকে ছ'টি সর্ত্ত বেঁধে দেন। এই ছ'টি সর্ত্ত এমনভাবেই তৈরী হয়েছিল যাতে ভারতের জাতীয় ঐক্য কোন ক্রমেই রক্ষিত না হয় এবং ভারত পূর্ণ স্বাধীনতাও পেতে না পারে—যদিও নিয়মতান্ত্রিক সভাটি হবে একটি নির্বাচিত সভা। 'ভারত ছাড়' আন্দোলন ব্যর্থ হওয়ায় কংগ্রেসদল এত ভেঙ্গে পড়েছিল যে, ধ্বসে পড়া জাতীয়তাবোধের ওপর একটা ধোঁয়াটে আবরণ মাত্র রেখে, তারা এই মিশনের প্রস্তাব মেনেই নিয়েছিল। যদিও একটু ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে বলা তবু মিশনের প্রস্তাবগুলি ভারতবর্ষকে টুকরো টুকরো করে দেওয়ার পক্ষেই ছিল এবং একে মেনে নিয়ে কংগ্রেস প্রকৃতপক্ষে পাকিস্থানকেই স্বীকার করে নিয়েছিল। কংগ্রেস এই পরিকল্পনা মানল কিন্তু সরকার গঠনে রাজি হ'ল না। মোদ্দা কথা হ'ল এই যে এই পরিকল্পনার গোটাটাই নিঃসর্ত্তে মেনে সরকার গঠনের জন্য আহ্বান জানান হ'ল কংগ্রেসকে কিন্তু মিঃ জিন্না এ কারণে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগ এনে লীগকে 'প্রত্যক্ষ সংগ্রামে'র পরামর্শ দিলেন। বাঙলাদেশ, পাঞ্জাব, বিহার, বোম্বাই এবং ভারতবর্ষের আরও নানা জায়গা রক্তপাত, অগ্নিসংযোগ, লুঠতরাজ এবং ধর্ষণের এমন ব্যাপকতায় অভিষিক্ত হ'ল যার দৃষ্টান্ত ইতিহাসে ছিল না। হতাহতের মধ্যে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ হল হিন্দু। কংগ্রেস ভয়ে অভিভূত হয়ে নপুংসকের মত দাঁড়িয়ে রইল, কোথাও হিন্দুদের এতটুকু রক্ষা করতে পারল না। গভর্ণর জেনারেল ১৯৩৫ সালের আইনের বলে শান্তিভঙ্গ ও স্থিরাবস্থা আনয়নের জন্য শক্তি প্রয়োগ

করতে পারতেন, কিন্তু তা না করে তিনি বিষয়টা শুধু দেখলেন—আইনের প্রতি তার আনুগত্য দেখলেন না। কয়েক লক্ষ লোক হত্যা করা হ'ল, কয়েক সহস্র শিশু ও নারী অপহরণ করা হল আর তাদের মধ্যে সামান্য কয়েকজনকেই খুঁজে বের করা সম্ভব হ'ল। হাজার হাজার নারী হলেন ধর্ষিতা। সহস্র কোটি টাকা মূল্যের সম্পত্তি লুঠ, ধ্বংস বা অগ্নিসংযোগ করা হ'ল। হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের লক্ষ্য থেকে মহাত্মা যতদূরে থাকবার তত দূরেই থাকলেন।

**ন. জিন্নার কাছে কংগ্রেসের আত্মসমর্পন।** পরবর্তী বৎসরগুলিতে সশস্ত্র হুমকীর মুখে কংগ্রেস পার্টি নীচু হয়ে মিঃ জিন্নার কাছে আত্মসমর্পন করেন এবং পাকিস্হান মেনে নেয়। এরপর কি ঘটল তা সকলের কাছেই সুপরিচিত। স্তুতি দিয়ে গান্ধীজী মুসলমানদের যে ক্রমোবর্দ্ধমান অনুপ্রেরণার সঞ্চার করেছিলেন, তারই সুতোয় গাঁথা এই ঘটনাভরা বরমালা। তিনি বাস্তুত্যাগী লক্ষ লক্ষ হিন্দুদের প্রতি সমবেদনা বা দুঃখ উপসমের মত একটি কথাও বললেন না। মানবতার প্রতি তার একটিই চোখ ছিল আর তা মুসলমানদের মানবতা। হিন্দুরা তার কাছে গণ্যই ছিল না। গান্ধীজীর সাধুতার এই দিকগুলি আমাকে বেদনাবিদ্ধ করেছিল।

**প. পাকিস্থান সম্পর্কে দ্ব্যর্থবাচক বিবৃতি॥** কোন এক প্রবন্ধে গান্ধীজী নমোনমো করে প্রকাশ্যে পাকিস্হানের বিরোধিতা করেন। তার মধ্যে এক জায়গায় বলা হয়েছে সমস্ত মুসলমান যদি যে কোন মূল্যে পাকিস্হান চায় তবে তাকে প্রতিহত করবার শক্তি কারো নেই। একমাত্র মহাত্মাই জানেন এই ঘোষণার প্রকৃত অর্থ কি। একি ভবিষ্যৎ বাণী ; না কি একটা বিবৃতি মাত্র, না কি পাকিস্হানের দাবীকে অস্বীকার করা ?

**ফ কাশ্মীর মহারাজকে অসৎ পরামর্শ দান॥** কাশ্মীরসম্পর্কে মহাত্মা বারবার একথা ঘোষণা করেছেন যে কাশ্মীরের মহারাজা রাজ্যের দায়িত্ব শেখ আবদুল্লাকে দিয়ে বেনারসে অবসর যাপন করবেন। সেখানকার জনসংখ্যার বেশির ভাগ মুসলমান হওয়া ছাড়া এমন পরা-

মর্শের অন্য কোন সুনির্দিষ্ট কারণ দেখা যায় না। জনসংখ্যার বেশির ভাগ হিন্দু প্রজায় ভরা হায়দ্রাবাদ সম্পর্কে গান্ধীজীর মানসিকতাটা কিন্তু উল্টো নীতির। সেখানকার নিজামকে কিন্তু তিনি একবারও মক্কায় অবসর নেওয়াব কথা বলেন নি।

ব. **মাউন্টব্যাটনের ভারত বিভাগ**। ১৯৪৬ সালের ১৫ই আগষ্ট থেকে মুসলীম লীগেব নিজস্ব সশস্ত্র বাহিনী যেখানেই সম্ভব হয়েছে সেখানেই হিন্দুদের হত্যা করেছে, উচ্ছেদ করেছে, ধ্বংস করেছে। তখনকার ভাইসরয়, লর্ড ওয়েভেল নিঃসন্দেহে এতে বিব্রত হয়েছেন। কিন্তু ১৯৩৫ সালের ভারতবর্ষ আইনের আওতায় গঠিত সরকারের জন্য তার ক্ষমতা কাজে লাগাতে পারেন নি—দাক্ষিণাত্যের সামান্য প্রতিক্রিয়া ছাড়া বাংলা থেকে করাচি পর্যন্ত এই হত্যাকাণ্ড ও হিন্দু রক্তপাত বন্ধ করতে পারলেন না। কারণ ১৯৪৬ সালের ২রা সেপ্টেম্বর থেকে শুরু করে সমস্তটা সময় ধরে মন্ত্রীপবিষদ দখল করে ছিল এক তথাকথিত জাতীয় সরকার। –এরা পরস্পর চরম বিরোধী দুই মানসিকতাব প্রতিনিধিতে পূর্ণ ছিল—আর কংগ্রেস এবং মুসলীম লীগ শতকরা ৫০% ভাগ হওয়ায় এই সংযুক্ত সরকারকে কাজ না করতে দেওয়ার জন্য তাদের সাধ্যায়ত্ত্ব সব কিছুই করতে থাকল। মুসলীম লীগের সভ্যেরা সরকারকে কাজ করতে না দেবার মত অন্তর্ঘাতমূলক কাজ যতই করতে থাকল, ততই গান্ধীজী তাদের স্তুতিতে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতে থাকলেন। লর্ড ওয়েভেল কোন একটা মীমাংসা করতে না পারায় পদত্যাগ করতে বাধ্য হলেন। তার মধ্যে খানিকটা বিবেক ছিল যেজন্য তিনি ভারত বিভাগকে সমর্থন করতে পারতেন না। তিনি খোলাখুলি ভাবে বলেছিলেন যে ভারত বিভাগ আবশ্যকও নয়, প্রত্যাশিতও নয়। তিনি অবসর গ্রহণ করলে, তার স্থান এসে পূরণ করলেন, মাউন্টব্যাটেন। কাষ্ঠ দেবতার বদলে জলচরের রাজ্যে এলেন বক-দেবতা। উত্তর-পূর্ব এশিয়ার এই শীর্ষ নিয়ন্ত্রকটি ছিলেন সম্পূর্ণ সামরিক ব্যক্তি আর তাঁর সাহসী এবং নাছোড়বান্দা

হিসাবে বেশ খ্যাতি ছিল। অবশ্য সম্পাদনের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা নিয়েই তিনি এদেশে এসেছিলেন এবং তিনি যা করেছিলেন তা হচ্ছে এই ভারত-বিভাজন। তিনি ঐ নর-ঘাতকদের প্রতি ছিলেন আরও নির্বিকার। তার চোখের সামনে এবং নাকের ডগায় রক্তের নদী বইতে থাকল। বাইরে থেকে মনে হয় তিনি ভাবছিলেন যে যত বেশি হিন্দুহত্যা হয়, ততই তার উদ্দেশ্য-বিরোধীর সংখ্যা কমে।—শত্রুর যত বেশি নিধন হয়—ততই তাঁর জয়। তিনি তার উদ্দেশ্যকে নির্দয়ভাবে তাঁর যুক্তির উপসংহারে নিয়ে যেতে চাইছিলেন। ক্ষমতা হস্তান্তরের ঘোষিত সময় ছিল ১৯৪৬ সালের জুন। কিন্তু তার আগেই এই ব্যাপক হিন্দুহত্যা তার ফল ছিল। জাতীয়তাবোধ এবং গণতন্ত্র কংগ্রেস আগেই চুলোয় দিয়েছিল এখন গোপনে, আলঙ্কাবিক ভাবে বললে বেয়নেটের মুখে মিঃ জিন্নার কাছে মাথা নীচু করে আত্মসমর্পণ করল। ভাবতবর্ষ বিভক্ত হল। ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট থেকে ভাবতবর্ষের সমগ্র অঞ্চলের এক-তৃতীয়াংশ আমাদের কাছে হ'ল বিদেশ। কংগ্রেসী মহলের কাছে লর্ড মাউণ্টব্যাটেন ভারতের সবচেয়ে মহান ভাইসরয় এবং গভর্ণর জেনারেল হিসাবে খ্যাত হলেন। ৩০ জুন ১৯৪৮ সালের দশমাস আগে তিনি ভারতকে রাষ্ট্র সংজ্ঞা দিয়েছেন। এই হচ্ছে ত্রিশ বছর অপ্রতিহত একনায়কত্বের ফলে গান্ধীজী যা এনে দিলেন এবং একেই কংগ্রেস বলছে স্বাধীনতা। পৃথিবীর ইতিহাসে এত মৃত্যুকে এমন সরকারীভাবে উপেক্ষা করা হয় নি—অথবা তার ফলকে বলা হয় নি 'স্বাধীনতা' বা 'শান্তিপূর্ণ ক্ষমতা হস্তান্তর'। ১৯৪৬, ১৯৪৭ বা ১৯৪৮ সালে যা ভারতে ঘটেছে তাকে শান্তিপূর্ণ বললে জানি না সহিংস কাকে বলা হবে। হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের ফুলানো বেলুন এমনি করেই সশব্দে ফেটে গিয়ে ঐক্যবন্ধ ভারতের স্বপ্নকে শূন্যে মিলিয়ে দিল—নেহেরুজীর সমর্থনেই প্রতিষ্ঠিত হল সর্ববিষয়ে ভারত থেকে পৃথক এক ধর্মভিত্তিক সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র। আর নেহেরুর সমর্থকেরা চিৎকার করতে থাকল, তাদের আত্মত্যাগেই স্বাধীনতা অর্জিত হ'ল। কিন্তু কাদের আত্মত্যাগ ?

**ভ. গো-হত্যা ও গান্ধীজী ॥** গো-রক্ষার দিকে গান্ধীজীর ছিল সুতীব্র আকাঙ্খা। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এবিষয়ে তিনি কিছুই করেন নি। উল্টো দিকে তিনি তাঁর কোন প্রাক্-প্রার্থনা বক্তৃতায় গোহত্যা প্রতিরোধে তার অক্ষমতার কথা স্বীকার করেছিলেন। তাঁর সেই বক্তৃতার কিছু অংশ নীচে তুলে দেওয়া হ'ল।

"আজই রাজেন্দ্রবাবুর কাছ থেকে সংবাদ পেয়েছি যে তিনি প্রায় পঞ্চাশ হাজার পোষ্টকার্ড এবং বিশ-ত্রিশ হাজার টেলিগ্রাম পেয়েছেন —এগুলিতে আইন করে গোহত্যা বন্ধ করবার জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ জানান হয়েছে। এ বিষয়ে আমিও আগে আপনাদের বলেছি। তা হলে আমার কাছে এতগুলো পোষ্টকার্ড বা টেলিগ্রাম পাঠাবার কারণ কি? এগুলো কোন কাজেই লাগবে না। গোহত্যা বন্ধ করার জন্য ভারতে কোন আইন বিধিবন্ধ হতে পারে না। যে লোক স্বেচ্ছায় গোহত্যা নিষেধ বলে ভাবতে চায়না, আমি জোর করে তার ওপর আমার মত চাপিয়ে দেব কি করে? ভারত শুধুই হিন্দুদের রাষ্ট্র নয়। এখানে মুসলমান, পারসিক বা খৃষ্টানেরাও বাস করেন। ভারত হিন্দুদেরই রাষ্ট্র, এ বিশ্বাস সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। যারাই এদেশে বাস করেন—এদেশ তাদেরই। আমি এক গোঁড়া বৈষ্ণবকে চিনতাম। তিনি তার ছেলেকে গোমাংসের ঝোল দিতেন।"

**ম. ত্রিবর্ণ পতাকা অপসরণ ॥** গান্ধীজীর প্রতি সমর্থন জানিয়ে কংগ্রেস চক্রলাঞ্ছিত ত্রিবর্ণ পতাকাকে জাতীয় পতাকা হিসাবে গ্রহণ করেছিল। সংখ্যাতীত ব্যাপারে এই পতাকাকে অভিবাদন করা হ'ত। কংগ্রেসের সব অনুষ্ঠানেই এই পতাকা ওড়ান হ'ত। কংগ্রেসের জাতীয় অধিবেশনে শত শত এই পতাকা উড়ত। এ পতাকাকে বহন করে না নিয়ে গেলে কোন প্রভাতফেরীই সম্পূর্ণ হ'ত না। কংগ্রেসের যে কোন প্রকৃত বা কাল্পনিক সাফল্যকে কীর্ত্তিত করতে সমস্ত সরকারী ভবন ও স্থানে এবং ব্যক্তিগত বাসভবনে হাজারে হাজারে এই পতাকাই ওড়ান হ'ত। যদি কোন হিন্দু শিবাজীর পতাকা 'ভাগোয়া ঝাণ্ডা'য় কোন গুরুত্ব আরোপ করতেন তা হলে তাকে সাম্প্রদায়িক ভাবা হ'ত—কারণ

তিনি মুসলমান আগ্রাস থেকে হিন্দুস্থানকে বাঁচিয়ে ছিলেন। গান্ধীজীর এই পতাকা কিন্তু কোন হিন্দু মহিলাকে ধর্ষিত হওয়া থেকে রক্ষা করতে পারে নি, বিধ্বংস হওয়া থেকে রক্ষা করেনি কোন মন্দির-কে। তবুও প্রয়াত ভাই প্রেমানন্দ একদা উত্তেজিত কংগ্রেসী সমর্থকদের নিয়ে সদলে এই পতাকাকে সম্মান না জানাতে আহ্বান জানান। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপরে এই পতাকা উত্তোলিত করে তাদের স্বদেশপ্রেমই প্রকাশ করেন। বম্বের কোন মেয়র মনে করতেন যে তার ঐ উচ্চপদ বুঝি চলেই যাবে—কারণ তাঁর স্ত্রী করপোরেশন ভবনের মাথায় উড়িয়েছিলেন ঐ পতাকা। 'জাতীয় পতাকা'র প্রতি কংগ্রেসীদের সমর্থনকে এতদূর গাঢ়ই ভাবা যেতে পারে। ১৯৪৬ সালে নোয়াখালি ও ত্রিপুরায় হিন্দুদের ওপর যখন নৃশংস আক্রমণ ও পাশবিক অত্যাচার চলল এবং গান্ধীজী যখন সে অঞ্চলে ঘুরছিলেন, তখন তাঁর অস্থায়ী আবাসের ওপর উড়ছিল এই পতাকা। কিন্তু যখন কোন একজন মুসলমান এসে তার মাথার ওপর ঐ পতাকা ওড়ায় আপত্তি জানাল, গান্ধীজী সঙ্গে সঙ্গে তা নামিয়ে নিতে আদেশ দিলেন। লক্ষ লক্ষ কংগ্রেসী মানুষের জাতীয় পতাকার প্রতি সশ্রদ্ধ ঐ মানসিকতাটি মিনিটে ভূলুণ্ঠিত করা হল—কারণ তাতে একজন ধর্মোন্মাদ মুসল-মানকেও খুশী করা যাবে।—এত করেও কিন্তু হিন্দু-মুসলমান ঐক্য কখনই রূপ গ্রহণ করল না।

## তৃতীয় অধ্যায়

### গান্ধীজী ও স্বাধীনতা

৭১. বহুসংখ্যক মানুষই এই বিভ্রান্তি পোষণ করেন যে ১৯১৪-১৫ সালে গান্ধীজীর আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলন শুরু হয়েছে এবং ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট জাতির পিতার নেতৃত্বে স্বাধীনতা অর্জনের মধ্যে তা সমাপ্ত হয়েছে। স্বাধীনতা অর্জনের বদলে গান্ধীজীর নেতৃত্ব ভারতবর্ষকে করেছে টুকরো টুকরো —তার সহস্র ক্ষত থেকে রক্তক্ষরণ হচ্ছে। সর্বকালেই ভারতে একটা স্বাধীনতা আন্দোলন চলেছে। একে কখনই সমর্থন করা হয় না। ১৮১৮ সাল নাগাদ যখন মারাঠা সাম্রাজ্য ভেঙ্গে পড়ল, ব্রিটিশ শক্তি ভেবেছিল ভারতকে স্বাধীন করবার শক্তি ভারতের বেশ একটা বড় অঞ্চলে স্তিমিত হয়ে পড়েছে কিন্তু তখনই উত্তর ভারতে জেগে উঠল শিখশক্তি। আবার ১৮৪৮ সাল নাগাদ গুজরাটের কাছে যখন শিখশক্তি পরাভূত হল, তখনই প্রকৃতপক্ষে ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ দানা বেঁধে উঠতে শুরু করে। এই বিদ্রোহ এমন তীব্র গতিতে আকস্মিকভাবে সুবিস্তৃত অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের ভিত্তিমূল কেঁপে ওঠে আর তারা বহুবার ভাবতে শুরু করেন যে ভারত ত্যাগ করাই সুবিধাজনক। ব্রিটিশ জোয়ালকে ছুঁড়ে ফেলতে ভারতের জনগণ যে চেষ্টা করেছিল, তার কথা বীর সাভারকর এবং ১৮৫৭ সালের যুদ্ধ শীর্ষক অংশে বিশদভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এই সময়ের মধ্যে ব্রিটিশদের পুরো নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, আর ব্রিটিশ আধিপত্যকে বিরোধিতা করতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস। ১৮৮৫ সাল থেকেই স্বাধীনতার জন্য জাতীয় আগ্রহ দ্বিবিধ পথে নিজেকে প্রকাশ করতে চেয়েছে। প্রথমতঃ নিয়মতান্ত্রিক পথে—

দ্বিতীয়তঃ বৈপ্লবিক পথে। দ্বিতীয় পথটিই ক্রমে সশস্ত্র বিদ্রোহের রূপ নিয়েছে। ১৯০৬ সালে ক্ষুদিরাম বসুর বোমা-বিস্ফোরণেই যার সূচনা।

৭২. গান্ধীজী ভারতে এলেন ১৯১৪-১৫ সালে। প্রায় আট বছর আগে ভারতের বৃহত্তর অংশে বৈপ্লবিক আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছিল। স্বাধীনতাব আন্দোলন কখনও মরে যায় নি। ছাই থেকে ফিনিক্স বেঁচে ওঠার মত এ আন্দোলন আবার জেগে উঠেছিল। গান্ধীজীর আবির্ভাবে এবং তাঁর সত্য ও অহিংসার তত্ত্বে এ আন্দোলন চন্দ্রকলার মত হ্রাস-বৃদ্ধি ভোগ করতে থাকে। যাই হোক, গান্ধীজীর নেতৃত্বের সূচনা থেকে মৃত্যু পর্যন্ত কাল জুড়ে, লোকমান্য তিলকের পর বৈপ্লবিক আন্দোলনকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য প্রথম ধন্যবাদ পাবেন সুভাষচন্দ্র বসু এবং মহারাষ্ট্র, পাঞ্জাব ও বাঙ্গালা দেশের বিপ্লবীরা।

৭৩. নিয়মতান্ত্রিক পথে স্বাধীনতার লক্ষ্যে আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাবার দায়িত্ব বহন করেছিলেন কংগ্রেসের ভেতরের নরমপন্থীর দল। ১৮৯২ সালে ব্রিটিশ সরকার তাদের আইনসভাকে সম্প্রসারিত করতে বাধ্য হন। ১৯০৯ সালের মর্লি-মিণ্টো সংস্কার এরই পরবর্তী ধাপ। এরই ফলে জনসাধারণের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা প্রথম আইনসভার কাজে মতামতে ও ভোটে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতে পারল। এই সংস্কারের বারো বছর পরে, প্রথম বিশ্বমহাযুদ্ধের শেষে মণ্টেগু চেমস্‌ফোর্ড শাসন-সংস্কারে আংশিক প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসন প্রবর্তিত হল। নির্বাচিত প্রতিনিধির সংখ্যাও বাড়ান হ'ল, এর ফলে প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় আইনসভায় বেসরকারী সংখ্যাগরিষ্ঠতা দেওয়া হ'ল। এরপর ১৯৩৫ সালে এলো সম্পূর্ণ প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসন এবং গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রীয় স্বায়ত্বশাসন—এতে একমাত্র বৈদেশিক নীতি, সৈন্য বিভাগ ও কিছু অর্থনৈতিক বিষয় ছাড়া আর সব কিছু স্বদেশীয়দের হাতে তুলে দেওয়া হ'ল। আইনসভার ক্ষমতার দিকে গান্ধীজীর কোনো আগ্রহ ছিল না। তিনি একে বলতেন বেশ্যাবৃত্তি এবং একে বয়কটের কথা বলতেন। তবু ১৯৩৫ সাল পর্যন্ত এটুকু

শাসনতান্ত্রিক অগ্রগতি সাধিত হয়েছিল—যদিও এই অগ্রগতি পরিমানে সামান্যই। ১৯৩৫-এর আইনটাই ছিল ত্রুটিভরা। কারণ প্রধানতঃ এতে ব্রিটিশ কায়েমী স্বার্থরক্ষার জন্য সংখ্যাতীত বিরক্তিকর রক্ষাকবচের অনুমোদন করা হয়েছিল এবং সাম্প্রদায়িকতার ওপর বড়ই জোর দিয়েছিল।

৭৪. এই আইনে আপত্তির আর এক কারণ এই যে এতে গভর্ণর ও গভর্ণর জেনারেলের ভোট দেবার ক্ষমতা অনুমোদিত ছিল। তবুও একথা যুক্তিযুক্ত ভাবেই নিশ্চিত বলা যায় যে গান্ধীজীর নেতৃত্বে এই আইন বয়কট না করা হলে, ভারতের এক তৃতীয়াংশ ভূভাগ হারিয়ে আজ আমরা যে স্বাধীনতা পেয়েছি—তার তুল্য ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ব-শাসন অনেক আগেই ভোগ করতাম।

৭৫. আমি আগেই কংগ্রেস থেকে স্বতন্ত্র বৈপ্লবিকদলের অস্তিত্বের কথা বলেছি! এদের সক্রিয় সমর্থকদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন কংগ্রেসী। এঁরা কখনই ব্রিটিশ শাসনের সঙ্গে আপোষ করেন নি। প্রথম বিশ্বমহাযুদ্ধের কালে, ১৯১৪-১৯১৯ সালের মধ্যে কংগ্রেসের মধ্যে বামপ্রবণতা দেখা যায় এবং কংগ্রেসের বাইরে ভারতের বৈপ্লবিক আন্দোলনের ধারার সমান্তরালে বইতে থাকে কংগ্রেসের ভেতরের এই বামধারা। অক্ষশক্তির সাহায্য নিয়ে ভারত থেকে ব্রিটিশ শক্তিকে উপড়ে ফেলতে ইউরোপ ও আমেরিকা থেকে গদর-পার্টি উৎসাহব্যঞ্জক কাজ চালাচ্ছিলেন। 'কোমাগাটা মারু'র ঘটনা সকলেই জানেন। আর ভারতবর্ষের মানুষ অসন্তোষে ফুটছে জেনেই জার্মান কমান্ডার মাদ্রাজ উপকূলের 'এমডেন' ঘটনাটি ঘটিয়ে ছিলেন—একথা বললেই বিষয়টা পরিষ্কার হয় না। কিন্তু ১৯২০ সাল ও তার পরবর্তী বৎসর গুলিতে সশস্ত্র এই বিপ্লবাত্মক কাজকে অনুৎসাহিত করতে থাকলেন এবং হীন বলে প্রতিপন্ন করলেন—অথচ ক'বছর আগে পর্যন্ত তিনি ব্রিটিশদের সৈন্য সংগ্রহকে উৎসাহ দিয়েছেন। রাউলাট রিপোর্ট ভারতে ব্রিটিশ বিপ্লবীদের শক্তিসামর্থের খানিকটা পরিচয় তুলে ধরেছে। ১৯০৬ থেকে ১৯১৮ পর্যন্ত বিপ্লবী জাতীয়তাবাদীরা

একের পর এক ব্রিটিশদের এবং তাদের তাঁবেদারদের হত্যা করে চলেছিল আর ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ ভারতে আদৌ অস্তিত্ব বজায় রাখা যাবে কি না, এ বিষয়েই দ্বিধান্বিত হয়ে পড়েছিল। এই সময়ে ভারতীয় রাষ্ট্রীয়-সচিব হিসাবে মিঃ মন্টেগু ভারতে এলেন এবং দায়িত্ব অর্পনের প্রতিশ্রুতি দিলেন। এর দ্বারা তিনি এই বিপ্লবী কর্মধারাকে সামান্য সংযত করতে পেরেছিলেন। কিন্তু ১৯১৯ সালের ভারত সরকার বিধির ওপর কালো ছায়া ফেলে ঢেকে দিল জালিয়ানওয়ালা-বাগের বেদনাদায়ক ঘটনা। রাউলাট বিলের প্রতিবাদ করার অপরাধে জেনারেল ডায়ার হাজার হাজার ভারতীয়কে এক প্রকাশ্য সভায় গুলি চালিয়ে হত্যা করলেন। রাউলাট বিলের প্রতিবাদকারীদের ওপর এমন হৃদয়হীন ও নির্বিবেক প্রতিশোধ নেওয়ার ফলে মাইকেল ও-ডায়ার কুখ্যাত হলেন। কুড়িবছর পরে তাকে এ পাপের প্রতিফল পেতে হয়। উধম সিং তাকে লণ্ডনে গুলি করে হত্যা করে। মহারাষ্ট্রের চাফেকার ভাইয়েরা, শ্যামজী কৃষ্ণভর্মা—বিপ্লবীদের মেরুদণ্ড, লালা হরদয়াল, বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, রাসবিহারী বসু, বাবু অরবিন্দ ঘোষ, ক্ষুদিরাম বসু, উল্লাসকর দত্ত, মদনলাল ধিংড়া, কান্‌হারে, ভগৎ সিং, রাজগুরু, সুখদেও, চন্দ্রশেখর আজাদ ইত্যাদি ছিলেন বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে ভারতীয় যৌবনের জীবন্ত প্রতিবাদ এদের মধ্যে অনেকেই গান্ধীজীর নাম শোনার আগে থেকে এমনকি তিনি জাতীয় কংগ্রেসের নিয়ম-তান্ত্রিক আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করলেও স্বাধীনতার পতাকা ঊর্দ্ধে তুলে রেখেছেন।

৭৬. আমি আগেই উল্লেখ করেছি যে বিপ্লবাত্মক আন্দোলন শুরু হয় বাংলাদেশে এবং মহারাষ্ট্রে, পরে তা পাঞ্জাবে পৌঁছেছিল। এ সমস্ত কাজের সঙ্গে যে তরুণেরা যুক্ত ছিলেন, তারা সমাজের নিম্ন স্তর থেকে আসেন নি। এঁরা সকলেই ছিলেন শিক্ষিত ও সংস্কৃতিসম্পন্ন মানুষ। এঁারা এসেছিলেন অভিজাত পরিবার থেকে। ব্যক্তিজীবনে সকলেই ছিলেন উচ্চ সামাজিক মর্যাদার অধিকারী। স্বদেশমায়ের স্বাধীনতার যজ্ঞবেদীতে তারা সুখ-স্বাচ্ছন্দের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন।

ভারতের স্বাধীনতার মন্দির গাঁথা হয়েছিল এদেরই রক্তে মাখা মশলায়। লোকমান্য তিলক এর ভিত্তি স্থাপন করে গিয়েছিলেন—গান্ধীজী তারও উপর মন্দির গড়বার সুযোগ গ্রহণ করেছিলেন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ১৯০৯ থেকে ১৯৩৫ সালে যেসব শাসনতান্ত্রিক অগ্রগতি ঘটেছিল, তা অন্তরাল থেকে এই বিপ্লবীশক্তির কার্যকারিতার জন্যই সম্ভবপর হয়েছিল।

৭৭ কংগ্রেসেব আপোষপন্থীরা বিপ্লবাত্মক হিংসাব পথের নিন্দা করেন। গান্ধীজী দিনের পর দিন, প্রত্যেক মঞ্চ থেকে এবং সংবাদপত্রে প্রকাশ্যে এর নিন্দা করেন। জাতীয় মুক্তির কাজে যে বীরপুরুষেরা কাজ করে চলেছেন, দেশের সুবিপুল জনসংখ্যা যে তাদের অন্তরের উদ্বেলিত শ্রদ্ধা তাদের পায়েই বিসর্জন দেন—সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই। স্বদেশে বিজেতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালানই বিপ্লবী-তত্ত্ব। এ তত্ত্বে বিজেতার সঙ্গে কোন আনুগত্যের সম্পর্ক নেই। আর তার এই যুদ্ধ ঘোষণার মধ্যে একটা সতর্কবাণী সর্বদাই ঘোষিত থাকে যে, যে কোন মুহূর্তেই বিদেশী শাসন বিধ্বস্ত করে দেওয়া যেতে পারে। আর বিদেশী প্রভুর প্রতি প্রজার আনুগত্যের যে প্রশ্ন তুলে বৈপ্লবিক আন্দোলনের বিরুদ্ধে রায় দেওয়া হয়—তা একেবারেই অগ্রাহ্য ব্যাপার।

আর যতই মহাত্মা স্বদেশমুক্তির সংগ্রামে বিপ্লবাত্মক কাজের বিরোধিতা করতে থাকলেন ততই বিপ্লবাত্মক আন্দোলন জনপ্রিয় হ'ল। এ-বিষয়টা খুব স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে ১৯৩১ সালের কংগ্রেসের করাচি অধিবেশনে। ১৯২৯ সালে ভগৎ সিং আইন-সভায় বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়েছিলেন। তার সাহস, তার আত্মত্যাগের মানসিকতাকে প্রশংসা করে কংগ্রেসের প্রকাশ্য অধিবেশনে এক প্রস্তাব গৃহীত হয়—স্বয়ং গান্ধীজীর তীব্র বিরোধিতার সামনে। গান্ধীজী এই পরাজয়কে ভুললেন না। আর তাই কয়েক মাস পরেই যখন বম্বের ভারপ্রাপ্ত গভর্ণর মিঃ হটসেনকে গোঘাটে গুলি করে হত্যা করা হল তখন এক সর্ব-ভারতীয় কংগ্রেস কমিটির মিটিং-এ এই পরাজয়ের শোধ তুললেন।

বললেন, করাচি অধিবেশনে ভগৎ সিং-এর কাজকে সমর্থন করার ফলেই গোঘাটে হটসনের ওপর এই আক্রমণের ঘটনা ঘটেছে। এই বিস্ময়কর মন্তব্যকে যুক্তি দিয়ে প্রতিষ্ঠা করবার দাবী জানিয়েছিলেন সুভাষচন্দ্র বসু। আর সঙ্গে সঙ্গেই তিনি পড়েছিলেন গান্ধীজীর বিষ-নজরে। সংক্ষেপে বললে, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে বিপ্লবী তারুণ্যের দাবী এতটুকুও কম নয়—আর যারা বলতে চান ভারতের স্বাধীনতা এনেছেন গান্ধীজী, তারা শুধু অকৃতজ্ঞই নন্—তারা মিথ্যা ইতিহাস লিখতে চেষ্টা করছেন। ১৮৮৫ সাল থেকে ভারতবর্ষের মুক্তি সংগ্রামের সত্য ইতিহাস কখনই লেখা হবে না—যতদিন ভারত শাসন করবে গান্ধী-বাদী কংগ্রেসীর দল। স্মরণীয় যুবশক্তির ত্যাগের কথা নেপথ্যেই রেখে দেওয়া হবে। অথচ এই তরুণেরা স্বাধীনতার সংগ্রামে যে এক গৌরবান্বিত ও কৃতিত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে গেছেন, সে বিষয়ে সন্দেহ কি ?

৭৮. যারা স্বাধীনতা সংগ্রামে শক্তি প্রয়োগের কথা বলতেন, শুধুমাত্র তাদেরই যে গান্ধীজী বিরোধিতা করতেন এমন নয়। এমন কি যারা গান্ধীজীর রাজনৈতিক মতকে যুক্তিতর্ক দিয়েও আপত্তি করতেন তারাই ছিলেন তার বিরোধিতার পাত্র। স্বাধীনতা অর্জনের জন্য তিনি যে নীতি বেঁধে দিয়েছিলেন সেগুলি যারাই স্বীকার করতে পারতেন না, তারাই হতেন তাঁর আক্রমণের লক্ষ্য। তিনি যে সমস্ত মানুষকে কোনক্রমেই সমর্থন করতেন না, তাদের মধ্য থেকে এক জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত হিসাবে উল্লেখ করা যায় সুভাষচন্দ্রের নাম। আমি যতদূর জানি সুভাষচন্দ্রকে ছ'বছরের জন্য দ্বীপান্তরিত করার বিরুদ্ধে গান্ধীজী কোন প্রতিবাদ করেন নি এবং তিনি ব্যক্তিগত ভাবে হিংসার প্রতি তার সহানুভূতি নেই বলার পরই তাকে কংগ্রেস সভাপতির পদ ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। যাই হোক, কার্যক্ষেত্রে সুভাষ তার সভাপতিত্বের কার্যকালে গান্ধীজীর পায়ে পা মিলিয়ে চলেন নি। তবুও সুভাষচন্দ্র এত জনপ্রিয় ছিলেন যে গান্ধীজী ডঃ পট্টভিয়ার পক্ষে তার সমর্থন ঘোষণা করা সত্ত্বেও সুভাষচন্দ্র বিপুল

ভোটাধিক্যে দ্বিতীয়বার কংগ্রেস সভাপতি পদে নির্বাচিত হন। এমনকি পট্টভিয়ার নিজের প্রদেশ অন্ধ্রেও সুভাষ পেলেন বেশি ভোট। এই পরাজয় গান্ধীজীর সহিষ্ণুতাকে ছাড়িয়ে গেল। তিনি ভেঙ্গে পড়লেন। তিনি মহাত্মাচিত ভঙ্গিতেই তার দ্বেষ প্রকাশ করলেন। পূর্ণ বিষে জর্জর ভাবে জানালেন, সুভাষচন্দ্রের এই জয়ে পট্টভিয়ার পরাজয় নয়—পরাজয় তাঁর। এ ঘোষণার পরেও সুভাষের ওপর তার রাগ গেল না। শুধু বিরোধিতা করবার জন্যই তিনি ত্রিপুরী কংগ্রেস অধিবেশনে উপস্থিত হলেন না। রাজকোটে তিনি সম্পূর্ণ দুরভিসন্ধিমূলক এক উপবাস শুরু করে প্রতিদ্বন্দ্বী দৃশ্যের অবতারণা করলেন। কংগ্রেসের গদি থেকে সুভাষচন্দ্রকে অপসারণ না করা পর্যন্ত তাঁর বিষের জ্বালা সম্পূর্ণ উপসম হ'ল না।

৭৯. কংগ্রেসের রাজপদে সুভাষচন্দ্রের পুনর্নির্বাচন এবং পরিণামে সেই পদ থেকে তার বহিষ্কার—এমন একটা ঘটনা যার থেকে খুব সহজেই বোঝা যায় যে মহাত্মা খলের মত কেমন করে কংগ্রেসকে নিয়ন্ত্রণ করতেন এবং নিজের খুশির কাছে নত করতেন। ১৯৩৪ সাল থেকে তিনি নির্লিপ্ততার বিরাট আড়ম্বর করে বারবার বলতেন, 'আমি কংগ্রেস দলের চার আনার সভ্যও নই, কংগ্রেসের ব্যাপারে আমার করারও কিছু নেই।' কিন্তু যখন সুভাষচন্দ্র দ্বিতীয়বার নির্বাচিত হলেন, তখন গান্ধীজী সব রকম ভারসাম্য হারিয়ে ফেললেন, এবং তিনি যে একেবারে শুরু থেকেই ডঃ পট্টভিয়ার সমর্থনে নির্বাচনে নাক গলিয়ে ফেলেছেন তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ রাখলেন। ক্ষমতার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় যে তাঁর অতি সূক্ষ্ম এবং সর্বগ্রাসী আগ্রহ আছে, কংগ্রেসের চার আনার সভ্য নন্ বললেও তিনি যে কংগ্রেসের ভেতরের সামান্যতম ঘটনা নিয়েও বিবাদ করতে পিছপা নন্ এবং প্রতি পর্বেই তিনি বিধান হাঁকবার অধিকার চান তার প্রমাণ এই ঘটনায়।

৮০. ১৯৪২ সালের ৮ই আগষ্ট গান্ধীজীর নেতৃত্বে কংগ্রেস যখন 'ভারত ছাড়' আন্দোলন শুরু করলেন, তখন ভারত-সরকার অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে কংগ্রেসের বিশিষ্ট নেতাদের গ্রেপ্তার করে

নিলেন—তারা আন্দোলন শুরু করবারও অবকাশ পেলেন না। এতদূর পর্যন্ত আন্দোলন ছিল অহিংস এবং তা সমূলেই বিনষ্ট হ'ল। কিন্তু কংগ্রেসেরই এক অংশ আত্মগোপন করল। এরা গান্ধীকৌশল অনুসরণে অতি আগ্রহী ছিলেন না—জেলে গিয়ে বসে থাকবার মানসিকতাও তাদের ছিল না। এদের ইচ্ছেটা ছিল ঠিক উল্টো। এরা যত বেশিদিন সম্ভব জেলের বাইরে থাকা আর সেই সময়ে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে, বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে, লুঠ এবং সহিংস নানা কাজ করে প্রয়োজনে খুনও করে সরকারকে যতখানি সম্ভব ক্ষতিগ্রস্ত করার ইচ্ছা পোষণ করতেন। গান্ধীজী জনসাধারণকে অনুপ্রাণিত করতে ঐ যে 'করেঙ্গে য়্যা মরেঙ্গে' মন্ত্র দিয়েছিলেন, এরা তার ব্যাখ্যা করলেন যে, গান্ধীজী অন্তর্ঘাতমূলক সব রকম কাজ করবার অনুমতি দিয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে তারা সরকারের যুদ্ধোদ্যম স্তব্ধ করে দেওয়ার মত যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলেন—পুলিশথানা পুড়িয়ে দিয়েছিলেন, ইচ্ছাকৃতভাবে ডাক যোগাযোগ ছিন্ন করা হয়েছিল। উত্তর বিহার এবং অন্যান্য স্থান মিলিয়ে প্রায় ৯০০ রেলস্টেশন হয় পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল, নয় ধ্বংস করা হয়েহিল। শাসনযন্ত্র কিছুকালের জন্য একেবারে নিশ্চল হয়ে গেছিল।

৮১. এসব কাজ কংগ্রেসের অহিংসা ও সত্যাগ্রহ কৌশলের সম্পূর্ণ বিপরীত মার্গের ছিল। এ কাজগুলো গান্ধীজী সমর্থনও করতে পারলেন না, বিরোধিতা করতেও পারলেন না। যদি তিনি সমর্থন করেন তবে তার অহিংসার নীতি ধ্বসে পড়ে আর যদি প্রকাশ্যে বিরোধিতা করেন তবে জনপ্রিয়তা হারাবেন। কারণ দেশ থেকে বৃটিশের উৎখাত যদি হয় তবে তা সহিংস বা অহিংস কোন পথে হ'ল তা নিয়ে জনগণ মাথা ঘামায় না। প্রকৃতপক্ষে 'ভারত ছাড়' আন্দোলন কংগ্রেস সমর্থকদের হিংসাত্মক কাজের জন্যই খ্যাত—অন্য কোন কারণে নয়। 'ভারত ছাড়' আন্দোলন শুরু হবার কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই অহিংসনীতির মৃত্যু হয়, আর তারপর থেকে ঐ আন্দোলনে যে হিংসাত্মক ক্রিয়াকর্ম চলে তা গান্ধীজীর প্রীতিচ্যুত হয়। ১৯৪২ সালের ৮ই

আগষ্টের পর কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই কংগ্রেস দলের ও তাদের সমর্থক-দের কাজকর্মের মধ্যে গান্ধীনীতির নামগন্ধও খুঁজে পাওয়া যায় না। এই কর্মকাণ্ডের সমর্থকদের দীক্ষায় বা কর্মে অহিংসার ছিটেফোঁটাও দেখা যায় না—গান্ধীজীর কথার অনুসরণে বলা যায় যে তারা কর্মসাধন বা শরীর পাতনের জন্য প্রস্তুত হয়েছিল। শেষপর্যন্ত ১৯৪৩ সালে লর্ড লিনলিথগো যখন গান্ধীজীর সঙ্গে তার পত্রালাপের সময় গান্ধীজীর কাছে 'ভারত ছাড়' আন্দোলনের সমর্থকদের দ্বারা কৃত হিংসাত্মক কাজের সুস্পষ্ট সমর্থন বা বিরোধিতা দাবী করে বসলেন, তখন গান্ধীজী বাধ্য হয়ে হিংসাত্মক কাজের নিন্দা করলেন। যুদ্ধ-প্রয়াসের যে সব অস্বস্তি, ধ্বংস, অসুবিধা বা ক্ষতি সাধিত হয়েছে তা সবই কংগ্রেস সমর্থকদের কাজ—মহাত্মার তথাকথিত অহিংসাবাদীদের নয়। তাঁর অহিংসা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছিল—যেটুকু সাফল্য অর্জিত হয়েছিল তার সবটাই হিংসা দ্বারা—অথচ গান্ধীজীকে জেল থেকে সেটুকুকেও নিন্দা করতে হ'ল। যখন ১৯৪২ সালের ৮ আগস্টের স্বল্প কদিনের মধ্যেই গান্ধীজীর নিজের রণকৌশল একেবারেই ব্যর্থ হল তখনও গান্ধীজী ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের বৈপ্লবিক অংশকে এমনি করে ধিকৃত করলেন।

৮২. ১৯৪১ সালের জানুয়ারীর প্রথম দিকে সুভাষচন্দ্র বসু আশ্চর্যজনকভাবে ভারতবর্ষ থেকে পালিয়ে যান এবং এই সময়ে আফগানিস্থানের ভেতর দিয়ে, বার্লিন হয়ে জাপানে পৌঁছে যান। যে পথে ১৯৪১-এর জানুয়ারীতে সুভাষচন্দ্র গিয়েছিলেন, ভারতীয় সীমান্ত প্রদেশ থেকে কাবুল এবং তারপর বার্লিন পর্যন্ত যেতে যে যন্ত্রণা ও কষ্ট ভোগ করতে হয়েছিল, তার বিশদ বর্ণনা মিঃ উত্তমচাঁদের "বোস যখন জিয়াউদ্দিন" গ্রন্থে আছে। যে সাহস, যে একনিষ্ঠার সঙ্গে সব বাধা বিপত্তি এবং বিঘ্নকে অতিক্রম করে বোস অবশেষে বার্লিনে পৌঁছালেন. তা পড়তে পড়তে রোমাঞ্চ ও শিহরণ অনুভব করতে হয়। ১৯৪২ সালে ভারতে যখন ক্রিপস্-মিশন পৌঁছেছে ততদিনে সুভাষচন্দ্র জাপানে পৌঁছে ভারত অভিযানের প্রস্তুতিপর্ব

সমাধা করেছেন। জার্মানী ত্যাগের আগেই হিটলার তাঁকে 'হিজ্ এক্সেলেন্সি' বলে অভিহিত করেন এবং জাপানে পোঁছে তিনি দেখলেন, জাপানীরা ব্রিটিশদের পরাজিত করতে তাঁকে সাহায্য দিতে প্রস্তুত হয়ে আছে। আমেরিকার পার্ল হারবার আক্রমণ করে ইতঃমধ্যেই জাপান অক্ষশক্তির পক্ষে যুদ্ধে যোগদান করে ফেলেছে। রাশিয়ায় যুদ্ধ ঘোষণা করেছে জার্মানী। উল্টো দিকে ব্রিটিশ—ফরাসী, ইটালী, জার্মান ও জাপানে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। জাপানে, মালয়ের যুক্তরাষ্ট্রে, বর্মায় এবং প্রাচ্যের দেশগুলিতে বসবাসকারী ভারতীয়রা সুভাষচন্দ্রকে আন্তরিক সহযোগিতা করলেন।

৮৩. জাপানীরা এই অংশেই তাদের যুদ্ধ প্রচেষ্টা তীব্র করেছিল এবং বর্মা, ডাচ অধিকৃত পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, মালয়ের যুক্তরাষ্ট্র এমন কি আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ পর্যন্ত সমগ্র সুদূর প্রাচ্য তখন জাপান অধিকার করে নিয়েছে। এর ফলে সুভাষচন্দ্র ভারতবর্ষের সীমার অন্তর্গত অংশে এক অস্থায়ী প্রজাতন্ত্রী সরকার গঠন করবার সুযোগ পেলেন। জাপানীদের সহযোগিতায় তিনি ১৯৪৪ সালের মধ্যে ভারত অভিযানের জন্য প্রস্তুত হয়ে পড়লেন। পণ্ডিত নেহেরু ঘোষণা করলেন, জাপানীদের সাহায্যপুষ্ট সুভাষ ভারত অভিযান করলে তিনি তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করবেন। ১৯৪৪ সালের সূচনায় জাপানীরা এবং সুভাষচন্দ্র সংগঠিত আজাদ-হিন্দ-ফৌজ একেবারে দরজার গোড়ায় এসে গেছিল—তারা ইতঃমধ্যে মণিপুর এবং আসাম সীমান্তের কোন কোন অঞ্চলে ঢুকে গেছিল। সুদূর প্রাচ্যের বসবাসকারী ভারতীয়দের মধ্য থেকে স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহ করে আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন করা হয়েছিল। এতে যোগ দিয়েছিল জাপানীদের হাতে বন্দী ভারতীয় সৈন্যেরা—তাও স্বেচ্ছাক্রমে। ভাগ্যদোষে সুভাষচন্দ্রের এই প্রচেষ্টা যে ব্যর্থ হয় তার দায় সুভাষের নয়—ব্যর্থতার কারণটা আরও গভীর। তাঁর সৈন্যদল আধুনিক সমরসজ্জায় সজ্জিত ছিল না। আজাদ-হিন্দ-ফৌজের কোন বিমান বহর ছিল না আর তাদের সরবরাহ সূত্রগুলি ছিল দুর্বল। তার ফৌজের বহু

মানুষ অনাহারে মারা যান—অনেকে মারা যান অসুখে—ভাল চিকিৎসক দল ছিল না। কিন্তু তবু সুভাষ তাদের মনে যে উন্মাদনা সঞ্চার করেছিলেন তা অভূতপূর্ব। তারা তাকে অন্তরের ভালবাসা দিয়ে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু বলে আহ্বান করতেন। আর তারা তাঁরই অনুপ্রেরণায় 'জয় হিন্দ' ধ্বনি গ্রহণ করেছিলেন।

৮৪. সুভাষচন্দ্রের ভারত অভিযানের বিরোধিতা করেন গান্ধীজী। নেহেরু তাঁর বিরোধিতা করেন, তিনি বসুর জাপানী সাহায্য গ্রহণকে সমর্থন করতে পারেন নি। কিন্তু বসু ও ভারতীয় অন্য নেতাদের মধ্যে যে পার্থক্যই থাক, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংসের জন্য সুভাষের একক প্রচেষ্টার জন্যই তিনি আপামর জনসাধারণের সবচেয়ে বেশি ভালবাসা পেয়েছিলেন। সুভাষচন্দ্র যদি বেঁচে থাকতেন এবং ১৯৪৫ সালে জাপানীদের পরাজয়ের পর ভারতে প্রবেশ করতেন তবে সমস্ত ভারতবাসী এক সত্ত্বায় পরিণত হয়ে তার পিছনে দাঁড়াত এবং তাকে আন্তরিকতম অভিনন্দন জানাত। কিন্তু গান্ধীজী আবারও ভাগ্যবান বলে প্রমাণিত হলেন। ১৯২০ সালে লোকমান্য তিলক মারা গেলেন—গান্ধীজী হলেন অবিসংবাদী নেতা সুভাষ-চন্দ্রের সাফল্য তাঁর পক্ষে এক মারাত্মক পরাজয় হ'ত, কিন্তু ভাগ্য আবারও তাঁর পক্ষে দাঁড়াল—সুভাষ মারা গেলেন বিদেশে। এর ফলে কংগ্রেস দলের পক্ষে সুভাষের প্রশংসা করা বা তার প্রতি ভালবাসা দেখান এমন কি আজাদ-হিন্দ-ফৌজ ও তার কর্মকর্ত্তাদের ১৯৪৬ সালের বিখ্যাত রাষ্ট্রীয় মামলায় তাদের সমর্থন করাও সহজ হয়ে গেল। এমন কি সুদূর প্রাচ্যে সুভাষচন্দ্র যে ধ্বনি সৃষ্টি করেছিলেন, সেই 'জয় হিন্দ'-ও তারা লুফে নিলেন। প্রকৃতপক্ষে সুভাষচন্দ্র ও আজাদ-হিন্দ-ফৌজ—এই দুটি বিষয়কে তারা রাজনৈতিক বাণিজ্যের মূলধন করলেন। ১৯৪৫-৪৬ সালের নির্বাচনের বিপুল সাফল্যের পিছনে ঐ দুটি নামের স্মৃতির প্রতি তাদের মেকী ভালবাসা ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন খুব কাজে লেগেছিল। অধিকন্তু তারা প্রচার করে-ছিলেন যে তারা পাকিস্থানের বিরোধী এবং যে কোন মূল্যে তা রোধ

করবেন। এই দুটি আশ্বাসের মধ্যে তারা আজাদ-হিন্দ-ফৌজের প্রতি কিঞ্চিৎ সৌজন্য দেখিয়েছে কিন্তু অন্যদিকে তাদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে পাকিস্থানকে মেনে নিয়েছে।

৮৫. এই সময় জুড়ে মুসলীম লীগ রাজদ্রোহমূলক কার্যকলাপ চালিয়ে গেল, ভাবতের শান্তি এবং স্থিতাবস্থা বিপর্যস্ত করে চলল, চালিযে গেল হিন্দুদের ওপর রক্তপিপাসু প্রচার। লর্ড ওয়েভেল, লর্ড মাউন্টব্যাটন সম্পূর্ণ নির্লিপ্তভাবে এগুলি দেখলেন। আর কংগ্রেস ত' সর্বশক্তিতে আপোষনীতি অনুসরণ করে চলল। আর তাই এই সর্বাত্মক ও বেপরোয়া হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে না করল কোন মন্তব্য, না করল থামাবার কোন চেষ্টা। আর গান্ধীজী ত' তাঁর জনসেবামূলক কাজের ধরনের সঙ্গে যাই না মিলত—তাকেই চেপে যেতেন। এই কারণেই যখন বারবার বলা হয় যে গান্ধীজীর জন্যই আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি, তখন আমি অবাক হই। আমার মত এই যে, অবিরাম মুসলীম লীগের কোটনা কুটে চলা স্বাধীনতা অর্জনের পথ নয়। এর দ্বারা এক ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইনের মত দানবই সৃষ্টি করা যায় যে তার নিজের স্রষ্টাকেই ধ্বংস করে। এমনি করেই অবিশ্বাসী, পীড়া সৃষ্টি-কারী, শত্রুভাবাপন্ন এবং আক্রমণমুখী মুসলীম লীগ গ্রাস করল ভারতের এক তৃতীয়াংশ, ভারতেরই ভূভাগে স্থায়ী বসতি নিল এক ভিন্ন রাষ্ট্র। আমি মনে করি, স্বরাজ বা স্বাধীনতা অর্জনে মহাত্মাজীর অবদান উপেক্ষনীয়। তবে তাঁকে আমি নিষ্ঠাবান দেশপ্রেমিক হিসাবে স্থান দি। তাঁর শিক্ষায় অবশ্য ফল ফলেছে উল্টো, তার নেতৃত্বে জাতি হয়েছে হতবুদ্ধি। আমার মতে সুভাষচন্দ্র বসুই আধুনিক ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ নায়ক এবং শহীদ। তিনিই জনগণের বৈপ্লবিক মানসিকতাকে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন, উদ্দীপিত করেছিলেন। স্বদেশের মুক্তির জন্য তিনিই সম্মানজনক পথ নির্দ্দেশ করেছেন, প্রয়োজনে শক্তি প্রয়োগেও অসম্মত ছিলেন না তিনি। গান্ধীজী এবং তার অনুগত স্বার্থান্বেষীর দল তাকে ধ্বংস করতে চেয়েছিল। ভারতীয় স্বাধীনতার স্থপতি বলে গান্ধীজীকে হাজির করা এমনি করেই সম্পূর্ণ ভ্রান্তিমূলক।

৮৬. ব্রিটিশদের ভারত ত্যাগের কারণ ত্রিবিধ। এর ভেতরে গান্ধীরীতির কোন স্থান নেই। উল্লেখিত শক্তিত্রয় হল ঃ—

(ক) ১৮৫৭ থেকে ১৯৩২ পর্যন্ত ভারতীয় বিপ্লবীদের কাজ অর্থাৎ এলাহাবাদে চন্দ্রশেখর আজাদের মৃত্যু পর্যন্ত ; আর তারপর, ১৯৪২ সালে দেশব্যাপী বিপ্লবী ধরনের আন্দোলন যা আদৌ গান্ধী-বাদী নয় এবং সুভাষচন্দ্রের সশস্ত্র বিদ্রোহ ঘটানো যার ফলে ভারতীয় সৈন্যদলে যে বিপ্লবাত্মক মনোভাব ছড়িয়ে পড়ল—এগুলিই সেই সক্রিয় শক্তি যা ভারতে ব্রিটিশ শাসনের ভিত্তি টলিয়ে দেয়। আর দেশকে স্বাধীন করতে এই সব প্রত্যেক সক্রিয় পন্থাকেই গান্ধীজী বিরোধিতা করেছেন।

(খ) সেই সঙ্গে তাদেরও কিছু কৃতিত্বের ভাগ দিতে হবে যারা স্বদেশবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠে সম্পূর্ণ গঠনতান্ত্রিক পথে আইন-সভার ভিতরে দাঁড়িয়ে ব্রিটিশদের বিরোধিতা করে ভারতীয় রাজ-নীতির ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য প্রগতি বিধান করেছিলেন। এই মানুষদের দৃষ্টিভঙ্গিটা ছিল এই যে, আমরা যা পেয়েছি তার পূর্ণ সুযোগের সদ্ব্যবহার করে আরও বেশি পাওয়ার জন্য চেষ্টা করা। এই মতের লোকেদের প্রতিনিধিত্ব করতেন প্রয়াত লোকমান্য তিলক, মিঃ এন. সি. কেলকার, মিঃ সি. আর. দাস, মিঃ বিথলভাই প্যাটেল—সম্মানীয় সর্দার প্যাটেলের ভাই ; পণ্ডিত মলভীয়া ভাই, প্রেমানন্দ এবং গত দশ বছর ধরে হিন্দুমহাসভার বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ। অথচ মজা এই যে এই মতবাদের তীক্ষ্মধীসম্পন্ন ও ত্যাগী মানুষদের গান্ধী স্বয়ং এবং তার চেলাচামুণ্ডারা উপহাস করতেন। তারা ওদের বলতেন ক্ষমতা-লোভী—অথচ তারা নিজেরাই সর্বদা ক্ষমতা দখলের নেশায় মেতে থাকতেন।

(গ) ভারত থেকে শাসন ক্ষমতা গুটিয়ে নিতে বাধ্য হওয়ার পিছনে আরও একটি কারণ আছে। সেটিও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। যুদ্ধের ফলে বৃটেনের বিভীষিকাজনক অর্থনৈতিক অবস্থা এবং অর্থগত দেউলিয়াপনায় বৃটেন ডুবছিল। এরই ফলে তারা ছুঁড়ে

ফেলে দিল চার্চিলকে তার বদলে আবির্ভাব ঘটল শ্রমিক দলের সরকারের। এ ঘটনার গুরুত্বও কম নয়।

৮৭. এতদিন পর্যন্ত, যেহেতু গান্ধী-নীতি ক্রমেই অবনতির দিকে যাচ্ছিল, তাই হতাশাই ছিল তার একমাত্র পরিণতি। তিনি আজীবন সাহসী বিপ্লবী এবং চিন্তাশীল ও তেজস্বী ব্যক্তি ও দলের বিরোধিতাই করে এসেছেন আর ফলাও করে বলেছেন চরখা, অহিংসা ও সত্যের কথা। গান্ধীজীর চৌত্রিশ বছরের আপ্রাণ চেষ্টার ফলে চরখা যন্ত্রচালিত তাঁতশিল্প হিসাবে শতকরা ২০০ হারে বেড়েছে, জাতির শতকরা একভাগ মানুষের কাপড়ও যোগাতে পারেনি এ আন্দোলন। আর অহিংসা! চল্লিশ কোটি লোক আদর্শের ঐ সু-উচ্চ ভূমিতে আরোহণ করবে এ প্রত্যাশাই বাতুলতা। ১৯৪২ সালে এ আদর্শ খুব স্পষ্টভাবেই ভেঙ্গে পড়ে। আর সত্য সম্পর্কে এইটুকু বলতে পারি যে সাধারণ কংগ্রেসীদের সততা কোন ক্রমেই একজন সামান্য পথচারীর চেয়ে উঁচু পর্য্যায়ের নয়। আর বেশির ভাগ সময় সেটা আসলে অসত্য, একটা ভান করা সত্যের হালকা ওড়নায় তার মুখ ঢেকে রাখা।

## চতুর্থ অধ্যায়

### একটি আদর্শের ব্যর্থতা

৮৮. সত্যিকথা বলতে গেলে হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের যে অবধারণা নিয়ে গান্ধীজী ভারতীয় রাজনীতিতে এসেছিলেন, পাকিস্থান প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই তার সমাপ্তি ঘটেছে। কারণ মুসলীমলীগ গোটা ভারতকে এক জাতি হিসাবে স্বীকার করতে চায়নি এবং তারা বারংবার একগুঁয়ের মত বলেছে তারা ভারতীয় নয়। যে হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের কথা গান্ধীজী বারংবার তুলে ধরেছেন, তার চরিত্র সম্ভবত এমন নয়। তিনি চেয়েছিলেন হিন্দু-মুসলমান দুই সাথীর মত স্বাধীনতার সংগ্রামে পাশাপাশি লড়বে। এটাই ছিল তাঁর হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের ধারণা। হিন্দুরা গান্ধীজীর উপদেশ মেনে নিয়েছিলেন কিন্তু মুসলমানেরা প্রতি ব্যাপারে একে অসম্মান করেছেন, এবং এমন ব্যবহার করেছেন, যা হিন্দুদের পক্ষে অপমানজনক। আর অবশেষে এর থেকেই ভারতবর্ষের অঙ্গচ্ছেদ এবং দেশবিভাজন হয়েছে।

৮৯. গান্ধীজী এবং মিঃ জিন্নার পারস্পরিক ব্যক্তিগত সম্পর্কও উল্লেখযোগ্য বিষয়। মিঃ জিন্না প্রথমে গোঁড়া জাতীয়তাবাদী ছিলেন। কিন্তু ১৯২০ সাল ও তার পরবর্ত্তী কালে তিনি যখন প্রথম সারির সাম্প্রদায়িক হলেন, তখন থেকে তিনি একটা জিনিস স্পষ্টভাবেই বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে তাঁর একমাত্র লক্ষ্য মুসলমানদের স্বার্থরক্ষা করা আর মুসলমানেরা কখনই কংগ্রেস বা কংগ্রেস নেতাদের ওপর নির্ভর করবেনা এবং মুসলমানরা কংগ্রেসের সঙ্গে মিশে গিয়ে কখনই স্বাধীনতা আন্দোলনকে সমর্থন করবে না। মিঃ জিন্না প্রকাশ্যেই পাকিস্থান দাবী করতেন। এসব তত্ত্বে তিনি প্রকাশ্যেই মুসলমানদের দীক্ষিত করতেন। অন্ততঃ তত্ত্বের দিক থেকে তিনি কাউকে প্রতারিত

করেন নি। তিনি খুব সহজেই দেশ বিভাগের কথা বলতেন—এতে তাঁর জিব এতটুকু কাঁপত না।

৯০. গান্ধীজী মিঃ জিন্নাকে বহুবার দেখেছেন এবং বহুবার তাকে ডেকে পাঠিয়েছেন। প্রতিবারই তাকে ডেকেছেন 'ভাই জিন্না' বলে। তিনি কখনও তাঁকে গোটা ভারতের প্রধানতত্বও অর্পন করেছেন। কিন্তু কোন সময়েই জিন্না এতটুকু নতি বা সহযোগিতার প্রবণতা দেখান নি।

৯১ গান্ধীজীর বিবেকের বাণী, তাঁর আধ্যাত্মিক শক্তি এবং তাঁর অহিংসার তত্ত্ব, সম্পর্কে কত কিছুই না বলা হয়। সবই কিন্তু মিঃ জিন্নার লৌহদৃঢ় ইচ্ছার সামনে এলে কুঁকড়ে যেত—সবই শক্তিহীন বলে প্রমাণিত হ'ত।

৯২. মিঃ জিন্নাকে যে তাঁর আধ্যাত্মিক শক্তি দিয়ে প্রভাবিত কবা যাবে না, একথা জেনে গান্ধীজী তাঁর নীতির পরিবর্তন করতে পারতেন অথবা তাঁর পরাজয়কে মেনে নিয়ে ভিন্ন কোন রাজনৈতিক নীতিতে বিশ্বাসীজনের ওপর মিঃ জিন্না ও মুসলীম লীগের সঙ্গে কথাবার্তা চালাবার দায়িত্ব দিতে পারতেন। কিন্তু এমন ভাবে কাজ করবার সততা গান্ধীজীর ছিল না। তিনি জাতীয় স্বার্থের জন্যও তাঁর অস্মিতাবোধ বা অহং ত্যাগ করতে পারতেন না। এমনি করে গুরুতর ভুলগুলো—হিমালয়ের মত দুর্লঙ্ঘ্য ভুলগুলো যখন করা হচ্ছিল, তখন অন্য রাজনৈতিক দলগুলোর সামনে কোন কিছু করবার কোন সুযোগ খোলা ছিল না।

৯৩ নোয়াখালিতে বীভৎস হত্যাকাণ্ড ঘটবার পর থেকে প্রায় এক বছর ধরে আমাদের জাতি যেন অবিরাম রক্তের ধারায় স্নান করছিল। মুসলমানেরা যে আতঙ্কজনক ও মারাত্মক হত্যাকাণ্ডে মেতে উঠেছিল, হিন্দুদের মধ্যেও কোথাও কোথাও তার প্রতিক্রিয়া দেখা গিয়েছিল। পূর্ব-পাঞ্জাব, বিহার বা দিল্লীতে মুসলমানদের ওপর হিন্দুদের যে আক্রমণ হয়েছিল, তা সম্পূর্ণ এই রকম প্রতিক্রিয়ার ফল। মুসলমান প্রধান প্রদেশগুলোতে হিন্দুদের ওপর যে আক্রমণ চলছে তার প্রতি-

ক্রিয়াতেই যে এগুলি ঘটেছে, একথা গান্ধীজী জানতেন না—একথা কখনই সত্য নয়। অথচ গান্ধীজী শুধুই হিন্দুদের কাজের তীব্র নিন্দে করে চললেন। আর কংগ্রেস সরকার এতদূর গেলেন যে বিহারের হিন্দুরা যদি তাদের আক্রমণাত্মক ভঙ্গি না থামায় তবে বিমান থেকে বোমা ফেলে তাদের গুঁড়িয়ে দেওয়া হবে বলে শাসাতে থাকলেন। —অথচ এগুলি ছিল নোয়াখালি ও অন্যান্য অঞ্চলে মুসলমানদের নৃশংস আক্রমণ ও নৃশংসতারই প্রতিক্রিয়া। গান্ধীজী তাঁর প্রার্থনা সভায় প্রায়ই বলতেন, পাকিস্হানে হিন্দুদের যদি মারতে মারতে নিঃশেষও করে দেওয়া হয়, তবু ভারতের হিন্দু ও শিখেরা এখানকার মুসলমানদের শ্রদ্ধা ও উদারতার সঙ্গে গ্রহণ করবে। আর সুরাবর্দ্দি সাহেব যদি গুণ্ডাদের সর্দ্দারও হয়ে থাকেন, তবু দিল্লীর পথে তাকে স্বচ্ছন্দে ও নির্ভয়ে ঘুরতে দিতে হবে। এসব বক্তব্যের সত্যতা প্রমাণ করতে, গান্ধীজীর প্রাক্-প্রার্থনা বক্তৃতামালা থেকে কিছু উদ্ধৃতি দিচ্ছি।

(ক) আবেগের বশে ভেসে যাবার আগে নিশ্চয় আমরা ঠাণ্ডা মাথায় বিষয়টা নিয়ে চিন্তা করব। মুসলমানরা যদি হিন্দুত্বের অস্তিত্ব বিলুপ্ত করেও দিতে চায়—যদি তারা এবিষয়ে সংকল্পও করে, তবু হিন্দুরা মুসলমানদের ওপর কখনও ক্রুদ্ধ হবে না। যদি তারা আমাদের সকল-কেই হত্যা করে তবে আমরা বীরের মতই সে মৃত্যু মাথা পেতে নেব। তারা গোটা পৃথিবী জয় করেও নিতে পারে—তবু আমরা এই পৃথিবীতে বাস করব। অন্ততঃপক্ষে আমরা মরতে ভয় পাব না। আমরা যখন জন্মেছি, মৃত্যু ত' অবধারিত। তবে মৃত্যু নিয়ে এত বিমর্ষ হবার কি আছে? আমরা যদি মুখে হাসি নিয়ে মরতে পারি তবে আমরা এক নতুন জীবনে প্রবেশ করব—এক নতুন হিন্দুস্হান গড়ব।

[ ৬ এপ্রিল, ১৯৪৭ ]

(খ) রাওয়ালপিণ্ডি থেকে জনকয়েক লোক আজ আমার কাছে এসেছিলেন। তারা সবাই কষ্টসহিষ্ণু, সাহসী এবং ব্যবসায়ী। আমি তাদের বললাম, আপনারা শান্ত থাকুন। সবচেয়ে বড় কথা ঈশ্বর

মঙ্গলময়। এমন কোন স্থান নেই, যেখানে ঈশ্বর নেই। তাঁকে ধ্যান করুন, তাঁর নাম কীর্ত্তন করুন—দেখবেন সব ঠিক হয়ে যাবে। তারা জিজ্ঞাসা করল, যারা এখনও পাকিস্থানে আছে তাদের কি হবে? আমি তাদের জিজ্ঞাসা করলাম, সবাই কেন এখানে (দিল্লীতে) আসতে চাইবে? কেন তারা সেখানেই মরবে না? আমি এখনও এইমতে বিশ্বাসী যে যদি নিষ্ঠুর আচরণও সইতে হয় এমন কি যদি মরতেও হয়, তবু আমরা যেখানে বাস করতাম সেখানেই মরব। কেউ যদি আমাদের মারে, তবে আমাদের মরতেই দাও না। তবে আমরা বীরের মত মরব, আমাদের মুখে থাকবে ঈশ্বরের নাম। আমাদের প্রিয়-জনদেরও যদি মেরে ফেলা হয়—তবু আমরা কেন কারো ওপর ক্রুদ্ধ হব? এই কথাটা বুঝতে হবে যে কাউকে যদি মেরে ফেলা হয় তবে তাদের একটা যোগ্য এবং মঙ্গলময় পরিসমাপ্তি হ'ল। ঈশ্বর আমাদের সকলকে এমন মনোভাব দিন। আমরা এজন্য আন্তরিকভাবে প্রার্থনা করব। আমি রাওয়ালপিণ্ডির লোকেদের যে উপদেশ দিয়েছিলাম, আপনাদেরও সেই উপদেশই দেব। আপনারা শিখ ও হিন্দু উদ্বাস্তুদের সঙ্গে দেখা করবেন। তাদের রাজনৈতিকভাবে বোঝাবেন যে পুলিশ ও সৈন্যদের সাহায্য না নিয়েই যেন তারা পাকিস্থানের ফেলে রাখা জায়গায় ফিরে যান। [২৩শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪৭]

(গ) পাঞ্জাবে যারা মারা গেছেন, তারা আর ফিরে আসবেন না। একদিন আমাদেরও সেখানেই যেতে হবে। একথা সত্য যে তাদের খুন করা হয়েছে। আর অন্যেরা মরে—কেউ বা কলেরায়, কেউ বা অন্যরোগে। যে জন্মেছে সে ত' মরবেই। যারা মারা গেলেন, তারা যদি বীরত্বের সঙ্গে মরে থাকেন, তবে তারা হারান নি কিছুই বরং কিছু অর্জন করে-ছেন। কিন্তু যারা হত্যা করল, তাদের নিয়ে কি হবে? এটা একটা মস্ত বড় প্রশ্ন। কেউ এমন কথা স্বীকার করতে পারেন যে, মানুষ মাত্রেরই ভুল হয়। মানুষত' ভুলেরই বোঝা। পাঞ্জাবে তারই জন্য এই রক্ষণ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে (ব্রিটিশ সৈন্যদল নামান হয়েছে)। কিন্তু একে কি রক্ষণ ব্যবস্থা বলে? আমি চাই যে মুষ্টিমেয় লোকও

নিজেরা নিজেদের রক্ষা করবে। তারা মৃত্যুভয়ে ভীত হবে না। হত্যাকারীরাও আমাদের মুসলমান ভাই ছাড়া আর কেউ নয়। আমার ভাইরা যদি অন্য ধর্ম গ্রহণ করে তবে কি পর হয়ে যাবে? সে-কি আর ভাই থাকবে না? আর তখনই কি আমরা তাদের মত আচরণ করব? আমরা বিহারে নারীদের ওপর কি করতে বাকী রেখেছি।

৯৪. হিন্দুদের মনে যে প্রতিশোধ স্পৃহা জেগেছে, তা একটা স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া মাত্র। মুসলমানপ্রধান প্রদেশগুলিতে হাজার হাজার হিন্দুকে নারকীয়ভাবে হত্যা করা হয়েছে। এর একমাত্র কারণ—তারা হিন্দু। আমাদের সরকার তাদের না দিতে পেরেছেন কোন সাহায্য—না রক্ষা করতে পেরেছেন। এই পরিস্থিতিতে ঐসব প্রদেশের হতভাগ্য হিন্দুদের প্রতি দুঃখ ও ক্ষোভের ঢেউ যদি অন্য প্রদেশের হিন্দুদের মনে প্রাণে উত্তাল হয়ে ওঠে তবে কি তাকে অস্বাভাবিক বলা যায়? না, এগুলি আদৌ অস্বাভাবিক নয়। বরং এগুলি হ'ল উত্তপ্ত মনুষ্যত্ব-বোধেরই স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া। ঐ সব প্রদেশের হতভাগ্য ভাইদের বিড়ম্বনা ও দুর্ভাগ্যের খানিকটা উপশম ঘটাতে আর তাদের রক্ষা করবার আকাঙ্খাতেই মুসলমানদের ওপর প্রতিশোধ গ্রহণের এই প্রকাশ ঘটেছিল। হিন্দুরা এও ভেবেছিল, ঐ হতভাগ্যদের রক্ষা করবার এ ছাড়া আর কোন পথ নেই। হিন্দুরা যখন দেখল, পাকিস্হানে বসবাসকারী হিন্দুদের রক্ষা করবার কোন ক্ষমতাই ভারত সরকারের নেই—তখনই তারা নিজের হাতে আইন তুলে নিয়েছিল। বিহার বা অন্য প্রদেশে হিন্দুরা যে প্রতিশোধমূলক কাজ করেছিল তা অন্যত্র হিন্দুদের ওপর যে বীভৎস আক্রমণ চালান হয়েছিল, তারই অনিবার্য ও আকস্মিক মনোবিক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ছাড়া আর কি? সময় বিশেষে এগুলি দয়া-মমতার মতই স্বাভাবিক মানসিক অভিব্যক্তি।

৯৫. শাসকের অপকীর্ত্তির বিরুদ্ধে যথার্থ ক্ষোভের এই জাতীয় প্রকাশের ভেতর দিয়েই অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিপ্লব সফল হয়ে উঠেছে। দুষ্ট একনায়কের বিরুদ্ধে সর্বসাধারণের মনে যদি এমন ক্ষোভ,

প্রত্যাখ্যান আকাঙ্খা এবং প্রতিশোধের মনোভাব জেগে না উঠত, তবে সমাজের ওপর দুষ্টের অপশাসনের অবসান কখনই হ'ত না। রামায়ণ, মহাভারতের প্রাচীন ইতিহাসে যে সব ঘটনা বর্ণিত হয়েছে, বা জাপান-জার্মানের বিরুদ্ধে ইংলণ্ড ও আমেরিকার যুদ্ধ ঘোষণার যে ইতিহাস —তাও এই ধরণেব ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ারই প্রকাশ। এটা ভালও হতে পারে মন্দও হতে পারে—তবে এটাই মানুষের স্বভাব।

৯৬. গান্ধীজী বিভিন্ন ক্ষেত্রে কেমন করে ভারতীয় স্বাধীনতা অর্জনের প্রচেষ্টাকে তীব্রভাবে বিরোধিতা করেছিলেন, সে কথা আমি ভারতীয় রাজনীতির দিক থেকে বিচার করে আগেই আমাব বিবৃতিতে জানিয়েছি। তাঁর নিজস্ব রাজনৈতিক নীতিতে কোন সঙ্গতি ছিল না। গত যুদ্ধের ব্যাপারে তার ব্যক্তিগত ব্যবহার কোথাও কোথাও ছিল পুরোপুরি অকহতব্য।

৯৭. প্রথমে তিনি ইংলণ্ড এবং জার্মানীর মধ্যে ভারত কোন সাহায্য করবে না বলে মত জারি করলেন। তিনি আরও বললেন, "যুদ্ধ মানেই ত' হিংসা, তাহলে আমি কি করে সাহায্য করতে পারি?"—অথচ তাঁর ধনী সমর্থক ও অনুচরেরা সরকারের কাছ থেকে যুদ্ধোপকরণ সরবরাহের কন্ট্রাক্ট নিয়ে আর্থিক অবস্থা ফুলিয়ে ফেললেন। সকলের নাম প্রকাশ করা আমার পক্ষে নিরর্থক। তবে, বিড়লা, ডালমিয়া, ওয়ালচাঁদ হিরাচাঁদ, নানজিভাই, খলিদাস ইত্যাদির কথা সকলেই জানেন। গান্ধীজী এবং তার কংগ্রেসী বন্ধুরা সকলেই এদের সাহায্যে পুষ্ট। রক্তপ্লুত যুদ্ধ থেকেই এদের অর্থ সংগৃহীত হয়েছে—কিন্তু এই সব ধনীর কাছ থেকে টাকা নিতে গান্ধীজী কখনও আপত্তি করেন নি বা ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে যুদ্ধোপকরণ সরবরাহের এ সব চুক্তি করতেও তিনি কখনও নিষেধ করেন নি তাদের। বরং কংগ্রেস খাদি বন্দরকে তিনি স্বয়ং সৈন্যদের জন্য কম্বল সরবরাহের চুক্তি করতে অনুমতি দিয়েছিলেন।

৯৮. ১৯৪৪ সালে গান্ধীজীর মুক্তিলাভের পর পরই কংগ্রেসের অন্য নেতারাও ছাড়া পান। কিন্তু জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ব্রিটিশ

সরকারকে সমর্থনের আশ্বাস দিতে হয় কংগ্রেসকে। গান্ধীজী নিজে এ প্রস্তাবের বিরোধিতা ত' করলেনই না, বরং সরকারী প্রস্তাবকে অনুমোদন করলেন।

৯৯. গান্ধীজীর রাজনীতিতেও কোথাও চিন্তার সঙ্গতি ছিল না। এর পিছনে কোন যুক্তিও ছিল না। একে ব্যাখ্যা করতে তিনি সত্যের দোহাই পারতেন। তাঁর রাজনৈতিক মত ছিল আত্মশক্তি, বিবেকের বাণী, উপবাস, প্রার্থনা, চিত্তশুদ্ধি ইত্যাদি কতকগুলি প্রাচীন সংস্কারের ওপর প্রতিষ্ঠিত।

১০০. গান্ধীজী একবার বলেন, '**হিংসার বদলে অহিংসা প্রয়োগ করলে স্বাধীনতা যদি একশ' বছর পরেও আসে, সেও কাম্য।**' তিনি যা বলেছিলেন, তাই কি করেছিলেন ? না। তাও ঠিক নয়। তিনি যা বলতেন এবং যা করতেন, তা ছিল সম্পূর্ণ কোণাকুণিভাবে বিরুদ্ধ। নিচের উদাহরণগুলি থেকে তা খানিকটা বোঝা যাবে।

১০১ তাঁর অহিংসার মতবাদের মধ্যে যে অসঙ্গতি আছে, তার সাম্প্রতিক উদাহরণ অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে। কাশ্মীর সমস্যা পাকিস্হানের সঙ্গে বিশেষভাবে জড়িত। কাশ্মীর জয় করা এবং গ্রাস করার লক্ষ্য নিয়ে পাকিস্হান ভয়াবহ আক্রমণ শুরু করেছিল। কাশ্মীরের মহামান্য মহারাজ নেহেরু সরকারের কাছে সাহায্য চাইলেন। নেহেরু সরকার বললেন, শেখ আবদুল্লাকে কাশ্মীরের প্রধান শাসক করা হলে, সাহায্য দেওয়া হবে। প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়েই পণ্ডিত নেহেরু গান্ধীজীর সঙ্গে পরামর্শ করতেন। এ ব্যাপারেও সাহায্য না পাঠাবার পরামর্শ দিতে পারতেন। কিন্তু নেহেরুজী তাঁকে সে সুযোগ দিতে চান নি। বিশেষতঃ কাশ্মীর তাঁর জন্মস্হান বলে তিনি গান্ধীজীর সঙ্গে পরামর্শ করে এবং তার সম্মতি নিয়ে কাশ্মীরের সাহায্যের জন্য সেনাদল পাঠান। এ কথা স্বয়ং পণ্ডিতজী তাঁর বক্তৃতায় বলেছেন।

১০২. কাশ্মীরের হামলাকারীদের যে পিছন থেকে পাকিস্হানই মদত যোগাচ্ছে একথা আমাদের নেতারা প্রথম থেকেই জানতেন।

আর তাই কাশ্মীরে সৈন্য পাঠানোর অর্থ যে পাকিস্থানের বিরুদ্ধে সরাসরি যুদ্ধ টেনে আনা—এটা না বুঝবার কিছু ছিল না। গান্ধীজী নিজে সশস্ত্র যুদ্ধের বিরোধী একথা তিনি নিজেই সারা বিশ্বের কাছে বারংবার বলেছেন। অথচ তিনি নেহেরুজীকে কাশ্মীরে সৈন্য পাঠাতে সম্মতি দিলেন। কাশ্মীরে এখন যে সব কাণ্ড কারখানা চলছে তার থেকে এই সিদ্ধান্তই করা যায় যে, খণ্ডিত ভারতের এই স্বাধীনতা অর্জনের পর অহিংসাবাদী ও যুদ্ধবিরোধী গান্ধীজীর আশীর্বাদ-পুষ্ট সরকার কাশ্মীরে সমরাস্ত্রের সাহায্যে ব্যাপক নরহত্যার কল খুলেছেন।

১০৩ সত্যিই যদি অহিংসার মতবাদে গান্ধীজীর দৃঢ় আস্থা থাকত—তবে তিনি সৈন্যদল পাঠাবার পরিবর্ত্তে একদল সত্যাগ্রহী পাঠাবার পরামর্শ দিতেন এবং সত্যাগ্রহের আর একটা নতুন পরীক্ষা করতেন। সত্যিই যদি গান্ধীজীর অহিংসার আস্থা থাকত, তবে রাইফেলের বদলে 'তকলি' আর কামানের বদলে 'চরখা' পাঠাবার আদেশ জারি করা হত। আমাদের স্বাধীনতার এই প্রত্যূষকালে গান্ধীজীর বিশ্বাসমতে সত্যাগ্রহ প্রয়োগের শক্তি ও ফল প্রত্যয় করবার এ ছিল এক সুবর্ণ সুযোগ।

১০৪. কিন্তু গান্ধীজী ত' তা করলেন না। স্বাধীন ভারতের আবির্ভাবের সূচনাতেই তিনি স্বেচ্ছায় এক নতুন যুদ্ধের সূত্রপাত করলেন। কিন্তু কেন? কেন এই অসঙ্গতি? যে অহিংসার মতবাদ তিনি পালন করে আসছিলেন, তাকে নিজেই এমন নির্দয় ভাবে পদ-দলিত করলেন কেন? আমার মনে হয়, অনিবার্য কারণেই তিনি এ কাজ করে ছিলেন। কারণ, যুদ্ধটা হচ্ছিল সেখ আবদুল্লার জন্য। শাসন ক্ষমতায় একজন মুসলমানকে বসান হবে, এই মুসলমান প্রীতির জন্য এবং একমাত্র এ জন্যই কাশ্মীরের হামলা ঠেকাতে সৈন্য পাঠাতে গান্ধীজীর সম্মতি। কাশ্মীরের এই ভয়াবহ যুদ্ধের সংবাদ পড়তে পড়তে গান্ধীজী দিল্লীতে মুষ্টিমেয় মুসলমানের নিরাপত্তার দাবীতে অনশনে ব্রতী হলেন। কৈ তিনি ত' কাশ্মীরের হামলাবাজদের সামনে

গিয়ে অনশন করতে সাহস পেলেন না, কিংবা সেখানে পাঠালেন না কোন সত্যাগ্রহী দল। আসলে হিন্দুদের অবনত করতেই তাঁর উপবাস।

১০৫. এই বিংশ শতাব্দীতে এমন একজন কপটচারীকে সর্বভারতীয় রাজনীতির নেতা বলে সম্মান দেওয়াকে আমার সবচেয়ে দুর্ভাগ্য বলে মনে হয়। হায়দ্রাবাদে হিন্দুদের ওপর আক্রমণে এই মহাত্মার মন কিন্তু বিচলিত হয় নি, তিনি নিজামকেও পদত্যাগ করতে বলেন নি। ভারতের রাজনীতি যদি আজও গান্ধীজীর পরামর্শকেই চূড়ান্ত বলে মেনে পরিচালিত হত, তবে খণ্ডিত হলেও যেটুকু ভূখণ্ডের স্বাধীনতা পাওয়া গেছে—তাও রক্ষা করা সম্ভব হ'ত না। এই সব চিন্তা আমার মনে বার বার জেগে উঠত আর আমি কিছুতেই এগুলিকে মন থেকে দূর করতে পারতাম না। এই সব যখন ঘটে চলেছে, ঠিক তখনই ১৯৪৮ এর ১৩ই জানুয়ারী হিন্দু মুসলমান ঐক্যের প্রশ্নে গান্ধীজীর উপবাসের কথা ঘোষিত হ'ল। আমি আমার মানস বিক্ষোভকে নিয়ন্ত্রণ করবার ক্ষমতাও প্রায় হারিয়ে ফেললাম।

১০৬. গত চারবছর যাবৎ আমি একটি দৈনিক পত্রিকার সম্পাদক হিসাবে কাজ করছিলাম। এর আগে আমি প্রায় সব সময়ই ব্যয় করতাম জনসেবায়। এর ফলে সারা ভারতের রাজনৈতিক ক্রমবিকাশের ঘনিষ্ঠ পরিচয় রাখা আমার অভ্যাসে পরিণত হয়েছিল।

১০৭. তিনটি রাজনৈতিক দল—মুসলীমলীগ, কংগ্রেস এবং হিন্দু মহাসভার পারস্পরিক সম্পর্ক সম্বন্ধে আমি সম্পূর্ণ সচেতন ছিলাম। মুসলীম লীগ সব সময়েই কংগ্রেসকে হিন্দুদের দল বলে বর্ণনা করে গেছে। অথচ কংগ্রেসীদের 'সাম্প্রদায়িক দল' বললে তারা ভাবতেন তাদের গালি দেওয়া হ'ল।

১০৮. সত্যি কথা বলতে, জাতীয়তাবোধের বিকাশে বাধা না দিয়েও কোন রাজনৈতিক দল যদি বিশেষ কোন সম্প্রদায়ের স্বার্থের কথা ভাবে, তবে তাকে 'সাম্প্রদায়িক দল' বলা হবে কেন ?—কথাটাতে গালাগালির মানসিকতাই বেশি প্রকাশিত হয়। যে প্রতিষ্ঠান জাতীয়-

চেতনাকে বিধ্বংস করে কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের স্বার্থ প্রতিষ্ঠায় প্রবৃত হয়, একমাত্র তাকেই স্বার্থপর 'সাম্প্রদায়িক দল' বলে অভিযুক্ত করা যুক্তিসিদ্ধ। কংগ্রেসের এমন কোন অভিপ্রায় ছিল না। কংগ্রেস দোষারোপের অর্থেই মুসলীম লীগ ও হিন্দু মহাসভা দুইকেই 'সাম্প্রদায়িক দল' বলে বর্ণনা করত। এখানে একটা কথা বিশেষ ভাবে উল্লেখ করব যে কংগ্রেস নিজেই যখন পাকিস্থানের প্রতি কথায় নতি স্বীকার করে চলেছে, তখনও তারা হিন্দুমহাসভার 'সম্পূর্ণ জাতীয়-নীতি'র ঘোষণার প্রতি দৃক্পাত করেন নি—কিন্তু হিন্দু মহাসভা এবং তার নেতাদের বিরুদ্ধে বিকৃত মতবাদ প্রচার করে গেছেন।

১০৯. কংগ্রেস যখন মুসলীম লীগকে মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি হিসাবে মেনে নিয়েছে তখন, যুক্তির দিক থেকে হিন্দু-মহাসভাকে হিন্দুদের প্রতিনিধি বলে মানা তাদের উচিত ছিল অথবা তাদের নিজেদেরকেই বলা উচিত ছিল হিন্দুদের প্রতিনিধি—অর্থাৎ তারাই হিন্দুদের স্বার্থরক্ষার দায়িত্ব নেবেন। কিন্তু কংগ্রেস কখনও তা করেন নি। মুসলমানদের স্বার্থরক্ষার জন্য মুসলীম লীগের মত একটা শক্তিশালী দল থাকা সত্বেও কংগ্রেসের মধ্যে যে মুসলমানেরা ছিলেন তারাও মুসলমানদের স্বার্থরক্ষা করে চলতেন—অথচ হিন্দুদের দিকে তেমন করে তাকাবার কেউই ছিল না। কিন্তু যে কংগ্রেস হিন্দু মহাসভাকে 'সাম্প্রদায়িক' আখ্যায় ভূষিত করত, তারাই হিজ এক্সেলেন্সি লর্ড ওয়েভেলের আহ্বানে সিমলা নেতাদের সম্মেলনে যোগ দিলেন এবং মুসলমানদের ৫০% প্রতিনিধিত্বের নীতি মেনে নিলেন। শুধু তাই নয়, গান্ধীজীর দৃষ্টান্ত অনুসারে কংগ্রেস নেতারা বর্ণ-হিন্দুদের প্রতিনিধি হিসাবে পরিচয় দিতে প্রস্তুত ছিলেন। কংগ্রেসের এই মনোভাবই ছিল মারাত্মক রকমের সাম্প্রদায়িক আর এই মনোভাব সম্পূর্ণভাবে তাদের মুসলমান তোষণ নীতির ফলেই জন্মলাভ করেছিল।

১১০. দেশকে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করে দেবার এই আদর্শই কি কংগ্রেসের সামনে ছিল? ভারতবর্ষের এই স্বাধীনতা ও স্বরাজের

স্বপ্নই কি তাদের সামনে রাখা হয়েছিল? কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পর আমাদের তীক্ষ্ণধী, আত্মত্যাগী ও কর্মঠ মহান জাতীয় নেতারা স্বাধীনতার আদর্শ সামনে রেখে এরই জন্য কি তাদের জীবন পর্যন্ত উৎসর্গ করেছিলেন? তারা কি গোটা দেশের পূর্ণ স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের জন্য লড়েন নি? ছোট বড় নির্বিশেষে সমগ্র দেশের সমস্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতাই কি তারা গড়ে তুলতে চান নি? আর স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধে পাঞ্জাব, বাঙলাদেশ, সিন্ধু বা উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের যে সব অংশ নিয়ে আজ পাকিস্থান গঠিত তাদের অবদানও কি ভারতের অন্যান্য অংশের অবদানের চেয়ে কোন অংশে কম ছিল? আমি আরও বলব, অখণ্ড ভারতের স্বাধীনতার স্বপ্নে উদ্বুদ্ধ সেই সমস্ত দেশপ্রেমিক, কংগ্রেসের বাইরে থাকলেও ছিলেন প্রথম সারির বিপ্লবী। তারা হয় হাসিমুখে ফাঁসির দড়ি গলায় জড়িয়ে নিয়েছেন, না হয় স্বদেশ থেকে পালিয়ে গিয়ে পলাতক জীবন কাটাতে হয়েছে বিদেশে, না হয় আন্দামানের কারা প্রাচীরের অন্তরালে পচে মরে ছিলেন। তারা ছেঁড়া টুকরো করা দেশের বুকে অন্যের অনুমোদন করা স্বাধীনতার কথা স্বপ্নেও ভাবতে পারতেন না। অথচ এ কথা কি নির্মমভাবে সত্য হল যে তাদেরই সেই অতুলনীয় আত্মত্যাগের পুরস্কার হিসাবে আমরা কি পেলাম—না, দেশের একাংশে প্রতিষ্ঠিত হল অন্ধ ধর্মোন্মত্ততা ভিত্তিক এক রাষ্ট্র।

১১১ অথচ মিঃ জিন্নার চোদ্দ দফা দাবী পেশ করা থেকে পাকিস্থানের প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত সময় জুড়ে কংগ্রেস গান্ধীজীর নেতৃত্বে মুসলীম লীগের কাছে আত্মসমর্পন করেই চলল। পূর্ব আর পশ্চিমে স্বদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন দুই অংশ আর মাঝখানে হায়দ্রাবাদের কাঁটা যখন অবিরাম খোঁচাচ্ছে তখন এই খণ্ডিত দেশের বুকে এক তুচ্ছ ঔপনিবেশিক সরকার প্রতিষ্ঠার উপলক্ষ্যে জাঁকজমকপূর্ণ উৎসব উদ্যাপিত হতে দেখা কি জনগণের পক্ষে বেদনাদায়ক দৃশ্য নয়? গান্ধীজীর নেতৃত্বে কংগ্রেসের এই পতন দেখতে দেখতে কবি ভর্তৃহরির লেখা অনুরূপ বিষয়ের একটি শ্লোক আমার মনে পড়ছে—

শিবঃ সার্বং স্বর্গাৎ পশুপতি শিরস্তঃ ক্ষিতিধরম্
মহীধ্রাদুত্তুংগাত্ অবনিবনেশ্রাপি জলধিম্ ॥
অধোঽধো গঙ্গেয়ং পদমুপগতা স্তোকমধুনা ।
বিবেকভ্রষ্টানাম্ ভবতি বিনিপাতঃ শতমুখঃ ॥

[ গঙ্গা স্বর্গ থেকে শিবের মাথায় নেমে এসেছে, হিমালয়ে এসেছে সেখান থেকে, সেখান থেকে মর্ত্তধামে, সেখান থেকে সমুদ্রে গিয়ে লীন হয়েছে। এই একই ভাবে সে ক্রমশঃ নামতে নামতে খুবই নীচু স্তরে নেমে এসেছে। সত্য বলতে, অবিবেকী ব্যক্তিরা শতবিধ পথে অবনতির পথেই নেমে যায়।]

## পঞ্চম অধ্যায়

### জাতীয়তা বিরোধী আপোষনীতির চরমোন্নতি

১১২. গান্ধীজীকে রাজনৈতিক মঞ্চ থেকে সরিয়ে দেবার সিদ্ধান্ত যেদিন নিলাম, সেদিনই আমি স্পষ্ট জানতাম যে ব্যক্তিগত ভাবে আমার যা কিছু সবই আমাকে হারাতে হবে। আমি ধনবান লোক নই কিন্তু যে মধ্যবিত্ত সমাজে আমি পরিচিত সেখানে আমার শ্রদ্ধা ও সম্মানের আসন ছিল। আমার প্রদেশের জনসেবায় আমার অংশ ছিল আর যেটুকু সেবা আমি করতে পেরেছিলাম, তার জন্য আমার লোক-জনদের মধ্যে আমার শ্রদ্ধা ও সম্মান ছিল। সভ্যতা ও সংস্কৃতির ধারণা গুলো আমার অপরিচিত ছিল না। গঠনমূলক নানা কাজের স্বপ্নও আমার মনে ছিল এবং তা করবার এবং সুসম্পন্ন করবার মত শক্তি ও উদ্দীপনাও আমার মধ্যে ছিল। আমি সুস্বাস্থ্যের অধিকারী, আমার কোন শারীরিক প্রতিবন্ধকতা নেই, আর আমি কোন রকম পাপা-চরণেও আসক্ত নই। আমি নিজে যদিও খুব শিক্ষিত লোক নই তবে শিক্ষিতজনের প্রতি আমার যথেষ্ট শ্রদ্ধা আছে।

১১৩. ১৯২৯-৩০ সালে কংগ্রেস যখন প্রথম আইন-অমান্য আন্দোলন শুরু করল, তখনই আমি জনসেবামূলক কাজ শুরু করি। সে সময় আমি একজন সামান্য ছাত্র তবু ঐ আন্দোলন বিষয়ে যেসব বক্তৃতা এবং কর্ম-বিবরণী পত্রিকায় প্রকাশিত হ'ত তা পড়ে আমি অভি-ভূত হই এবং জনসেবার কর্মী হবার সঙ্কল্প গ্রহণ করি। এই আন্দো-লন শেষ হলেই মুসলমান-সমস্যা তীব্র আকার ধারণ করল। হিন্দুদের একত্রিত ও সংগঠিত করাও প্রয়োজন দেখা দিল। সেকাজে হাত দিলেন ডাঃ মুনজী, ভাই প্রেমানন্দজী, পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের মত হিন্দু মহাসভার নেতারা, আর্য সমাজের নেতারা এবং রাষ্ট্রীয় স্বয়ং-

সেবক সংঘের কর্মীরা। এই সময়েই 'সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা'র প্রশ্নটি সমস্ত রাজনৈতিক দলের মধ্যে তপ্ত আলোচনার বিষয় হয়ে ওঠে। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা দরকার যে এই সময়েই কংগ্রেস অন্যায় ভাবে মুসলমানদের এমন সমর্থন করতে শুরু করলেন যা হিন্দুদের পক্ষে ক্ষতিকারক হয়ে উঠল আর তাই ১৯৩৫ সালে হিন্দু মহাসভার পুনা অধিবেশনে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে আইনসভায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবার সিদ্ধান্ত নেওয়া হ'ল। কংগ্রেসের বিরুদ্ধে লড়বার এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হ'ল প্রয়াত পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের সমর্থনে। উল্লেখ্য যে তিনি নিজেও ছিলেন একজন প্রাক্তন কংগ্রেসী নেতা।

১১৪ ১৯৩২ সালের কাছাকাছি সময়ে নাগপুরের প্রয়াত ডাঃ হেদগেয়ার মহারাষ্ট্রেও রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ গড়লেন। তার বাগ্মীতা আমাকে প্রবলভাবে অভিভূত করে এবং স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে আমি সংঘে যোগ দি। একেবারে প্রারম্ভিক স্তরে মহারাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় সংঘে যারা যোগ দেয়, আমি তাদের অন্যতম। এই সংঘের মহারাষ্ট্র প্রদেশের বুদ্ধিবৃত্তিমূলক দিকেও আমি বেশ কয়েক বছর কাজ করেছি। হিন্দুদের উন্নতির জন্য কাজ করে, আমি অনুভব করতে থাকলাম যে এদেশে হিন্দুদের ন্যায্য অধিকার সংরক্ষিত রাখতে রাজনৈতিক কাজেও অংশ গ্রহণ প্রয়োজন। এজন্যই আমি সংঘ পরিত্যাগ করে হিন্দু মহাসভায় যোগ দিলাম।

১১৫. ১৯৩৮ সালে হায়দ্রাবাদে দায়িত্বশীল সরকার গঠনের দাবিতে হিন্দুমহাসভা যখন নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ আন্দোলন চালাবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তখন আমারই নেতৃত্বে প্রথম স্বেচ্ছাসেবক দল হায়দ্রাবাদের ভূখণ্ডে প্রবেশ করে। আমাকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং এক বৎসরের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। হায়দ্রাবাদের অসভ্য, না শুধু অসভ্য নয় একেবারে বর্বর, শাসকদের পরিচয় ব্যক্তিগত ভাবে জানবার সুযোগ ঘটল আমার। আমাকে দৈহিক শাস্তিও ভোগ করতে হয়েছে। প্রার্থনার সময় 'বন্দেমাতরম্' গাওয়ার জন্য আমাকে ডজনের পর ডজন বেত্রাঘাত করা হয়েছে।

১১৬. ১৯৪৩ সালে ভাগলপুরে হিন্দুমহাসভার অধিবেশন চালাবার ওপর বিহার সরকার এক নিষেধাজ্ঞা জারি করে। সরকারের এই নির্দ্দেশ অন্যায় এবং বে-আইনী বিবেচনায় মহাসভা এই নিষেধ অগ্রাহ্য করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। সরকার এই সভাকে বাধা দেবার সব রকম প্রস্তুতি নিলেও অধিবেশন চল্‌ল। প্রায় একমাস আত্মগোপন করে থেকে আমি এই অধিবেশন চালাবার প্রস্তুতিতে নেতৃত্ব গ্রহণ করেছিলাম। এই সময়ে আমার কাজের প্রশংসাসূচক নানা বিবরণ আমি কাগজে পড়েছি। আমি শুনেছি আমার জনসেবামূলক জীবনকে সমর্থন করে লোকে নানা আলোচনা করছে। স্বভাববশে আমি উগ্র মেজাজের লোক নই। রাজসাক্ষী বাদগে তার বিবরণের ২২৫ পৃষ্ঠায় বলেছে, আমি ছোরা তুলে মিঃ ভূপথকরকে হত্যা করতে গিয়েছিলাম। একথা সম্পূর্ণ মিথ্যা। বর্ত্তমানে মিঃ ভূপথকর বিবাদীপক্ষের সমর্থনে আইনজীবী দলের নেতৃত্ব দিচ্ছেন। রাজসাক্ষী যেভাবে বর্ণনা করেছেন সেভাবে যদি আমি মিঃ ভূপথকরকে অসম্মান করে থাকতাম তাহলে আমাদের সমর্থনে এভাবে এগিয়ে আসা কি তার পক্ষে সম্ভব হত? বিবৃত ঘটনাটি সত্য হলে মিঃ ভূপথকরের সহযোগিতা গ্রহণের কথা আমিও ভাবতে পারতাম না।

১১৭. যারা আমাকে ব্যক্তিগতভাবে চেনেন, তারা আমাকে স্থির মেজাজের লোক বলেই জানেন। কিন্তু যখন গান্ধীজীর সম্মতিক্রমে কংগ্রেসের শীর্ষস্থানীয় নেতারা যে দেশকে আমরা দেবী হিসাবে পূজা করি তাকেই ভাগ করলেন, টুক্‌রো টুক্‌রো করলেন—তখন আমার মন ভয়াবহ ক্রোধে ভরে গেল।

আমি এটা পরিষ্কার করে বলতে চাই, আমি কংগ্রেসের শত্রু নই। এদলটি দেশের রাজনৈতিক মঙ্গল সাধনের জন্য অগ্রগণ্যদল হিসাবে কাজ করেছে। এর নেতাদের সঙ্গে বহু বিষয়ে আমার মত পার্থক্য ছিল এবং আছে। বীর সাভারকরকে ২৮শে ফেব্রুয়ারী ১৯৩৩ ( RXD/30 ) লেখা যে চিঠিটি আমার হাতে রয়েছে, তার থেকেই এবিষয়টি স্পষ্ট হবে। চিঠিটা স্বাক্ষর করে দিলাম এবং এর বয়ানকে আমি স্বীকার করলাম।

১১৮. ব্যক্তিগত কোন কারণে গান্ধীজী এবং আমার মধ্যে কোন শত্রুতা ছিল না। পাকিস্হানকে সমর্থনের পিছনে গান্ধীজীর সৎ অভিপ্রায়ের কথা যারা বলেন, তাদের কাছে আমি এইটুকুই বলতে চাই যে পাকিস্হান সৃষ্টি হওয়ার ফলে যে বীভৎস ঘটনাবলী ঘটে চলেছে, তার জন্য গান্ধীজীই ছিলেন সম্পূর্ণভাবে দায়ী এবং জবাব-দিহি যোগ্য মানুষ। আর গান্ধীজীর ওপর এই চরম পন্হা গ্রহণের সময় আমার মনে স্বদেশের পবিত্রতম মঙ্গল ইচ্ছা ছাড়া আর কিছুই ছিল না। আমার একাজের ফলে কি হবে তা আমি আগেই বুঝেছিলাম —একথাও বুঝেছিলাম ঘটনাপ্রবাহ জানা থাকা সত্বেও এই ঘটনার কথা জানা মাত্রই তারা আমার সম্পর্কে মতামতের পরিবর্ত্তন ঘটাবেন। সমাজে আমার যে সম্মান ও প্রতিষ্ঠা, আমার প্রতি তারা সহানুভূতি রাখতেন, সব সম্পূর্ণ ধুলিস্যাৎ হয়ে যাবে। আমি একথা পুরোপুরিই অনুভব করেছিলাম যে আমাকে সমাজে একজন ঘৃণ্য মানুষ বলেই গণ্য করা হবে।

১১৯. পত্র পত্রিকায় যে আমাকে তীব্রভাবে আক্রমণ করা হবে এ বিষয়েও আমার খুব স্পষ্ট ধারণা ছিল। কিন্তু পত্র পত্রিকা যে আগ্নেয় লাভা আমার ওপর ঢেলে দেবে, তাতে ভীত হওয়ার মত মানুষ আমি ছিলাম না। কারণ আমি জানতাম যে ভারতের পত্র পত্রিকা যদি নির-পেক্ষভাবে গান্ধীজীর জাতীয়তা বিরোধী নীতির সমালোচনা করত কিংবা তারা যদি সর্বসাধারণের মনে এ ধারণার সঞ্চার করতে পারত যে কোন ব্যক্তি বিশেষের ইচ্ছার চেয়ে, তা সে ব্যক্তিটি যত মহানই হন না কেন, জাতীয় স্বার্থ অনেক অনেক বড়—তাহলে গান্ধীজী এবং তার অনুসারীরা যত সহজে পাকিস্হানকে স্বীকার করেছিলেন, তত সহজে পারতেন না। কংগ্রেসের সর্বোচ্চ শক্তির কাছে ভারতীয় পত্র পত্রিকা কিছু দুর্বলতা দেখিয়েছে, কিছু নতি স্বীকারও করেছে। তারা নেতাদের ভুলগুলোকে না দেখার ভান্ করে উপেক্ষা করেছে এবং তাদের এই নীতির ফলেই দেশভাগ সহজ হয়ে গেছে। দুর্বল এবং অনুগত হয়ে পড়া এমন পত্র পত্রিকার ভয় আমাকে আমার সিন্ধান্ত থেকে বিচলিত করতে পারে নি।

১২০. কোন কোন মহল থেকে একথাও বলা হচ্ছে যে পাকিস্হান কে মেনে না নিলে জনসাধারণকে এটুকু স্বাধীনতাও তুলে দেওয়া যেত না। কিন্তু এ মতকে আমি সম্পূর্ণ অশুদ্ধ এবং অসত্য মনে করি। আমার মনে হয় নেতারা যা করে বসেছেন, তার সমর্থনে এ এক অতি দুর্বল অজুহাত সৃষ্টি। গান্ধীবাদী নেতারা কখনও দাবী করেন যে তাদের সংগ্রামের ফলেই 'স্বরাজ্য' এসেছে। তাদের সংগ্রামের ফলেই যদি স্বরাজ্য এসে থাকে, তবে যে ব্রিটিশদের কাছ থেকে তা পাওয়া গেল তা দেবার আগে পাকিস্হানের সর্ত্তটা চাপিয়ে দেবার জোর তারা পেল কোথা থেকে ? এর একটাই কারণ হতে পারে যে গান্ধীজী এবং তার অনুগতেরা পাকিস্হান সৃষ্টি বিষয়ে তাদের সম্মতি দিয়েছিলেন এবং প্রথমে একটু দ্বিধা ও প্রতিরোধের ভঙ্গি দেখালেও শেষ পর্যন্ত তারা মুসলমানদের দাবী মেনে নিতে অভ্যস্ত ছিলেন।

১২১. ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট পাকিস্হান সৃষ্টি হয়েছিল, কিন্তু কিভাবে ? পাঞ্জাব, বঙ্গদেশ, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ বা সিন্ধের জনগণের মানসিকতা বা মতামত বিবেচনা না করেই পাকিস্হান কে স্বীকার করা হয়েছিল। অবিভাজ্য ভারতকে দুভাগ করে তার এক ভাগে এক ধর্মশাসিত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হ'ল। মুসলমানরা পাকিস্হান হিসাবে পেলেন তাদের জাতীয়তা বিরোধী আন্দোলন ও কার্যকলাপের ফল। গান্ধীবাদীরা পাকিস্হান বিরোধীদের বিশ্বাসঘাতক এবং সাম্প্রদায়িক মনোভাব-সম্পন্ন বলে উপহাস করেন, কিন্তু তারাই ত' জিন্নার দাবী মেনে নিয়ে ভারতবর্ষের মাটিতে মুসলমান রাষ্ট্র পাকিস্হান গড়ে তুলতে সাহায্য করলেন। পাকিস্হান সৃষ্টির এই বিষয়টিই আমার মনের স্হিতাবস্হাকে বিচলিত করে। এর পরেও যদি এই গান্ধীবাদী সরকার পাকিস্হানে পড়ে যাওয়া হিন্দুদের রক্ষার জন্য কোন ব্যবস্হা করতেন, তাহলে ভীষণভাবে প্রবঞ্চিত এই সব মানুষের জন্য আমার বুকের যে তীব্র আলোড়ন তা হয়ত সংযত করা আমার পক্ষে সম্ভব হ'ত। কিন্তু তার বদলে, কোটি কোটি হিন্দুকে পাকিস্হানের মুসলমানদের দয়ার ওপর ফেলে দিয়ে, গান্ধীজী এবং

তার অনুগতেরা তাদের পাকিস্থান ত্যাগ না করে সেখানেই থেকে যাবার পরামর্শ দিতে থাকলেন। এমনি করে হিন্দুরা মুসলমান কর্মকর্ত্তাদের হাতে ফাঁদে পড়লেন আর এই পরিস্থিতিতে একটার পর একটা ধারা-বাহিকভাবে হত্যা-লুঠ-ধর্ষণের করুণ বীভৎস ঘটনা ঘটে যেতে থাকল এই সমস্ত ঘটনার কথা আমি যখন স্মরণ করি, তখন আজও আমার মনে জ্বলন্ত আগুনের বিভীষিকাময় অনুভূতি ছড়িয়ে পড়ে।

১২২. প্রতিদিন ভোরেই সংবাদ আসত যে হাজার হাজার হিন্দুকে হত্যা করা হয়েছে, ১৫000 শিখকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে, হাজার হাজার হিন্দু রমণীর জামাকাপড় ছিঁড়ে উলঙ্গ করে শোভাযাত্রা করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে এবং হিন্দু রমণীদের গরু' ছাগলের মত প্রকাশ্য বাজারে বিক্রি করা হচ্ছে। হাজার হাজার হিন্দু শুধু প্রাণ নিয়ে পালিয়ে আসছে—তাদের যথাসর্বস্ব ফেলে রেখে আসতে হচ্ছে। চল্লিশ মাইলেরও বেশি লম্বা উদ্বাস্তুর সারি হেঁটে আসছে ভারতের দিকে। এই সমস্ত ঘটনার বিরুদ্ধে ভারতীয় যুক্ত-রাষ্ট্রের সরকার প্রতিরোধমূলক কি ব্যবস্থা নিয়েছিলেন? আহা! তারা বিমানে করে উদ্বাস্তুদের মধ্যে রুটি ছুঁড়ে দিয়েছিলেন।

১২৩. এই সমস্ত নৃশংসতা এবং রক্তস্নান হয়ত' কিছু পরিমাণে কমত যদি পাকিস্থানে সংখ্যালঘুদের ওপর এমন আচরণের বিরুদ্ধে ভারত সরকার কড়া প্রতিবাদ পাঠাতেন কিংবা ভারতেও মুসলমানদের ওপর সমান আচরণ করা হবে বলে মৃদু ভীতিপ্রদর্শনও করা হ'ত কিন্তু গান্ধীজীর কুক্ষিগত সরকার সম্পূর্ণ ভিন্নরকম কাজ করতে থাকলেন। যদি কোন পত্রিকায় পাকিস্থানে সংখ্যালঘুদের ক্ষোভের কথা প্রকাশ করা হ'ত, সঙ্গে সঙ্গে সে পত্রিকার মুখ চেপে ধরা হ'ত—সে যেন ভারতের সম্প্রদায়গুলির মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাবার মত অপরাধ করে ফেলেছে। কংগ্রেসের বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকার একের পর এক পত্র-পত্রিকার ওপর জরুরী আইনজারী করে এ বিষয়ে সংরক্ষণ দাবী করতে থাকলেন। আমার একার ওপরেই বম্বে প্রদেশ থেকে ১৬ হাজার টাকা সিকিউরিটি জমার দাবী করা হ'ল। স্বরাষ্ট্র

বিভাগের মোরারজী ভাই দেশাই আদালতে জানিয়েছেন এমন ৯০০-বেশি মামলা আছে। পত্র-পত্রিকার এই ক্ষোভগুলো মেটাবার ব্যাপারেও কিছু করা হয় নি। মন্ত্রীদের কাছে ডেপুটেশনের আবেদনও ফেলে রাখা হয়েছে। শান্তিপূর্ণ উপায়ে গান্ধীবাদী কংগ্রেস সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করে আমার সব প্রচেষ্টাই এমনি করে হতাশায় পর্যবসিত হয়েছে।

১২৪. পাকিস্থানে যখন এ সব ঘটনা ঘটে চলেছে তখন গান্ধীজী একটি কথা বলেও প্রতিবাদ করেন নি বা পাকিস্থান সরকার বা সংশ্লিষ্ট মুসলমানদের নিন্দা করেন নি। হিন্দু সমাজ এবং হিন্দু সংস্কৃতিকে পাকিস্থান থেকে নির্মূল করবার এই নৃশংস প্রয়াস সম্পূর্ণভাবে গান্ধীজীর শিক্ষা ও আচরণের ফল। ভারতীয় রাজনীতি যদি কোন বাস্তব নীতির দ্বারা পরিচালিত হ'ত তবে এত ব্যাপক নরহত্যার আয়োজন হতে পারত না। এত বড় ব্যাপক নরহত্যার দৃষ্টান্ত পৃথিবীর ইতিহাসে আর পাওয়া যায় না।

১২৫ এটা একটা উল্লেখ্য এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে মুসলমান সংক্রান্ত বিষয় হ'লে গান্ধীজী জনসাধারণের মতামতের ধারও ধারতেন না। তার অহিংসার তত্ত্ব ত' এখন নররক্তে আপ্লুত হয়ে উঠেছে আর পাকিস্থানের স্বপক্ষে জনসাধারণকে কিছু বোঝানও অসম্ভব ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। যতক্ষণ ভারতের পাশেই রয়েছে এক ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র এবং সরকার, ততক্ষণই ভারতের শান্তি এবং স্বস্তি হয়ে রয়েছে বিপদগ্রস্ত। কিন্তু এসব সত্ত্বেও জনমনে পাকিস্থান বিরোধী মনোভাবের প্রসার থামাতে এমন প্রচারের পন্থা গ্রহণ করেছেন যা মুসলীম লীগের একজন গোঁড়া সমর্থকের পক্ষেও সম্ভব হ'ত না।

১২৬. এই সময়েই তিনি তাঁর শেষ আমরণ অনশন শুরু করলেন—কারণ দিল্লীর এক মসজিদ হিন্দু উদ্বাস্তুরা দখল করে নিয়েছিল। এই অনশন ভঙ্গের জন্য যে সমস্ত সর্ত দেওয়া হল, তার প্রত্যেকটিই মুসলমানদের পক্ষে এবং হিন্দুদের বিরুদ্ধে।

১২৭. গান্ধীজীর আমরণ অনশন ভঙ্গের একটি সর্ত ছিল দিল্লীর যে সমস্ত মসজিদ উদ্বাস্তুরা দখল করে নিয়েছিল, সে সম্পর্কে সর্তটা ছিল এই যে, তা খালি করে দিতে হবে এবং খালি করে মুসলমানদের হাতে সমর্পণ করতে হবে। শুধুমাত্র অনশনের দ্বারা গান্ধীজী সরকার এবং বহু কংগ্রেসী নেতাকে বলপূর্বক এই সর্ত মেনে নিতে বাধ্য করালেন। সেদিন আমি দিল্লীতে ছিলাম এবং এই সর্ত কার্যকর করতে যে সমস্ত ঘটনা ঘটেছিল তাদের কতকগুলো আমি স্বপক্ষে দেখেছিলাম। যেদিন গান্ধীজী উপবাস ভাঙ্গলেন সেদিন ছিল তীব্র ঠাণ্ডা এবং বৃষ্টি ঝরছিল। এই অস্বাভাবিক আবহাওয়ার পরিস্থিতিতে, সেই তীব্র হুল ফোটান ঠাণ্ডায় আরামদায়ক স্থানে বসেও লোকেরা কাঁপছিল। এই পরিস্থিতিতে দিল্লীতে আশ্রয় নিতে আসা উদ্বাস্তু পরিবারের পর পরিবারকে আশ্রয়চ্যুত করে রাস্তায় বের করে দেওয়া হয়েছিল। তাদের আশ্রয়ের কোন বিকল্প ব্যবস্থাও করে দেওয়া হয় নি। দু-একটা পরিবার তাদের ছেলেমেয়ে, স্ত্রীলোক এবং সামান্য যেটুকু জিনিস তাদের ছিল, তা নিয়ে বিড়লাভবনের সামনে এসে বলছিল, গান্ধীজী আমাদের আশ্রয়ের মত একটা জায়গা দাও। কিন্তু এই ধরণের দরিদ্র হিন্দুর কান্না কি রাজকীয় বিড়লাভবনবাসী গান্ধীজীর কানে পৌঁছায়। আমি নিজের চোখে এ দৃশ্য দেখেছি। নিতান্ত কঠোর হৃদয় মানুষের হৃদয়ও এতে গলে যায়। খুব মজা হবে বলেই কি উদ্বাস্তুরা ঐ সব মসজিদে গিয়ে উঠেছিল—যেখান থেকে তাদের উৎখাত করা হল? যে কারণে এবং যে পরিস্থিতিতে উদ্বাস্তুরা ঐ সব মসজিদ দখল করেছিল সে সম্পর্কে কি গান্ধীজী ওয়াকিবহাল ছিলেন না? যে অংশ পাকিস্থানে পরিণত হয়েছিল, সেখানে একটিও মন্দির বা গুরুদ্বার ছিল না। এই উদ্বাস্তুরা স্বচক্ষে দেখে এসেছেন যে তাদের মন্দির এবং গুরুদ্বারকে শুধু হিন্দু ও শিখদের অপমান করবার জন্যই ভেঙ্গে ফেলা হচ্ছে অথবা নোংরা কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে। উদ্বাস্তুরা এসেছিলেন তাদের

সব কিছু ফেলে তারা দিল্লীতে পালিয়ে এসেছিলেন আর দিল্লীতে তাদের জন্য কোন আশ্রয়ও ছিল না। রাস্তার পাশে বা গাছের তলায় আশ্রয় নিয়ে পাঞ্জাব এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে তাদের ফেলে আসা গৃহ ও আবাসের কথা যদি বারংবার স্মরণে আসে তবে তাতে অবাক হবার কি থাকতে পারে? এই রকম পরিস্থিতিতে পড়েই উদ্বাস্তুরা মসজিদে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল। তারা বাস করছিল মসজিদের ছাদের তলায়, এতে কি মসজিদকে মানবহিতে ব্যবহার করা হয় নি? যে উদ্বাস্তুরা মসজিদ দখল করেছিল তাদের বের করে দিয়ে মসজিদ ফাঁকা করে দেবার দাবী জানাবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি কি সরকারকে বলেছিলেন ঐ সমস্ত উদ্বাস্তুর জন্য বিকল্প ব্যবস্থা করে দেবার? যদি তা করতেন তবে তার দাবীতে মানবিকতার স্পর্শ লাগত। গান্ধীজী যখন উদ্বাস্তুদের দখল করা মসজিদগুলি খালি করে দিতে বললেন, তখন তাঁর এ দাবিটাও যোগ করা উচিত ছিল যে পাকিস্থানের মন্দির-গুলিও হিন্দুদের ফিরিয়ে দিতে হবে। তিনি এমন আরও কিছু সর্ত আরোপ করতে পারতেন যার থেকে বোঝা যেত বা মেনে নিতে পারা যেত যে তাঁর অহিংসার শিক্ষা, হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের জন্য উৎকণ্ঠা বা আত্মিক শক্তির প্রতি বিশ্বাস ছিল সত্যিই নিরপেক্ষ, আন্তরিক এবং অসাম্প্রদায়িক। এ ব্যাপারে গান্ধীজী অত্যন্ত কূটবুদ্ধিসম্পন্ন ছিলেন এবং জানতেন যে তিনি তার আমরণ অনশন ভঙ্গের জন্য যদি পাকিস্থানের ওপর এমন কোন সর্ত আরোপ করেন তবে তাঁর মৃত্যু হলেও বেদনায় অশ্রুমোচন করতে একজন মুসলমানও পাওয়া যাবে না। এজন্যই তিনি ইচ্ছে করে মুসলমানদের ওপর কোন সর্ত চাপাতেন না। অতীত অভিজ্ঞতা থেকে গান্ধীজী জানতেন যে তাঁর অনশন দিয়ে মিঃ জিন্নাকে একটুও বিচলিত বা প্রভাবিত করা যাবে না আর তাঁর অন্তরাত্মার নির্দ্দেশের ওপর মুসলীম লীগ অনুমাত্রও গুরুত্ব অর্পণ করে না।

১২৮. এই প্রসঙ্গে একথা উল্লেখ করা বোধ হয় অবান্তর হবে না যে গান্ধীজীর চিতাভস্ম ভারত ও বিদেশের বহু শহরে বিতরণ

করা হয়েছে এবং বহু নদীতে বিসর্জন দেওয়া হয়েছে। কিন্তু ঐ চিতাভস্ম সিন্ধু নদের যে অংশ পাকিস্থানের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে, সে অংশে বিসর্জন দেওয়া যায় নি। পাকিস্থানে ভারতীয় রাষ্ট্রদূত শ্রী শ্রীপ্রকাশের বিশেষ চেষ্টাতেও তা সম্ভব হয় নি।

১২৯. এবার আমরা ৫৫ কোটি টাকার ব্যাপারে আসছি। এখানে আমি ১৯৪৮ সালের ২রা ফেব্রুয়ারীর 'ইণ্ডিয়ান ইনফরমেশন' থেকে নিচের উদ্ধৃতিগুলি দিচ্ছি ঃ

(১) গত ১৯৪৮ সালের ১২ই জানুয়ারী সাংবাদিকদের সঙ্গে বৈঠকে (প্রেস-কন্‌ফারেন্স্‌) মাননীয় সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের বিবৃতির অংশ।

(২) মাননীয় শ্রী সম্মুখম্‌ চেট্টীর বিবৃতির অংশ।

(৩) ভারতীয় শুভেচ্ছার স্বতঃস্ফূর্ত ভঙ্গি, এবং

(৪) মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিবৃতির অংশ।

গান্ধীজী নিজেই এই ৫৫ কোটি টাকা সম্পর্কে বলেছেন যে, কোন সরকারের পক্ষে তার সিদ্ধান্তের পরিবর্ত্তন করা খুব সহজ নয়। তবু সরকার পাকিস্থানকে ৫৫ কোটি টাকা না দেবার সিদ্ধান্তকে বদলেছিলেন—এমন করবার কারণ তার আমরণ অনশন। (১৯৪৮ সালের ২১শে জানুয়ারী বা তার কাছাকাছি কোন তারিখে প্রার্থনার সভায় গান্ধীজীর বাণী) পাকিস্থানকে ৫৫ কোটি টাকা না দেবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল যে সরকার—তা নিজেকে জনগণের সরকার বলে দাবী করে। কিন্তু এই জনগণের সরকারের সিদ্ধান্ত গান্ধীজীর অনশনের জন্য পরিবর্ত্তন করতে হ'ল। এর থেকে আমার মনে নিশ্চিত ধারণা হ'ল যে গান্ধীজীর পাকিস্থান তোষণ-প্রবণতার কাছে জনগণের মতও তুচ্ছ।

১৩০. ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনের প্রতি অনাস্থা থেকেই জন্ম হল পাকিস্থানের। একদল লোক যারা পাকিস্থানের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেছে তাদের পঞ্চম-বাহিনী বলে জেলে ভরে রেখেছেন এই সরকার। কিন্তু আমার কাছে ত' গান্ধীজী পাকিস্থানের সবচেয়ে বড় সমর্থক এবং প্রচারক। কিন্তু তাঁকে বা তাঁর এই মনোভাবকে নিয়ন্ত্রণ করবার কোন শক্তিই নেই।

১৩১ এই পরিস্থিতিতে, মুসলমান নৃশংসতার হাত থেকে হিন্দুদের বাঁচাতে গান্ধীজীকে এ পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেওয়াই একমাত্র কার্যকর পন্থা বলে আমার মনে হ'ল।

১৩২. গান্ধীজীকে জাতির জনক বলে বর্ণনা করা হয়। এই উপাধি তাঁর প্রতি উচ্চ সম্মানের পরিচায়ক। কিন্তু তাই যদি হয় তবে তিনি সে পিতৃত্বের দায় পালনে ব্যর্থ হয়েছেন। বিশ্বাসঘাতকের মত দেশবিভাগে সম্মতি দেওয়াই তার প্রমাণ। গান্ধীজী যদি পাকিস্থান সৃষ্টির বিরোধিতায় সত্যিই অবিচল থাকতেন তবে মুসলীম লীগের পক্ষে এ দাবীর প্রতিষ্ঠা সহজ হ'ত না—সমস্ত প্রচেষ্টা থাকা সত্ত্বেও ব্রিটিশরাও তা করতে পারত না। এর কারণ খুঁজবার জন্য বেশিদূর যেতে হবে না। এদেশের মানুষ স্বদেশ অবিভক্ত রাখতেই ব্যগ্র ছিলেন এবং ছিলেন পাকিস্থানের ঘোর বিরোধী। কিন্তু গান্ধীজী জনসাধারণের সঙ্গে মিথ্যাচার করলেন, এবং দেশের এক অংশ মুসলমানদের দিলেন পাকিস্থান সৃষ্টির জন্য। আমি অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে বলছি যে তিনি এ কাজ করে জাতির পিতা হিসাবে তাঁর ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়েছেন। তিনি পাকিস্থানের পিতা হিসাবেই প্রতিষ্ঠা করেছেন নিজেকে। ভারতমাতার একজন কর্ত্তব্যপরায়ণ সন্তান হিসাবে আমি শুধু এই কারণেই ভেবেছি যে, যিনি আমার মাতৃভূমি—এই দেশকে খণ্ড খণ্ড করতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছেন—সেই তথাকথিত জাতির পিতার জীবনের সমাপ্তি ঘটান আমার পবিত্র কর্ত্তব্য।

১৩৩. হায়দ্রাবাদের বিষয়টির পিছনেও সেই একই ইতিহাস। নিজামের মন্ত্রীরা এবং রাজাকররা যে নৃশংস কার্যকলাপ চালিয়ে যাচ্ছেন, তার উল্লেখ করবার প্রয়োজন নেই। ১৯৪৮ সালের জানুয়ারীর শেষ সপ্তাহে হায়দ্রাবাদের প্রধানমন্ত্রী লাইক আলি গান্ধীজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। হায়দ্রাবাদের বিষয়টি গান্ধীজী যে দৃষ্টিতে দেখতেন তাতে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ ছিল না যে শীঘ্রই গান্ধীজী হায়দ্রাবাদে তাঁর অহিংসার পরীক্ষায় মেতে উঠবেন আর সুরাবর্দ্দীর

মতই কাসিম রাজভীকে সৎ ছেলে বলে গ্রহণ করবেন। এটা বোঝাও মোটেই কষ্টকর ছিল না যে হায়দ্রাবাদের মত মুসলিম রাজ্যের বিরুদ্ধে কোন বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নেওয়া কংগ্রেস সরকারের পক্ষে সম্ভব হবে না—অন্ততঃ গান্ধীজী যতদিন বেঁচে থাকবেন। সরকার যদি সামরিক বা পুলিশী কোন ব্যবস্থা হায়দ্রাবাদের বিরুদ্ধে করতে যেতেন, তবে তাও ঐ ৫৫ কোটি টাকা না দেওয়ার সিদ্ধান্তের মতই তুলে নিতে হ'ত—কারণ তাহলেই গান্ধীজী আমরণ অনশন শুরু করতেন, আর তাঁর জীবন বাঁচাতে সরকারকে এগিয়ে যেতেই হ'ত।

১৩৪ আক্রমণকারীর উদ্ধত মুষ্ঠি কোন অস্ত্র বা দৈহিক বল প্রয়োগ না করেই নামিয়ে আনাই গান্ধীজীর মতে অহিংসার প্রতিক্রিয়া। অহিংসার কথা বলতে গিয়ে গান্ধীজী প্রায়ই এক বাঘের উদাহরণ দিতেন। গরুরা যখন অধিক সংখ্যায় মরবার জন্য বাঘের কাছে এগিয়ে আসতে থাকল তখন গরু মারতে মারতে ক্লান্ত হয়ে বাঘ অহিংসার মন্ত্র গ্রহণ করল। এখানে উল্লেখ করব যে কানপুরের গণেশ শঙ্কর বিদ্যার্থী স্থানীয় মারমুখী মুসলমানদের শিকারে পরিণত হয়ে প্রাণ দিয়েছিল। অহিংসা নীতির প্রতিষ্ঠার জন্য মুসলমান মুষ্ঠির সামনে এমন আত্মসমর্পন ও মৃত্যুবরণকে গান্ধীজী প্রায়ই আদর্শ বলে উল্লেখ করতেন। আমি একথা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতাম এবং বিশ্বাস করি যে এই ধরণের অহিংসার নীতি গোটা জাতিকে ধ্বংস করবে এবং অবশিষ্ট ভারতে ঢুকে পড়ে সেটুকুকেও পাকিস্থানে পরিণত করতে পাকিস্থানকেই সাহায্য করবে।

১৩৫. খুব সংক্ষেপে বললে, আমি নিজের সম্পর্কে যা ভেবেছিলাম বা ভবিষ্যৎ বুঝেছিলাম, তা হচ্ছে এই যে, আমি যদি গান্ধীজীকে হত্যা করি, তবে আমি সর্বাংশে বিধ্বংস হয়ে যাব। লোকের কাছে ঘৃণা ছাড়া আর কিছু আমার প্রাপ্য থাকবে না ; আমার প্রাণের চেয়েও যে সম্মানকে আমি বেশি মূল্যবান ভাবতাম তাও আমাকে হারাতে হবে। উল্টো দিকে আমার এও মনে হল গান্ধীজী না থাকলে ভারতীয় রাজনীতির ক্ষেত্র হবে অনেক বাস্তববাদী,

প্রতিরোধের শক্তি জন্মাবে তার, সামরিক শক্তিতে বীর্যবান হয়ে উঠবে। আমার ভবিষ্যৎ হয়ত' রসাতলে যাবে, কিন্তু আমার স্বদেশ পাকিস্থানের অনধিকার প্রবেশের হাত থেকে রক্ষা পাবে। লোকে হয়ত আমাকে নির্বোধ বলবে, বলবে সব রকম বিচারবোধশূন্য কিন্তু আমার জাতি হবে বিপদমুক্ত, শক্তিমান জাতি গড়ে তুলবার পথ হয়ত গ্রহণ করতে পারবে।—একেই আমি সবচেয়ে প্রয়োজনীয় বলে বিচার করতাম। বিষয়টা ভালভাবে বিচার করেই আমি এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলাম কিন্তু কাউকেই আমি এ বিষয়ে কিছু বললাম না। আমি আমার দুই হাত ধরে শক্তি সঞ্চয় করলাম এবং ১৯৪৮ সালের ৩০ শে জানুয়ারী বিড়লা ভবনের মাঠে প্রার্থনাসভায় গান্ধীজীর দিকে গুলি ছুঁড়লাম।

১৩৬. আমার আর বিশেষ বিছু বলবার নেই। যদি কারো স্বদেশের প্রতি অনুরক্তি পাপ হয়, তবে আমি পাপ করেছি। এটা যদি প্রশংসার হয় তবে আমি বিনীত ভাবেই তা দাবী করব। আমি একথা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, যদি মানুষের গঠিত এই বিচারালয়ের ঊর্ধ্বেও আর কোন বিচারালয় থাকে, তবে সেখানে আমার কাজ অন্যায় বলে গৃহীত হবে না। যদি মৃত্যুর পর এমন কোন স্থান না থাকে, যদি সেখানে যেতে না হয়, তবে বলবার কিছু নেই। আমি যে কাজে ব্রতী হয়েছি, তা সম্পূর্ণভাবে মানবতার মঙ্গলের জন্যই করেছি। আমি একথাই বলব যে আমি এমন একজনের দিকে গুলি ছুঁড়েছি যার নীতি ও কর্মধারা লক্ষ লক্ষ হিন্দুকে ছারে খারে দিয়েছে এবং ধ্বংস করেছে।

১৩৭. সত্যি কথা বলতে গেলে, গান্ধীজীর প্রতি গুলি ছোঁড়ার সাথে সাথে আমার জীবনও একটা সমাপ্তি রেখায় এসে পোঁচেছে। সে দিন থেকে আমি যেন এক ধ্যানমগ্নতার মধ্যে অবস্থান করছি। এই সময়ের মধ্যে আমি যা দেখেছি বা অনুভব করেছি তা আমাকে সম্পূর্ণ পরিতৃপ্তি দিয়েছে।

১৩৮. হায়দ্রাবাদ সমস্যা সমাধানে যে অকারণ বিলম্ব ঘটান হচ্ছিল এবং যা একেবারে স্তব্ধ করে রাখা হয়েছিল—গান্ধীজীর

মৃত্যুর পর সশস্ত্র সামরিক অভিযানে সরকার তার যোগ্য সমাধান করেছেন। দেখা যাচ্ছে অবশিষ্ট ভারতের সরকার একটা বাস্তবানুগত রাজনৈতিক পন্থা গ্রহণ করেছেন। শোনা যাচ্ছে যে, আমাদের স্বরাষ্ট্র বিভাগ ইতঃমধ্যেই এমত প্রকাশ করেছেন যে আমাদের আধুনিক সমরাস্ত্রে সম্পূর্ণ সুসজ্জিত সৈন্যদল থাকা অত্যাবশ্যক। তাঁর এই অভিমত প্রকাশের সঙ্গে তিনি আরও বলেছেন যে এই পদক্ষেপ গান্ধীজীর আদর্শের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই করা হয়েছে। তিনি তাঁর পরিতৃপ্তির জন্য একথা বলতে পারেন। কিন্তু এ কথা নিশ্চয়ই কেউ ভুলবেন না যে ব্যাপারটা যদি তাই হ'ত তবে স্বদেশ রক্ষার জন্য হিটলার, মুসলিনী বা চার্চিল বা রুশভেল্ট যে প্রন্হা গ্রহণ করেছিলেন তার সঙ্গে এর কোন পার্থক্য থাকত না আর সেগুলিও হত গান্ধীজী কথিত অহিংসার তত্ত্বের ওপর প্রতিষ্ঠিত। তাহলে এ কথাও বলা অসম্ভব হ'ত যে গান্ধীজীর অহিংসার তত্ত্বের মধ্যে কোন নবীনতার বাণী আছে।

১৩৯. আমি একথা স্বীকার করি যে গান্ধীজী জাতির জন্য পীড়ন সহ্য করেছেন। তিনি সাধারণের মনে একটা জাগরণের স্পর্শ এনেছিলেন। তিনি ব্যক্তিগত লাভের জন্য কিছু করেন নি। কিন্তু দুঃখ পেলেও এ কথা বলতেই হবে যে সব দিক থেকেই যে তাঁর অহিংসার নীতি পরাজিত ও ব্যর্থ হয়েছে, এ কথা স্বীকার করবার মত সততা তাঁর ছিল না। আমি বহু বুদ্ধিমান এবং শক্তিমান ভারতীয় স্বদেশ প্রেমিকের জীবন কথা পড়েছি। তারা গান্ধীজীর চেয়েও অনেক বেশি ত্যাগ করেছেন। আমি ব্যাক্তিগত ভাবেও তাদের কাউকে কাউকে দেখেছি। কিন্তু সে যাই হোক, স্বদেশের জন্য গান্ধীজী যা করেছেন তার জন্য আমি গান্ধীজীর পদতলে প্রণত হব, প্রণত হব, ব্যক্তি গান্ধীজীর জন্য—তাঁর ঐ স্বদেশসেবার জন্যই। এবং তাঁর দিকে গুলি ছুঁড়বার আগেও তাঁর মঙ্গল কামনা করেছি, শ্রদ্ধায় নত হয়েছি। কিন্তু তবু বলছি যে, যে স্বদেশ আমাদের পুণ্য পূজার জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তি তাকে খণ্ড বিখণ্ড করবার অধিকার অত

বড় সেবকেরও ছিল না—সর্বসাধারণকে প্রবঞ্চিত করবার অধিকার-ও তাঁর ছিল না। কিন্তু এগুলির সবই তিনি করেছিলেন। এমন কোন আইনব্যবস্থা ছিল না যা দিয়ে গান্ধীজীকে অভিযুক্ত বা দোষী সাব্যস্ত করা যায়। আর সেই কারণেই আমাকে গান্ধীজীকে গুলি করে হত্যার সিন্ধান্ত নিতে হয়েছিল—এ ছাড়া আমার সামনে আর কোন পথ খোলা ছিল না।

১৪০ এ কাজটা যদি আমি না করতাম তবে সেটাই হ'ত আমার পক্ষে মঙ্গলজনক। কিন্তু পরিস্থিতি আমার নিয়ন্ত্রনের বাইরে চলে গেছিল। আমার মনেব ভেতর এই আবেগের তাড়না এত বেশি প্রবল হয়েছিল যে আমি ভাবলাম, এই মানুষটিকে তার স্বাভাবিক পরিণতিতে চলতে দেওয়া যেতে পারে না—পৃথিবী জানুক যে তাঁর অন্যায়, জাতীয়তাবিরোধী এবং দেশের ধর্মোন্মাদ এক অংশের প্রতি মারাত্মক পক্ষপাতের জন্য ইহজীবনেই তাকে মূল্য পরিশোধ করে যেতে হয়েছে। আমি চেয়েছিলাম যে এ ব্যাপারটা এবং লক্ষ লক্ষ হিন্দুর বিনা কারণে নিহত হওয়ার একটা পরিসমাপ্তি ঘটুক। এই পবিত্র ভূমির লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবনে বিড়ম্বনা টেনে আনার জন্য দায়ী তাঁর যে একগুঁয়ে স্বভাব – ঈশ্বর তাব জন্য যেন তাকে ক্ষমা করেন।

১৪১ ব্যাক্তিগত ভাবে কারো প্রতি আমার কোন মন্দ অভিপ্রায় বা শত্রুতা নেই। আমি এ কথাও ভাবিনা যে কোন মানুষ-ব্যক্তি আমার প্রতি শত্রুভাবাপন্ন। মুসলমানদের প্রতি অন্যায়ভাবে অনুগ্রহ দেখাত বলে এই সরকারের প্রতিও আমার কোন শ্রদ্ধা ছিল না—একথা আমি স্বীকার করছি। কিন্তু সেই সঙ্গে এটাও বুঝতে পেরেছিলাম যে এ বিষয়ে গান্ধীজীর চাপের ফলেই সম্পূর্ণ ঐ নীতি গৃহীত হয়েছিল। কিন্তু সেই চাপ সরে যাওয়ায় খাঁটি অর্থেই এক অসাম্প্রদায়িক রাষ্ট্রের বনিয়াদ প্রস্তুতির পথ উন্মুক্ত হয়েছে। আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর প্রতি সসম্মানে নিবেদন করতে চাই যে তিনি মাঝে মাঝে ভুলে যান যে তার কাজ এবং কর্ম

পদ্ধতি প্রায়ই পরস্পর বিরোধী হয়ে পড়ে। তিনি যখন আইন সভার অধিবেশনের ভিতরে বা বাইরে ধর্মনিরপেক্ষতার কথা বলেন তখন স্ববিরোধ দৃষ্ট হয় কারণ মাননীয় পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু একটি ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র—পাকিস্হান প্রতিষ্ঠায় মুখ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন! কিন্তু তাঁর বোঝা উচিত ছিল যে ঠিক পাশেই একটি ধর্মোন্মাদ রাষ্ট্র থাকলে ভারতীয যুক্তরাষ্ট্রের সমৃদ্ধি ঘটতে পাবে না। সম্পূর্ণ নিজে নিজে এ সব বিষয়ে ভাবনার পর আমার বিবেক আমাকে গান্ধীজীর বিরুদ্ধে এই কাজ করতে বাধ্য করে। আমার এই কাজে কেউ আমাকে অনুপ্রাণিত করেওনি—করতে পারতেনও না।

১৪২ মাননীয় বিচারালয়! আমার ভেতরে জেগে ওঠা এই তাড়না এবং আমার কাজ সম্পর্কে যে কোন দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করতে পারেন এবং আমার প্রাণদণ্ড বা অন্য যা কিছু যোগ্য বলে মনে করেন, তাই করতে পারেন। এ সম্পর্কে কিছু বলবার ইচ্ছা আমার নেই। আমি চাইনা যে আমাকে কোন করুণা করা হোক। আমি এও চাইনা যে আমার হয়ে আর কেউ করুণা ভিক্ষা করুক।

১৪৩. এই বিচারে আরও কয়েকজনকে ষড়যন্ত্রকারী বলে আমার সঙ্গে অভিযুক্ত করা হয়েছে। আমি ইতঃপূর্বেই বলেছি, আমি যে কাজ করেছি, তাতে আমার কোন সহযোগী ছিল না এবং এ কাজের জন্য সম্পূর্ণ দায়িত্ব আমার। আমার সঙ্গে যদি এদের অভিযুক্ত করা না হ'ত, তবে আমি হয়ত কোন আইনজীবীকে নিযুক্ত করতাম না। আমার এই মানসিকতার প্রমাণ হিসাবে আমি উল্লেখ করব যে আমি আমার পরমর্শদাতা আইনজীবীদের কাছে ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলাম। এবং তারা সম্মত হয়েছিলেন—১৯৪৮ সালের ৩০শে জানুয়ারীর ঘটনার সম্পর্কে কোন সাক্ষীকে প্রতিজেরা করা হবে না।—তা হয়ও নি।

১৪৪. একথা আমি আগেই পরিস্কারভাবে বুঝিয়ে বলেছি যে ব্যক্তিগতভাবে আমি শান্তিপূর্ণভাবে বিক্ষোভ প্রদর্শনের চিন্তাকে সমর্থন করি নি—এমন কি কার্যকর প্রচারের সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও

২০শে জানুয়ারী ১৯৪৮ এর ঘটনাকেও সমর্থন করিনি। যাইহোক প্রবল অনিচ্ছা নিয়েও আমি শেষ পর্যন্ত গান্ধীজীর প্রার্থনা সভায় শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ প্রকাশে যোগ দিতে পারি নি। কিন্তু যখন জানলাম যে, সেই বিক্ষোভও একারণে সেকারণে ভালভাবে প্রদর্শন করা যায় নি, তখন আমি যেমন হতাশ হলাম, তেমনি মরিয়া হলাম। বোম্বে, পুনা ও গোয়ালিয়র থেকে সেচ্ছাসেবক আনবার যে চেষ্টা মিঃ আপ্তে এবং অন্যেরা করেছিলেন, তা ফলপ্রসূ হল না। চরম পন্থা গ্রহণ করা ছাড়া আর কোন পথ তখন খুঁজে পেলাম না।

১৪৫. যখন এই সমস্ত আমার মনে আলোড়িত হচ্ছিল, তখন আমি দিল্লীতে উদ্বাস্তু-ক্যাম্পে ঘুরছিলাম। পিঠে ক্যামেরা এক ফটোগ্রাফারের সঙ্গে আমার দেখা হ'ল। সে আমাকে একটা ফটো তুলতে বল্‌ল। তাকে উদ্বাস্তু বলেই বোধ হ'ল। আমি রাজী হলাম এবং তাকে দিয়ে ফটো তোলালাম। দিল্লী রেল প্লাটফর্‌মে ফিরেএসে আমি আমার মানসিকতার ছায়াছন্ন আভাস দিয়ে আপ্তেকে দুটি চিঠি লিখলাম। সঙ্গে দিলাম আমার ফটোগ্রাফ। নারায়ণ আপ্তে আমার পত্রিকার ব্যবসার ঘনিষ্ট সহযোগী ছিলেন। তাকে জানান আমার নৈতিক দায়িত্ব বলে মনে হল। চিঠি দুটির একটি আপ্তের ব্যক্তিগত ঠিকানায় পুনায় পাঠান হ'ল, অন্যটি পাঠালাম হিন্দু রাষ্ট্র অফিসে।

১৪৬. আমি আরও বলতে চাই যে এই বিবৃতিগুলি সম্পূর্ণ আমার তৈরী। এগুলি পরিপূর্ণভাবে সত্য এবং ভ্রমশূন্য! এর প্রত্যেকটি অংশ নির্ভরযোগ্য আকর-গ্রন্থের সহযোগিতায় রচিত হয়েছে। আমি এতে ব্যবহার করেছি ঃ—

* ইণ্ডিয়ান ইনফরমেশন্‌ ঃ ভারত সরকারের এক সরকারী মুখপত্র জনসাধারণের অবগতির জন্য মুদ্রিত।
* ইণ্ডিয়ান ইয়ারবুক।
* কংগ্রেসের ইতিহাস।
* গান্ধীজীর আত্মচরিত।
* বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত কংগ্রেস 'বুলেটিন'।

* 'হরিজন' ও 'ইয়ংইণ্ডিয়া'র ফাইল। এবং
* গান্ধীজীর প্রাক্-প্রার্থনা বক্তৃতামালা।

আমার কাজের জন্য জনসাধারণের কাছ থেকে প্রশংসা কুড়াবার অভিপ্রায়ে আমার বিবৃতি এত দীর্ঘ করিনি। আমি এটা করেছি, তাব একমাত্র কারণ এই যে আমার সম্পর্কে ভুল বোঝার কোন অবকাশ আমি রাখতে চাই না। তাদের মনে আমার মতামত সম্বন্ধেও কোন ভ্রান্ত ধারণা আমি রাখতে চাই না।

১৪৭ আমার স্বদেশ, হিন্দুস্থান নামেই যার যথার্থ পরিচয় তা আবার সংযুক্ত হোক—এক হোক। যে পরাজিতের মনোভাব আমার স্বদেশবাসীকে আক্রমণকারীর কাছে নত হতে শেখাচ্ছিল তা তারা ছুঁড়ে ফেলে দিতে শিখুক—সর্বশক্তিমানের কাছে এই আমার অন্তিম প্রার্থনা।

১৪৮. আমি বিবরণ শেষ করেছি কিন্তু বসে পড়বার আগে আমি আন্তরিকভাবে এবং সশ্রদ্ধভাবে সম্মানীয় বিচারককে আমার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে চাই। আপনি আমার বিবৃতি যে ধৈর্যের সঙ্গে শুনেছেন, আমার প্রতি যে সৌজন্য প্রদর্শন করেছেন এবং আমাকে যে সুযোগ দিয়েছেন—তার জন্য আমি কৃতজ্ঞ। এই বিশেষ বিচারে আমার আইনজ্ঞ বন্ধুরা আমাকে যে আইনগত পরামর্শ ও উপদেশ দিয়েছেন, তার জন্যও আমি তাদের কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। এই মামলার সঙ্গে জড়িত পুলিশ অফিসারদের বিরুদ্ধেও আমার কোন অসদিচ্ছা নেই। তারা আমার প্রতি যে দয়ার্দ্র ব্যবহার দেখিয়েছেন, সে জন্যও তাদের আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। সমভাবেই আমি ভাল ব্যবহারের জন্য জেল কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ দিচ্ছি।

১৪৯. এটা সত্য ঘটনা যে, আমি প্রকাশ্য দিবালোকে তিন/চার শতলোকের সামনে গান্ধীজীকে গুলি করেছি। আমি পালিয়ে যাবার কোন চেষ্টা করিনি। প্রকৃতপক্ষে পালিয়ে যাবার কোন চিন্তাই আমি বুকে ঠাঁই দিইনি। আমি নিজেকেও গুলি করিনি। আমার তেমন

কোন ইচ্ছাও ছিল না। কারণ আমি চেয়েছিলাম খোলা আদালতের মাধ্যমে আমার সমগ্র ধারণার কথা সকলে জানুক।

১৫০. চারদিক থেকে আমার বিরুদ্ধে যে সমালোচনার ঝড় বইয়ে দেওয়া হচ্ছে, তাতেও কিন্তু আমার কাজের নৈতিক দৃঢ়তার প্রতি আমার আস্থা বিন্দুমাত্র বিচলিত হয় নি। আমার এ অবিচল বিশ্বাস আছে যে সৎ ঐতিহাসিকেরা ভবিষ্যতে একদিন আমার কাজকে যোগ্য গুরুত্ব দিয়ে বিচার করবে এবং তারা এ কাজের সত্য-মূল্য নির্দ্ধারণ করবে।

অখণ্ড ভারত অমর রহে!
বন্দে মাতরম্

নাথুরাম গড্‌সে
দিল্লী
৮-১১-১৯৪৮

sd. ATMACHARAN.
8th November, 1948

## পরিশিষ্ট

### এক. দলিলাদির সারসূচী

(১) উপ-প্রধানমন্ত্রীর বিবৃতি, তাং জানুয়ারী ১২, ১৯৪৮। পাকিস্থানকে নগদ টাকা দেওয়া। প্রয়াত সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল তখন উপ-প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। তিনি তাঁর বিবরণে ভারতের কাছ থেকে পাকিস্থানের নগদ অর্থ আদায়ের ব্যাপারে ঔদ্ধত্য ও কপটাচারের কথা বলেছেন। সেই সময়েই তারা কাশ্মীরে অভিযান চালাচ্ছে। তিনি টাকাটা না দেওয়ার ব্যাপারে ভারতের মনোভাবকে জোরালভাবে সমর্থন করেছেন।

(২) অর্থ-মন্ত্রীর যোগাযোগের বিবরণও সর্দার প্যাটেলের মনোভঙ্গির সমর্থন করেছে। সেই সঙ্গে সতর্ক বাণী উচ্চারণ করছে যে পাকিস্থানের দায়িত্বশীল মন্ত্রীরা ভারতের বিরুদ্ধে গুণ্ডামি ও জোর করে আটকে রাখার যে প্রচার ও কুৎসা রটনা করছে তাতে কিছুতেই ভারত নত হবে না।

(৩) 'ভারতের স্বতঃস্ফূর্ত্ত শুভেচ্ছার অভিব্যক্তি' ঃ—বারংবার ভারতের মনোভাবের যথার্থতার কথা বলা হয়েছে। এই সময় গান্ধীজীর অনশনের চাপে পড়ে এবং ৫৫ কোটি টাকা দেওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়।

(৪) হিন্দু মহাসভার বিলাসপুর অধিবেশনের সিদ্ধান্তঃ ডিসেম্বর ১৯৪৪। নাথুরাম গড্‌সে এগুলির সমর্থক।

(ক) স্বাধীন হিন্দুস্থানের শাসনতন্ত্রের ভিত্তিস্থানীয় নীতি ঃ যার নামকরণ হবে "স্বাধীন রাষ্ট্র হিন্দুস্থানের গঠনতন্ত্র।"

(খ) ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক দিক থেকে হিন্দুস্হান এক, সম্পূর্ণ এবং অবিভাজ্য এবং এই রকমই সে থাকবে।

(গ) সরকার হবে গণতান্ত্রিক এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় চরিত্রের।

(ঘ) কেন্দ্রীয় আইনসভা হবে দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট।

(ঙ) নির্বাচন হবে প্রাপ্ত বয়স্ক ভিত্তিক এবং প্রতিজনের এক ভোট। নির্বাচক মণ্ডলী হবে যৌথ তবে জনসংখ্যার ভিত্তিতে সংখ্যালঘুদের জন্য সংরক্ষণের ব্যবস্হা থাকবে।

(চ) **মৌলিক অধিকার সমূহঃ** আইনের চোখে সব নাগরিকই হবে সমান। দেওয়ানী বা ফৌজদারী, স্হায়ী বা সাময়িক কোন রকম আইনেই কোন বৈষম্যের ব্যবস্হা থাকবে না।

(ছ) রং, জাতি বা বিশ্বাসের জন্য কোন ক্রমেই কোন নাগরিক কোন সরকারী চাকরীতে, সরকারী দপ্তরে কোন ক্ষমতায় বা সম্মানে বা কোন বৃত্তিতে পক্ষপাত লাভ করবেন না।

(জ) ভারতের শৃঙ্খলা ও নীতিবোধের সাপেক্ষে, ভারতের সকল নাগরিক বিচারবোধ, বৃত্তি ও ধর্মাচরণের স্বাধীনতা ভোগ করবে, তার সংস্কৃতি ও ভাষা সংরক্ষণের অধিকার ভোগ করবে। এমন কোন আইন প্রবর্ত্তিত হতে পারবে না যা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনধর্মকে কোন কিছু দিতে পারে বা যার দ্বারাকোন ধর্মের ওপর কোন নিষেধাজ্ঞা চাপান হয় বা ধর্মাচরণে সীমাবদ্ধ করা হয় অথবা কোন ধর্ম-বিশ্বাস বা ধর্মীয় পদের জন্য কেউ বিশেষ সুযোগ পায় বা সাধারণ সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়।

[নাথুরামের উইলটি চিঠির আকারে হিন্দীতে লিখিত। তার ছোট ভাই দত্তাত্রয় বিনায়ক গড্‌সের উদ্দেশ্যে লেখা। ১৯৩৯ সালের ১৫ই নভেম্বর জেলাশাসক এর ওপর সিল মারেন। জেলা কর্তৃপক্ষ চিঠিটি শ্রীদত্তাত্রয়ের কাছে পাঠিয়ে দেন।

নাথুরাম রেখেগেছেন তার মূল্যবান সম্পত্তি— তার চিতাভস্ম—তা নিয়ে কি করতে হবে তারই নির্দেশ।]

— — — — — — — — — — — — — — —

আম্বালা জেল।

আমার প্রিয় দত্তাত্রয়,

আমার মরদেহ নিয়ে শেষকৃত্য সাধনের দায় তোমাকে দেওয়া হয়েছে—তুমি যে কোন রীতিতেই তা করতে পার। কিন্তু আমি এখানে একটা সুনির্দিষ্ট আকাঙ্খা প্রকাশ করতে চাই।

সিন্ধু নদের তীরে আমাদের প্রাগ-ঐতিহাসিক ঋষিরা বেদমন্ত্র রচনা করেছিলেন। তাই সিন্ধু হচ্ছে আমাদের ভারতবর্ষ বা হিন্দুস্থানের।

স্বাধীন হিন্দুস্থানের পতাকা যখন আবার পবিত্র সিন্ধুনদের তীরে বইবে তখন আমার চিতাভস্ম সেখানে বিসর্জন দিও। সে হবে আমাদের এক পবিত্র দিন।

আমার এ চিতাভস্ম বিসর্জন দিতে যদি কয়েক পুরুষ ও অপেক্ষা করতে হয় তাতে কিছুই এসে যাবে না। আমার চিতাভস্ম রক্ষা করো। আর তোমার জীবনকালে যদি সে দিন না আসে তবে পরবর্ত্তী পুরুষের হাতে তুলে দিও সেই চিতাভস্ম আর তার কাছে বলো আমার এই আকাঙ্খার কথা। যতদিন আমার আকাঙ্খা পূরণ না হয় ততদিন পুরুষানুক্রমে এমনি করে চলো!

আর সরকার যখন কোর্টে পেশ করা আমার জবানবন্দীর ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেবে, সেদিন তুমি এটা প্রকাশ করো। আমি তোমাকে এব্যাপারে প্রতিভূ রেখে গেলাম।

১৪ ১১ ১৯৪৯ নাথুরাম বিনায়ক গড্‌সে।

নির্ণীয়মান পবিত্র কৈলাস মন্দিরের চূড়ার কলস নির্মাণের ব্যয় নির্বাহের জন্য আজ আমি ১০১, টাকা দান করে গেলাম।

১৫.১১.১৯৪৯ নাথুরাম বিনায়ক গড্‌সে

৭-১৫ এ. এম

জেলাশাসকের

সিল।

# শুনুন ধর্মাবতার

## ✻ তৃতীয় ভাগ ✻

টীকাকার ঃ ডঃ নীরদবরণ হাজরা

## শুনুন ধর্মাবতার

### প্রথম ভাগ

---

আলঙ্কারিক চাতুর্য্যে নয়

১. প্রত্যেক আসামী ।। প্রত্যেক আসামী বলতে শাস্তিপ্রাপ্ত, সসম্মানে মুক্ত, রাজসাক্ষী বা পলাতক—সকলের সম্পর্কেই।

২. বিদেশী লেখক ।। গোপাল গড়সে এখানে Freedom at Midnight গ্রন্থের লেখকদের বুঝিয়েছেন। এঁরা লারি কলিন্স এবং ডোমিনিক লাপিয়ের। ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তি এবং তার পরবর্ত্তী কিছুকাল এ গ্রন্থের বর্ণনীয় বিষয়। লেখকদ্বয় গান্ধীজী সম্পর্কে বিগলিত শ্রদ্ধা। স্বভাবতঃ গান্ধীহত্যার আসামীদের সম্পর্কে তাদের মানসিক ঘৃণা সীমাহীন। এর ফলে গ্রন্থে লেখকের নিরপেক্ষতা নেই। সেকালের গান্ধীজীর প্রতিমুহূর্ত্তের আচরণ সম্পর্কিত বিবরণ পাওয়া যায়। লেখকদ্বয় সেগুলিকে যথেষ্ট নিষ্ঠার সঙ্গে কাজে লাগিয়েছেন। সেদিক থেকে গ্রন্থটিকে অসাধারণ তথ্যনিষ্ঠ বলে মনে হয়। লেখকদ্বয় নির্ভেজাল সত্য উদ্ধার করছেন বলে মনে হয়। কিন্তু গান্ধী-হত্যাকারীদের সম্পর্কে তিনি যে বিশদ বর্ণনা দিয়েছেন, তা একেবারে রোমাঞ্চকর ডিটেকটিভ উপন্যাসের মত। তার মধ্যে ছদ্মবেশ গ্রহণ, ডুগি তবলার মধ্যে পিস্তল, বোমা ভরে যাতায়াত, গভীর রাত্রে ধীর পদক্ষেপে অন্ধকারে যাতায়াত—গা শিহরিত হবার মত অজস্র উপাদান মেশান হয়েছে। আসলে, অনুমান করা যায়, ষড়যন্ত্রের অংশ বর্ণনায় লেখকদ্বয় মূলতঃ রাজসাক্ষী এবং পুলিশের বিবরণের ওপরেই নির্ভর করেছেন। পুলিশ কিভাবে মামলা সাজায় এবং তার সঙ্গে সত্যের যোগ কতখানি থাকে, তা সকলেরই জানা। এ গ্রন্থে সাভারকরকে ষড়যন্ত্রের হোতা বলা হয়েছে। অথচ তিনি সসম্মানে মুক্তি পান। এই একটি তথ্যের জন্যই বইটি আদালত অবমাননার দায়ে অভিযুক্ত হওয়া উচিত।

ঘটনা পরম্পরা ও অভিযুক্তেরা

৩. আবহাওয়া তখন তপ্ত ।। সদ্য দেশ বিভাগ হয়েছে। পাকিস্থানে বেপরোয়া হিন্দু হত্যা ও নির্যাতন চলছে। হিন্দু গৃহবধূ ও কুমারীদের ছিনিয়ে নিয়ে বিবস্ত্র মিছিল করা হচ্ছে, প্রকাশ্যে বিক্রি করা হচ্ছে। লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তু চলে আসছে হিন্দুস্থানে। এর প্রতিক্রিয়ায় ভারতেও কোথাও কোথাও মুসলমানদের ওপর হামলা হয়। মোটকথা পাকিস্থান স্বীকৃত হওয়া সত্ত্বেও সামগ্রিকভাবে মুসলমানদের বিদ্বেষ কমেনি। অথচ হিন্দুস্থানে সব নেতারা চাইছেন শান্তি শান্তি। ফলতঃ চাপা

উত্তেজনায় গুমরাচ্ছিল গোটা দেশ। এই বাস্তব অবস্থাটাকে গান্ধীজী এবং ভারত সরকার উপেক্ষা করেছিলেন।

৪. অলীক কল্পনা ।। এটাই নাথুরামের মূল বক্তব্য। হিন্দুমুসলমান ঐক্যের জন্য বারবার মুসলমানদের নানা যুক্তিহীন দাবীও মেনে নেওয়া হয়েছে এবং এরদ্বারা মুসলমানদের আগ্রহ ও আকাংখা বেড়েছে মাত্র। যার পরিণতিতে পাকিস্থানের উদ্ভব ও সেখানে হিন্দু নির্যাতন। এই পরিস্থিতিতে 'হিন্দু-মুসলমান ঐক্যে' অলীক কল্পনা বলা হয়েছে।

৫. ধর্ম-নিরপেক্ষতার নীতি ।। যে দিন ভারত বিভাগ হ'ল তখন অখণ্ড ভারত বিভক্ত হল এমন দুই ভাগে যার একটি হ'ল মুসলমান রাষ্ট্র, অন্যটি অ-মুসলমান রাষ্ট্র নয়—ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র। যুক্তির ব্যত্যয়ের এ এক মহৎ দৃষ্টান্ত।

৬. বৃটিশকৃত বিকৃত রূপ ।। হিন্দুস্থান থেকে ইণ্ডুস্, ইণ্ডাস্ এবং তার থেকে India ইংরেজদেরই সৃষ্ট।

৭. ভাবলেন নেতারা ।। বিভক্ত ভারতের একাংশের নাম পাকিস্থান হল। অন্য অংশের নাম থাকল India-ই। মূলনাম, 'হিন্দুস্থান' রাখা হল না। ঐ নাম রাখলে 'হিন্দু' প্রাধান্য সূচীত হয়—অন্য ধর্মের লোকেরা আহত হতে পারেন। তাই 'হিন্দুস্থান' নাম পরিত্যক্ত হল। নাথুরাম একেই প্রচ্ছন্ন মুসলমান তোষণ ও হিন্দু-দমন বলেছেন।

৮. লক্ষ্য গান্ধী ছিলেন না ।। নাথুরাম এই ঘটনাটিকে তার পরিকল্পনা থেকে বিচ্ছিন্ন ঘটনা বলেছেন।

৯. নিরাপত্তা ব্যবস্থা......দিল বাড়িয়ে ।। নাথুরাম দেখালেন, নিজের চারদিকে নিরাপত্তার চূড়ান্ত ব্যবস্থা রেখে গান্ধীজী সিন্ধুদেশ থেকে আসা উদ্বাস্তুদের বলছেন সিন্ধুদেশে ফিরে যেতে—পুলিশ বা মিলিটারি সাহায্য না নিয়েই। সেটাই হবে শ্রেষ্ঠ মনুষ্যত্বের পরিচয়। তবে গান্ধীজীর এ নিরাপত্তা ব্যবস্থা কি? তাকে মনুষ্যত্বের কোন্ পর্যায়ে ফেলা হবে?

১০. এগুতে পারল না ।। পূর্বোল্লেখিত গ্রন্থে এর বিশদ ও রোমাঞ্চকর বিবরণ আছে।

১১. আঃ ধ্বনি বেরিয়ে এল ।। প্রচলিত বিবরণ হচ্ছে গান্ধীজী বলেন 'হে রাম! হে ঈশ্বর'। বিবরণটা মানুগান্ধীর কাছ থেকে পাওয়া। পিস্তলের তিন তিনটে গুলির পর এত কথা না আসাই স্বাভাবিক।

১২. শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন ।। বেলা পাঁচটা সতের মিনিটে গান্ধীজী শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

১৩. প্রথম বিচার ছিল ।। ১৮৫৮ সালের ২৭শে জানুয়ারী দেওয়ান-ই-খাসে এই বিচার শুরু হয় এবং ৪৪ দিন বিচার চলে। আর রেঙ্গুন জেলে ১৮৬২ খৃষ্টাব্দের ৭ নভেম্বর বাহাদুর শাহের মৃত্যু হয়। প্রসঙ্গতঃ বলি, ১৯৪৩ সালে যখন সুভাষ-

চন্দ্র আজাদ হিন্দ-ফৌজ ও অস্থায়ী ভারত সরকার গঠন করেন, তখন বাহাদুর শাহের কবরের সামনে দাঁড়িয়ে শপথ গ্রহণ করেছিলেন।

১৪. বিদ্রোহ করেছিলেন।। ১৯৪৫ সালের নভেম্বর মাসের ৫ তারিখে দিল্লীর লালকেল্লায় আজাদ্-হিন্দ্ ফৌজের প্রধানদের বিচার শুরু হয়। দেশব্যাপী প্রবল প্রতিবাদের মধ্যে কংগ্রেস আইনজীবীদের নিয়ে গঠিত একটি কমিটি গঠন করে তাদের সমর্থনে পাঠান। কোর্ট মারসালে তাদের ফাঁসীর হুকুম হলেও উত্তাল জনমতের সামনে ইংরেজ সরকার নতি জানায়। তাদের মুক্তি দেওয়া হয়।

১৫. সমার্থক ভাবতেন।। তিলক, গান্ধী এবং অরবিন্দের তিনটি পৃথক গীতা-ভাষ্য আছে। সেই ভাষ্যগুলির মৌল সাম্য ও পার্থক্যের কথা এখানে বলা হয়েছে।

১৬. মহাত্মাকে হত্যা করা হয়েছে।। সরকারী উকিলদের এই বানান গল্পই Freedomt at Midnight গ্রন্থে একেবারে চিত্রনাট্যের ঢং-এ বর্ণনা করা হয়েছে।

১৭. কোন মানুষের যথার্থ সম্মান তার সত্যমূল্যে আরোপিত মূল্যে নয়। গান্ধীজীর সরকারী ধারণার বিরুদ্ধে মন্তব্য সর্বদাই চেপে যাওয়া হ'ত। পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য-পাল হিসাবে ফনীভূষণ চক্রবর্ত্তীর এট্‌লির কথোপকথনের বিবরণও আকাশবাণীর সম্প্রচারে কেটে দেওয়া হয়েছিল। রমেশচন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত History of the Freedom Movement in India (vol-III P. 6110) দ্রষ্টব্য।

১৮. retrospective effect.

১৯. আশ্রয় নিয়েছিল আদালতটি।। লাহোর হাইকোর্ট নাম বজায় ছিল—অবস্থান হয়েছিল সিমলায়।

## শুনন ধর্মাবতার

### দ্বিতীয়ভাগ ঃ প্রথম অধ্যায়

অনুচ্ছেদ ৮

'হিন্দুরাষ্ট্র' ।। নাথুরাম সম্পাদিত মারাঠা দৈনিক সংবাদপত্র ।

অনুচ্ছেদ ২২

তাত্যারাওয়ানী আসে ।। মারাঠী ভাষায় যে কোন সম্মানীয় ব্যক্তিকে তাত্য়ারাওয়ানী এই বলে সম্বোধন করা যায় । এখানে এই শব্দটি দিয়ে বীর সাভারকরকে বোঝান হয়েছে ।

অনুচ্ছেদ ৩৫

বার বার যে নৃশংসতার প্রকাশ ঘটল ।। ১৯৪৬ সালে ১৬ আগষ্ট শুরু হ'ল প্রত্যক্ষ সংগ্রাম । সকাল থেকে ব্যাপক হিন্দু হত্যা । ১৭ তারিখে তা হ'ল আরও ব্যাপক । ১৮ই আগষ্ট পর্যন্ত কলকাতায় সমান ভয়াবহতা । কলকাতা সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন । এর কয়েকদিনের মধ্যেই ঢাকায় এবং নোয়াখালিতে ।

বিখ্যাত রাজনৈতিক ভাষ্যকার লিওনার্ড মোসলে তার বিখ্যাত Last Days of the British Raj গ্রন্থে লিখেছেন, It was only when Hindus and Sikhs had come out in retaliation that the Chief Minister had called for Military aid...[ Page 33 ]

এই মুখ্যমন্ত্রীই মিঃ সুরাবর্দী ।

অনুচ্ছেদ ৩৭

প্রচার করতে পারবে ।। যে সাভারকর শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ মিছিলকেও সন্ত্রাসবাদী কৌশল ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা বলছেন, তিনি স্পষ্টতই গান্ধী হত্যার নির্দেশ দিতে পারেন না—এটাই নাথুরামের যুক্তি । নাথুরামের সঙ্গে স্পষ্টতঃই সাভারকরের মতপার্থক্য ও দূরত্ব বেড়ে উঠেছে । যে সাভারকর মদনলাল ধিংড়ার প্রেরণা, সে সাভারকর মৃত ।

গোপন করতে হবে আমাদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ।। নাথুরামের এই সিদ্ধান্ত গান্ধী মামলার সঙ্গে সাভারকরের সংযোগকে পূর্ণতঃ অগ্রাহ্য করে দিচ্ছে ।

অনুচ্ছেদ ৪০

হিন্দুরক্তের নদী বইছে ।। মোসলের গ্রন্থে উধৃত সরকারী তথ্যনির্ভর বিবৃতি অনুসারে ঃ

60,000 of them were killed. But no, not just killed. If they were children, they were kicked up by the feet and their heads. If they were girls, they were raped and then their breasts were chopped off. And if they were pregnant, they were disembowelled [ Page—279. ]

আর এক সরকারী হিসাবে নিহত ৬,০০,০০০। গৃহহারা ১,৪০,০০,০০০ ধর্ষিতা ১,০০,০০০ ধর্মান্তরিতা বা নীলামে বিক্রি করার সংখ্যা নির্ধারণ করা যায় নি।

অনুচ্ছেদ ৪১

হায়দ্রাবাদ সমস্যার ব্যাপারে।। হায়দ্রাবাদ সমস্যা নিয়ে পরে বিস্তৃত আলোচনা আছে। হায়দ্রাবাদের মূল সমস্যা ছিল এই যে এর শাসক ছিলেন মুসলমান নিজাম, প্রজাবর্গ ছিল হিন্দু প্রধান। কাশ্মীরের সমস্যা ছিল ঠিক উল্টো। গান্ধীজী নেহেরুজীর চাপে কাশ্মীরে সৈন্য পাঠাতে রাজী হন- কিন্তু হায়দ্রাবাদে সৈন্য পাঠাতে সম্মতি দেন নি। তার মৃত্যুর পরেই এটা করা সম্ভব হয়েছিল। নইলে দক্ষিণ ভারতেও ভারত-কাঁটা হয়ে অবস্থান করত পাকিস্থান সমর্থক হায়দ্রাবাদ।

আপত্তি জানালাম।। সাভারকরের সঙ্গে এদের মতবিরোধ এবার প্রকাশ্য হল।

অনুচ্ছেদ ৪২

ডাঃ মুখার্জিকে সমর্থন করলেন।

নীতিগত দিক থেকে সাভারকরকে অসমর্থনও করা যায় না। তিনি জাতীয় সরকারকে জাতীয় সরকার হিসাবেই গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন। নাথুরাম বলছেন, এসব হল আদর্শের কথা। বাস্তব পরিস্থিতি কি তা ছিল? কংগ্রেস কি সত্যিই জাতীয় সরকার হিসাবে জাতীয় মনোভাব প্রকাশ করছিল? বিশেষতঃ মুসলিম তোষণ ও নিজেদের ক্ষমতা লিপ্সার জন্য যে কংগ্রেস লক্ষ লক্ষ নিরপরাধ হিন্দুকে চরম অসম্মান ও হীনতার মধ্যে ছুঁড়ে দিয়েছে, তাকে কোন সর্তেই সমর্থন করা যায় না।

অনুচ্ছেদ ৪৭

যা আমাকে গান্ধীজীর দিকে গুলি ছুঁড়তে বাধ্য করল।। নাথুরাম প্রমাণ করতে চাইছেন যে, গান্ধীজীর দিকে গুলি বর্ষণ তার একক সিদ্ধান্ত এবং আকস্মিক সিদ্ধান্ত। এর সঙ্গে বীর সাভারকরের যোগ থাকা সম্ভব নয়।

# অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে গান্ধী

রাজনীতি

**।। প্রথম পর্ব ।।**

অনুচ্ছেদ ৪৯

যাকে হিন্দুরা তাদের নিজেদের দেশ বলতে পারে ।। এটি জাতিসংঘে স্বীকৃত এক মৌল প্রশ্ন। প্রত্যেক জাতির নিজস্ব ভূমি হিসাবে একটি স্থানকে নির্দিষ্ট রাখতে হবে। এই নীতির বশেই ইজরাইলের জন্ম—ইহুদীস্থান। এই যুক্তিতে ভারতবর্ষ বিভাজন অযৌক্তিক—হিন্দুস্বার্থ ক্ষুণ্ণ করা মাত্র।

অনুচ্ছেদ ৫১

পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থার দাবীর মধ্যেই ।।

১৯০৬ সালে প্রধানমন্ত্রী মারলে কমন্‌স সভায় ঘোষণা করেন যে ভারতের বড়লাট লর্ড মিন্টো ভারতীয় আইন সভায় প্রতিনিধি বাড়াবার আয়োজন করবেন। এই ঘোষণার সূত্রে ভারতীয় মুসলমানদের প্রতিনিধি হিসাবে ৩৬ জনের এক দল আগাখার নেতৃত্বে ১৯০৬ সালের ১লা অক্টোবর সিমলায় লর্ড মিন্টোর কাছে দরবারে উপস্থিত হয়। তাদের প্রধান দাবী ছিল—

১. ব্রিটিশের চাকরীর ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা তুলে দিয়ে সম্প্রদায়ভিত্তিক আনুপাতিক নিয়োগ।

২. উচ্চ আদালতে বিচারক ও প্রধান বিচারক হিসাবে মুসলমানদের নিয়োগ।

৩. মিউনিসিপ্যালিটি গুলিতে সম্প্রদায়ভিত্তিক নির্বাচকমণ্ডল এবং আইনসভায় নির্বাচক মণ্ডল গঠন। তারা সরকারের পরামর্শ সভাতে মনোনয়নের ক্ষেত্রেও মুসলমানদের স্বার্থরক্ষা এবং মুসলীম বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্যও দাবী জানাল।

মুসলমানদের জন্য সংঘবদ্ধ দাবী জানাবার ঘটনা এই প্রথম।

এবং সর্বশেষে ।।

১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ আইনে কার্জন প্রচ্ছন্নভাবে যে নীতি প্রয়োগ করেছিলেন ১৯০৬ সালে মর্লি মিন্টো সংস্কারের ভিতর দিয়ে তা প্রকাশ্য প্রয়োগ শুরু হয়। ১৯৩৪ সালে এই প্রয়োগ পর্বের চূড়ান্ত সীমা। বস্তুতঃ ১৯৩৪ সালেই কংগ্রেস

ভারতবিভাগের বীজ অনিবার্য ভাবে উপ্ত হতে দিয়েছিল। এবং না গ্রহণ না বর্জনের নপুংসক নীতির ফলে সে বীজের বিষবৃক্ষ বেড়ে উঠতে বাধাও আসে নি। [ ১৯৩৪ সালের আইন সম্পর্কে পরে বলা হবে। ]

অনুচ্ছেদ ৫৫

১৯১৬ সালের লক্ষ্মৌ চুক্তি দ্বারা ।।

১৯১৬ সালের ডিসেম্বরে কংগ্রেস এবং লীগের মধ্যে এক যৌথ চুক্তি হয়। এখানেও কংগ্রেস কিন্তু পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থাকে মেনে নেয় এবং এক যৌথ শাসন সংস্কারের দাবী করে।

রমেশচন্দ্র মজুমদার এই চুক্তি সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন, ' . there was no substantial difference between the Congress-League joint scheme and the one drawn up by I9 members of the Imperial Legislative Council.

History of Freedom Movement ( VI-II, Ed 75 Page 329 )

মুসলিম লীগের এই সমঝোতার পিছনে অন্য তাগিদ ছিল। খিলাফৎ আন্দোলনের ফলে ব্রিটিশরা মুসলমানদের প্রতি রুষ্ট হয়। মহম্মদ আলি ও শৌকত আলিকে অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্দী করে রাখে। এসব কারণে মুসলমানরা এই ব্রিটিশবিরোধী ব্যাপারে যুক্ত হয়।

ড: জওহরলাল নেহেরু : বিশ্ব ইতিহাস প্রসঙ্গ ( ১ম সং ) পৃ. ৬২৬

তা সত্ত্বেও তারা কংগ্রেসের কাছ থেকে আদায় করে নিতে ভুল করে নি। কংগ্রেস নেতারা বুঝেও সম্মতি দিয়েছিলেন।

অনুচ্ছেদ ৫৬

লোকমান্য তিলক লোকান্তরিত হওয়ার পর থেকেই ।।

১৯২০ সালের ১লা আগষ্ট তিলকের মৃত্যু হয়। কিন্তু ১৯১৮ সালের ১৯শে সেপ্টেম্বর থেকে ১৯১৯ সালের ২৭শে নভেম্বর পর্যন্ত ভারতে ছিলেন না। এই সময়কালে আইনত নেতৃত্ব তিলকের হাতে থাকলেও কার্যতঃ তা ছিল গান্ধীজীর হাতে। অতএব বলা যায় তত্ত্বগত দিক থেকে ১৯২০ সালের আগষ্ট থেকে গান্ধীজী নেতৃত্বে এলেও, তাঁর হাতে ক্ষমতা এসে গেছিল ১৯১৮ সালের সেপ্টেম্বর থেকেই।

অনুচ্ছেদ ৫৭

গান্ধীজী আমেদাবাদে সবরমতী নদীর তীরে এক আশ্রম বানিয়ে ।।

'যুদ্ধের মধ্যেই গান্ধীজী দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ভারতবর্ষে ফিরেছিলেন, সবরমতীতে আশ্রম প্রতিষ্ঠা করে তাঁর অনুচরদের নিয়ে সেখানে বসবাস করছিলেন।'—

জওহরলাল : বিশ্ব ইতিহাস প্রসঙ্গ ( পৃ. ৬৬৮ )

অনুচ্ছেদ ৬৩

দাদাভাই নৌরজী ।।

১৮২৫ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা সেপ্টেম্বর জন্ম। ১৯১৭ সালের ৩০শে জুন, শনিবার, তাঁর মৃত্যু হয়।

ফিরোজ শাহ মেহেতা ।।

পার্শি সম্প্রদায়ভুক্ত জাতীয়তাবাদী নেতা। জন্ম ১৮৪৫, মৃত্যু ১৯১৫ খৃষ্টাব্দ।

লোকমান্য তিলক ।।

১৮৫৬ সালের ২৩শে জুলাই জন্ম। মৃত্যু ১৯২০ সালের ৩১শে জুলাই ১লা আগষ্ট।

গোপাল কৃষ্ণ গোখলে ।।

১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে জন্ম। ১৯১৫ সালের ১৯শে ফেব্রুয়ারী লোকান্তরিত হন।

অনুচ্ছেদ ৬৫

খিলাফৎ আন্দোলন…।। এ আন্দোলন সম্পর্কে নাথুরাম বিশদ আলোচনা করেছেন। খিলাফৎ কথাটা খলিফা শব্দজাত। মুসলমান দুনিয়ার পয়গম্বর মহম্মদ। কিন্তু তার উত্তরাধিকারীরা খলিফা। ১৫১২ থেকে ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত মুসলমান জগতের খলিফা ছিলেন তুরস্কের সম্রাট। প্রথম বিশ্বমহাযুদ্ধে তুরস্ক সাম্রাজ্য কার্যতঃ বিলুপ্ত হয়। এতে ভারতীয় মুসলমানেরা বিক্ষুব্ধ হন। প্রথম মহাযুদ্ধে সৈন্য সংগ্রহকালে তুরস্ক সম্পর্কে মুসলমানদের কিছু কিছু প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। সেগুলিও রক্ষিত হয় নি। এ কারণেই মুসলমানেরা খিলাফৎ আন্দোলন শুরু করে। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের ১০ মার্চ গান্ধীজী এক কর্মসূচীতে এ আন্দোলনের সমর্থন করেন। ৮ সেপ্টেম্বর কলকাতায় কংগ্রেসের এক বিশেষ অধিবেশনে খিলাফৎ সমর্থনও অসহযোগ আন্দোলনের অঙ্গ করা হয়। ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে তুরস্কী নেতা কামাল আতাতুর্ক সে দেশে ধর্মনিরপেক্ষ সাধারণতন্ত্রী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন। তুরস্কের সম্রাট ও খলিফা সুইজারল্যান্ডে আশ্রয় নেন। খিলাফৎ আন্দোলনের ভরাডুবি হয়।

"কিন্তু মুসলিম সম্প্রদায়ের পক্ষে ভারতের বাহিরে কোনও রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্যের সহিত ভারতের জাতীয় দাবিকে সংযুক্ত করার ভবিষ্যৎ কুফল সম্পর্কে বিপিনচন্দ্র পাল বিশেষভাবে দেশকে সতর্ক করিয়া দেন। তৎসত্ত্বেও .."

ভারতকোষ (৩য় খণ্ড) – পৃ-৩৭.

আলি ভাইদের… মৌলানা মহম্মদ আলি এবং মৌলানা শৌকত আলি ছিলেন খিলাফৎ আন্দোলনের অগ্রণী নেতা।

মোপলা বিদ্রোহ ॥

এ সম্পর্কেও নাথুরাম পরে বিশদ আলোচনা করেছেন। রমেশচন্দ্র মজুমদার মোপলাদের 'আরব থেকে আগত কয়েক লক্ষ দরিদ্র, মূর্খ অথচ ধর্মোন্মাদ মুসলমান

বলে বর্ণনা করেছেন। সম্ভবতঃ এরা নবম শতাব্দীতে এসে মালাবার উপকূলে বসবাস করছিল। ভারতীয় মেয়েদেরই এরা বিয়ে করত।' তিনি আরও বলেছেন,

had acquired an unenviable reputation for crimes perpetrated under the impulse of religious frenzy. They were responsible for no fewer than thirty-five out breaks of a minor nature, during the British rule. But their most terrible out break mainly due to the Khilafat agitation, took place in August, 1921.

History of the Freedom Movement in India [ Vol=III, Page-157 ]

১৯১৯ সালের আইন

Government of India Act of 1919 তৈরী হয়েছিল ১৯১৮ সালের জুলাই মাসে প্রকাশিত মন্টেগু-চেমসফোর্ড রিপোর্টের ভিত্তিতে। এতে মর্লি-মিন্টো প্রবর্ত্তিত পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থাকে 'স্বায়ত্তশাসন প্রবর্ত্তনের পক্ষে গুরুতর বাধা' বলে বর্ণনা করা হলেও সে ব্যবস্থাকে বাতিল করা হয় নি—বরং বাড়ান হয়েছিল। এতে ক্ষমতার এমন বিভাগ করা হল যাকে দ্বৈতশাসন ( Dyarchy ) বলা হয়।

সিন্ধু প্রদেশ ভাগ ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ গঠনে সম্মতি সিন্ধু প্রদেশ ছিল বম্বের অন্তর্গত, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ছিল পাঞ্জাবের ভিতরে। এই সময় এই দুই অঞ্চলের মুসলমান প্রাধান্যের জন্য পৃথক প্রদেশ রূপে সংগঠিত হয়।

গোল টেবিল বৈঠক॥ গোল টেবিল বৈঠক বসে তিনবার। ১৯৩০ সালের নভেম্বরে প্রথম অধিবেশন। ১৯৩১ সালের হেমন্তকালে দ্বিতীয়বার এবং শেষবার ১৭ই নভেম্বর ১৯৩২ সালে।

গান্ধীজী নিজে শ্রমমন্ত্রী ম্যাকডোনাল্ডকে· গান্ধীজী নিজে ম্যাকডোনাল্ডকে জনান্তিকে ডেকে 'সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারা' মেনে নিতে বলেন। এটা তার আগ বাড়িয়ে দীনতা স্বীকার। এ ঘটনাও 'হিন্দু মুসলমান' ঐক্যের পথ রুদ্ধ করে দিল।

মেনে নিতে বললেন : এ সম্পর্কে জওহরলাল নেহেরুকে লেখা এডোয়ার্ড টমসনের পত্রাংশ ঃ গোলটেবিল বৈঠকে · গান্ধীজীর ত্রুটি নজরে পড়ল। তিনি শুধু অহং সর্বস্ব নন্‌ অসংলগ্নও বটে। উনি ইংলন্ডে না এলে ভাল করতেন।

A bunch of old letters Nehru. P. 120

১৯৩৫ সালের আইনের পুনর্গঠনে·· ১৯৩২ সালের গোলটেবিল বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুসারে ব্রিটিশ সরকার ১৯৩৩ সালে এক শ্বেতপত্র ( White paper ) তৈরী করেন। পরে তাকে ভিত্তি করেই ১৯৩৫ সালে তা আইনে পরিণত করা হয়।

# অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে গান্ধী রাজনীতি

## ।। দ্বিতীয় পর্ব ।।

---

অনুচ্ছেদ ৬৯

ক. নতুবা তাকে ছাড়াই চলতে হ'ত গান্ধীজীর এই মানসিকতা সম্পর্কে অনেক আগে সুভাষচন্দ্র মন্তব্য করেন Whenever any opposition raised outside his cabinate, he could always coerce the public by threatening to retire from Congress or to fast unto death

[ The Indian Struggle P. 245 ]

গান্ধীজী একবার বড়লাট লিনলিথগোকে অনশনের হুমকী দিয়েছিলেন। তাতে তিনি লেখেন, "I regard the use of a fast for a political purposes as a form of political blackmail ( himsa ) for which there can be no moral justification."—

Gandhijis Corrospondence with the Govt. 5th Feb, 1943.

খ. মোপলা বিদ্রোহ ।। ১৯২১ সালের আগষ্টের শেষ দিকে এই বিদ্রোহের সূচনা হয়। কিন্তু এ কি বিদ্রোহ ? ১৯২১ সালের শেষ দিকে মুসলমানদের আক্রোশ স্তিমিত হয়ে আসে।

জ. ১লা জুলাই মন্ত্রীসভায় অংশ নেবার সিদ্ধান্ত নিল ।। এই সিদ্ধান্তের ফলে সাতটি প্রদেশে, যথা – বোম্বাই, মাদ্রাজ, যুক্তপ্রদেশ, বিহার, মধ্যপ্রদেশ, উড়িষ্যা, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে কংগ্রেস মন্ত্রীসভা গঠন করল। কিছুদিন বাদে কংগ্রেস আসামে একটি যুক্ত মন্ত্রীসভা গঠন করল। দু'টি প্রধান প্রদেশ, বাঙলা ও পাঞ্জাবে অকংগ্রেস মন্ত্রিসভা গঠিত হ'ল।

জওহরলাল নেহেরু ঃ বিশ্ব ইতিহাস প্রসঙ্গ। পৃ: ৬৯০.

মুসলমানেরা কংগ্রেসের নিয়ন্ত্রণে যেতে সম্পূর্ণ অনিচ্ছুক ছিল. . ১৯৩৮ সালের ১৭-১৮ এপ্রিল কলকাতায় অনুষ্ঠিত লীগ অধিবেশনে সভাপতি জিন্না বলেছিলেন —"We cannot surrender, submerge or submit to the dictates or the ukase of the High command of the congress, which is developing into a totalitarian and authoritative causes functioning under the name of the working committee, and

aspiring to the position of a shadow cabinet in a future republic"

Pirjada (Edition) Foundation of pakistan : XI Vol. Page 293-295

কংগ্রেস যখন সগর্বে পদত্যাগ করল···ওয়ার্কিং কমিটি ২২শে অক্টোবর কংগ্রেসী মন্ত্রীদের পদত্যাগের নির্দ্দেশ দেন। এ নির্দ্দেশ পালনের সময় সীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছিল ১৫ই নভেম্বর। ২৭শে অক্টোবর থেকে ১৫ই নভেম্বরের মধ্যে সব কংগ্রেসী মন্ত্রী পদত্যাগ করলেন।

ঝ. যুদ্ধের সুযোগ নিল লীগ :—

ভারত বিভাগের দাবী সিদ্ধান্ত হিসাবে গ্রহণ করল···1940 খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসের ২২ তারিখে মুসলীম লীগের লাহোর অধিবেশনে ভারত বিভাগের দাবী সিদ্ধান্তের আকারে গ্রহণ করা হয়েছিল।

ঞ. ক্রিপ্সের বিভাজন প্রস্তাব গ্রহণ :—

১৯৪২ সালে এলো ক্রিপ্স কমিশন···১৯৪২ সালের ১১ মার্চ ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিল ঘোষণা করেন যে তাঁর যুদ্ধকালীন মন্ত্রীসভার সদস্য স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্স্ ভারতে আসবেন। ভারতের কতকগুলি শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের বিষয়ে তিনি খোলাখুলি আলোচনা করবেন এবং সেগুলি উদ্দেশ্যসিদ্ধি করবে কিনা তা যাচাই করবেন। ক্রিপ্সের এই ভারত সফরকেই ক্রিপ্সের দৌত্য বা ক্রিপস্ কমিশন বলা হয়। তিনি ২২শে মার্চ দিল্লী আসেন এবং ১৩ই এপ্রিল করাচি থেকে লন্ডন যাত্রা করেন।

. কংগ্রেসের 'ভারত ছাড়ো', লীগের 'ভাগ কর ও ভারত ছাড়ো' :

এ নীতি কংগ্রেস অনুমোদন করল···১৯৪২ সালের ১৪ই জুলাই কংগ্রেস এই আন্দোলনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ১৭ই আগষ্ট ১৯৪২ সালের এ আই. সি. সির বম্বে অধিবেশনে এই প্রস্তাব অনুমোদিত হয়।

ভারত ছাড়ো আন্দোলনের বিরোধিতা করেছেন··জিন্নার প্রেরণাতেই ১৯৪২ সালের ২০শে আগষ্ট বম্বেতে লীগের ওয়ার্কিং কমিটির মিটিংয়ে সরকারকে আশু দৃষ্টি দিতে বললেন - "To the demand of 100 millions of Muslims of India to establish sovereign states in the zones which are their homelands and where they are in a majority." কিন্তু তার আগেই কংগ্রেস নেতারা গ্রেপ্তার হবার পরেই জিন্না এক বিবৃতি প্রকাশ করেন—

"Congress had declared war on the Government, regardless of all interests other than its own, and appealing to Moslems to keep completely aloof from the movement."

প্রতি আওয়াজ তুললেন…১৯৪৩ সালের ডিসেম্বরে সর্বভারতীয় মুসলীম লীগের করাচি অধিবেশনে এই নতুন আওয়াজ শোনা যায়। রমেশ মজুমদার লিখেছেন was heard a new slogan, 'Divide and Quit', persumably as a counter part of Gandhi's 'Quit India'.

History of Freedom Movement of India (III) P. 563

গ. সুবাবর্দীর পৃষ্ঠপোষকতা :

অন্তবর্তী-কালীন সরকার গড়তে আহ্বান করলেন…৬ই আগষ্ট ১৯৪৬ ভাইসরয় লর্ড ওয়েভেল জওহরলালকে মন্ত্রীসভা গড়বার জন্য পত্রে আহবান করেন। ৮ আগষ্ট ওয়ার্দ্ধায় কংগ্রেস ওয়ারকিং কমিটির সভায় জওহরলালকে এ আমন্ত্রণ গ্রহণের নির্দ্দেশ দেওয়া হল।

প্রত্যক্ষ সংগ্রাম শুরু করবে… মুসলীম লীগ কাউন্সিল ১৯৪৬ সালের ২৯শে জুলাই যে প্রস্তাব গ্রহণ করে তারই সূত্রে ওয়ার্কিং কমিটি ১৬ই আগষ্ট থেকে 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম' শুরু করবার হুমকী দেয়। জিন্না বলেন যে এতদিন লীগ গঠনতান্ত্রিক পথে আন্দোলন করেছে। এবার "Today we have also forge a pistol and are in a position to use it."

V. P. Menon : The Transfer of Power in India P. 284.

অপ্রতিহত বেগে চলল তিন দিন…১৬, ১৭, ১৮ আগষ্ট কলকাতার বুকে মুসলমানদের চলল নারকীয় হত্যা, অগ্নিসংযোগ, লুঠ ও ধর্ষণের লীলা।

"It was only when the Hindus and Sikhs had come out in retaliation that the Chief Minister had called for Military aid"

Leonard Mosley : The Last days of the British Raj Page 33.

ঘ. কেবিনেট মিশন প্ল্যান্ট।

গোড়ার দিকে ভাবতে এলো কেবিনেট মিশন…১৯৪৬ সালের ২৪শে মার্চ দিল্লীতে এসে পেঁছায় কেবিনেট মিশন।

তৃতীয় অধ্যায়

## গান্ধীজী ও স্বাধীনতা

৭১. মারাঠা সাম্রাজ্য ভেঙ্গে পড়ল ।। তৃতীয় ইঙ্গ মারাঠা যুদ্ধের (১৮১৭-১৮) কথা বলা হয়েছে। ১৮১৮ সালের জুনে বাজীরাও আত্মসমর্পন করেন। লর্ড হেস্টিংস মারাঠারা আর যাতে মাথা উঁচু না করতে পারে, সেইভাবে চুক্তি ও বন্দোবস্ত করেন।

যখন শিখ শক্তির পরাভূত হল ।। লেখক এখানে লর্ড ডালহৌসির আমলের দ্বিতীয় ইঙ্গ-শিখ যুদ্ধের উল্লেখ করেছেন। এ যুদ্ধ ১৮৪৮-৪৯ সালে সংঘটিত হয়। ১৮৪৯ সালের মার্চ মাসে ছত্রসিং এবং শের সিংহের আত্মসমর্পনে শিখ শক্তির পতন ঘটে।

১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ দানা বেঁধে উঠতে থাকল ।। 'সিপাহী বিদ্রোহ' নামে আখ্যাত বিদ্রোহের কথা বলা হয়েছে। গোটা উত্তর ভারত ব্যাপী এই বিদ্রোহ ত' এক দিনে শুরু হয়নি। তাই বলছেন, দানা বেঁধে উঠতে থাকল।

প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ।। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন, ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ইত্যাদি নামের নানা সংগঠন ১৮৮০ সালের কাছাকাছি অস্ফুটভাবে রাজনৈতিক আন্দোলন করছিল। এই জাতীয় সংগঠনগুলিকে একত্রিত করে ১৮৮৫ সালে বোম্বাইতে উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন হয়।

ক্ষুদিরাম বসুর বোমা বিস্ফোরণেই যার সূচনা ।। এর প্রায় বছর দশেক আগে ১৮৯৭ সালের ২২শে জুন চাফেকার ভাইরা অত্যাচারী শাসককে গুলি করে হত্যা করে। কিন্তু এ ছিল বিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা। এ জন্যই ক্ষুদিরামের বোমা বিস্ফোরণের ঘটনাকেই অগ্নিযুগের সূচনা বলে ধরা হয়। ক্ষুদিরামের সঙ্গে প্রফুল্ল চাকীর নামটাও এক নিঃশ্বাসে উচ্চারণযোগ্য।

৭৩. ব্রিটিশ সরকার তাদের আইন সভাকে ।। ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে বোম্বাইয়ে কংগ্রেসের পঞ্চম অধিবেশনে ইংলণ্ডের পার্লামেন্টের সদস্য চার্লস ব্রাডলফ্ নিজে উপস্থিত থেকে কংগ্রেসের কিছু দাবীর ভিত্তিকে এক আইনে প্রস্তাব রাখেন। ১৮৯২ সালে তা ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অ্যাক্ট নামে পাশ হয়। এতে ভারতে ব্রিটিশ আইনসভার সভ্য সংখ্যা বাড়ান হয়। মূল দাবীর খুবই সামান্য অংশ এতে পূরণ হয়েছিল।

তবু এই আইনের আওতায় গোপালকৃষ্ণ গোখলে, স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, রাসবিহারী ঘোষ, সুরেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় আইনসভায় ঢুকে পার্লামেণ্টারিয়ান হিসাবে ভারতীয়দের যোগ্যতার পরিচয় দেন। তারা আন্দোলনকেও আইনসভার মধ্যে নিয়ে যেতে পেরেছিলেন।

মর্লি মিন্টো সংস্কার ।। মর্লি'র প্রস্তাব অনুসারে ১৯০৯ সালে তৃতীয় ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অ্যাক্ট চালু হয়। এতে যে সব বিশেষ সুযোগ দেওয়া হয়, তার প্রধান হল করদাতাদের প্রত্যক্ষ ভোট দেবার ব্যবস্থা। কিন্তু সেই সঙ্গে যে কাঁটা বেঁধান হয় তা হল মুসলমানদের জন্য পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা। অর্থাৎ এ সময় থেকেই ভারতীয়দের দুভাগে ভাগ করে দেওয়া হল—মুসলমান ও অ-মুসলমানে।

মন্টেগু চেমসফোর্ড শাসন সংস্কার ।। মণ্টেগু ছিলেন সে সময়ের ইংলণ্ডের পার্লামেণ্টের ভারত সচিব আর চেমসফোর্ড ভারতের বড়লাট। ১৯১৮ সালের জুলাই মাসে প্রকাশিত এদের এক রিপোর্টের ভিত্তিতে ১৯১৯ সালে Government of India act নামে এক আইন বিধিবদ্ধ হয়। এতে দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট শাসন ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হয়। পৃথক নির্বাচক মণ্ডলীকে স্বায়ত্তশাসন বিকাশের বাধা বলে মত প্রকাশ করা হলেও মর্লি-মিণ্টো সংস্কারের বিধি বাতিল কবা হয়নি। প্রাদেশিক শাসন ব্যবস্থায় প্রবর্ত্তিত হল দ্বৈত শাসন। এতে ব্রিটিশ পক্ষের এত বেশি রক্ষাকবচের ব্যবস্থা ছিল যে কংগ্রেসের নরমপন্থীরাও একে সমর্থন করেন নি।

৭৪. গান্ধীজীর নেতৃত্বে এই আইন বয়কট ॥ গান্ধীজী এবং তার একান্ত অনুসারীরা এই আইন-বলে নির্বাচনে দাঁড়িয়ে আইনসভায় প্রবেশের পক্ষে ছিলেন না। চিত্তরঞ্জন দাশ, মতিলাল নেহেরু, সত্যমূর্ত্তি, হাকিম আজমল খান, বিঠলভাই প্যাটেল জয়াকর ইত্যাদি ছিলেন পক্ষে। এরা স্বরাজ্য দল গঠন করেন। ১৫ই সেপ্টেম্বর দিল্লীতে কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনের সভাপতি আবুল কালাম আজাদও গান্ধীজীর বিরুদ্ধে মত দেন। ফলে না গ্রহণ না বর্জন নীতি নেওয়া হয়। এতে সব মিলিয়ে লাভ হয় মুসলীম লীগের।

৭৫. গদর পার্টি ।। ১৯১৩ সালের মধ্যে আমেরিকা ও কানাডার ভারতীয়রা ভারতীয় স্বাধীনতার জন্য বিপ্লব সংগঠনের উদ্দেশ্যে এক বৈপ্লবিক সংস্থা গঠন করেন। তাদের এক পত্রিকার নামও ছিল 'গদর'। এই পত্রিকাটি বিভিন্ন ভাষায় মুদ্রিত হত এবং বিভিন্ন ভাষাভাষী ভারতীয়দের মধ্যে বিতরণ করা হত। বীর সাভারকর এদের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। গদর পার্টি ভারতবর্ষেও বহু আন্দোলন পরিচালনা করে।

...সৈন্য সংগ্রহকে উৎসাহ দিয়েছেন ॥ আমাদের শৈশবেও দেখেছি ব্রিটিশসরকার গান্ধীজীর ছবি সহ পোস্টার দিয়ে সৈন্য সংগ্রহের প্রচারে নামতেন।

এই সময় ভারতীয় রাষ্ট্রীয় সচিব হিসাবে মিঃ মন্টেগু ভাবতে এলেন ॥ ১৯১৭ সালের নভেম্বর মাসে ভারতসচিব মিঃ মণ্টেগু ভারতে আসেন। তখন ভারতের বড়লাট ছিলেন লর্ড চেমসফোর্ড। দু জনে একত্রে বহু ভারতীয় রাজনীতিবিদ ও রাজ পুরুষের সঙ্গে ভারতীয় বিষয়ে আলোচনা করেন। এই আলোচনার ফলই ১৯১৮ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে মণ্টেগু-চেমসফোর্ড রিপোর্ট হিসাবে প্রকাশিত হয়। ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইন এই রিপোর্টের ভিত্তিতেই রচিত হয়েছিল।

জালিয়ানওয়ালাবাগের বেদনাদায়ক ঘটনা ॥ জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড অনেকগুলি ঘটনার ফল। ১৯১৯ সালের ৬ এপ্রিল গান্ধীজী যে সর্বভারতীয় হরতাল ডাকেন তার প্রতিক্রিয়ায় দিল্লীতে গুলি চালিয়েছিল পুলিশ। গান্ধীজী দিল্লী যাত্রা করলে তাকে পথে গ্রেপ্তার করে সরকার। ফলে পরদিন বহুস্থানে স্বতঃস্ফূর্ত হরতাল হয়। পাঞ্জাবে ৯ এপ্রিল প্রতিবাদ মিছিল বের হয়। নেতৃত্ব দেন ডঃ কিচলু ও সত্যপাল। কিন্তু শান্ত প্রতিবাদকারীদের নেতা হিসাবে কর্তৃপক্ষের হাতে স্মারক লিপি তুলে দেওয়া মাত্র তাদের গ্রেপ্তার করা হল এবং বিনা বিচারে কারাদণ্ড দেওয়া হল।

এর প্রতিবাদে পরদিন ১০ এপ্রিল বের হল বিশাল মিছিল। বিন্দুমাত্র সতর্ক না করে এ মিছিলের ওপর পুলিশ গুলি চালাল। হতাহত হল প্রচুর। বিক্ষুব্ধ মানুষ কাছেই এক ব্যাঙ্কের ম্যানেজার এবং তিন ইউরোপীয় ব্যক্তিকে হত্যা করল।

বারোই এপ্রিল জনসাধারণের তরফ থেকে জালিয়ানওয়ালাবাগের চত্বরে এক সমাবেশ আহ্বান করা হয়! বাগটির চতুর্দিকে বাড়ি। একদিকে প্রায় পাঁচফুট উঁচু প্রাচীর। প্রবেশ-প্রস্থান পথ একটি। জন-জমায়েত হল ছয় থেকে দশ হাজার। জেনারেল ও-ডায়ার এই সমাবেশকে বেআইনী বলে গ্রহণ করে, ঐ পথ আগলে সৈন্য বাহিনী নামিয়ে দশ মিনিট এক টানা গুলি বর্ষণ করলেন।

সরকারী হিসাবে ১৬০০ রাউণ্ড গুলি চালান হয়েছিল। আহত বারশ'র বেশি। নিহত প্রায় চার শ'। বেসরকারী হিসেবে আরও বেশি।

প্রসঙ্গতঃ বলা দরকার প্রতিবাদ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তিনি নাইট উপাধি ত্যাগ করেন। আর শঙ্কর নারায়ণ আয়ার কেন্দ্রীয় সরকারের পরামর্শসভার সদস্যপদ ত্যাগ করেন।

কুড়ি বছর পর তাকে এ পাপের প্রতিফল পেতে হয় ॥ উধম সিং ১৯৩৩ সালে ইংল্যাণ্ডে যান ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে পড়তে। ১৯৪০ সালের ১৩ই মার্চ সে এক সভায় জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের নায়ক ও-ডায়ারকে হত্যা করে। বিচারে তার ফাঁসির হুকুম দেওয়া হয়। ১৯৪০ সালের ১২ জুন তাঁর ফাঁসি হয়।

চাফেকার ভাইয়েরা··· একই মমলায় তিনভাই এর ফাঁসি হয়। অত্যাচারী র‍্যাণ্ডকে ১৮৯৭ সালের ২২শে জুন হত্যা করা হয়। পুনার অন্তর্গত চিনচবাদ

গ্রামে এদের জন্ম হয়। বাবার নাম হরিচাকেবাক। দামোদর, বাসুদেব এবং বালকৃষ্ণ নামে তিনভাই র‍্যাণ্ডের অত্যাচারের হাতথেকে স্বদেশরক্ষায় গুলি চালান। তিন জনকেই যারবেদা জেলে যথাক্রমে ১৮ই এপ্রিল, ৮ই মে এবং ১২ই মে ১৮৯৯ সালে ফাঁসি দেওয়া হয়।

শ্যামজী কৃষ্ণবর্মা… লণ্ডন প্রবাসী ভারতীয়দের স্বদেশমন্ত্রে দীক্ষিত করাই ছিল তাঁর লক্ষ্য। এজন্য তিনি ইংলণ্ডে 'ইন্ডিয়া হাউস' নামে এক ছাত্রাবাস চালাতেন। তিনি ইংল্যাণ্ডে পড়বার জন্য ছাত্রবৃত্তি দিতেন। কিন্তু সর্ত ছিল, সেই ছাত্র পরে ইংরেজের অধীনে চাকরী নিতে পারবে না। মদনলাল ধিংড়া, ক্ষুদিরাম, প্রফুল্ল চাকী, সত্যেন বসু, কানাইলাল ইত্যাদির স্মৃতিতে বৃত্তি দেওয়া হ'ত। সাভারকর, বীরেন্দ্রনাথ ইত্যাদি তার সহযোগী ছিলেন। এ সব কাজের জন্য তিনি ইংল্যাণ্ড থেকে বহিস্কৃত হন এবং জেনেভায় গিয়ে বাস করতে থাকেন। সেখানেই তার মৃত্যু হয়।

লালা হরদয়াল… গদর পার্টির প্রধান।

বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় …ভারতের বাইরে থেকে ভারতের স্বাধীনতার জন্য সচেষ্ট মানুষদের অন্যতম। বিখ্যাত 'বার্লিন কমিটি' তাঁরই গড়া। শেষ জীবনে তিনি লেনিনগ্রাদে 'ইনস্টিটিউট্ অব এমনোগ্রাফি'র ভারতীয় বিভাগের প্রধান হিসাবে যোগ দেন। ১৯৩৭ সালে স্টালিনের আদেশে গ্রেপ্তার হন। এরপর থেকে তাঁর হদিশ মেলে না। তবে ২০তম সোভিয়েত কংগ্রেসের পুনর্বিচারে তাকে সাচ্চা কমিউনিষ্ট হিসাবে সম্মানিত করা হয়।

রাসবিহারী বসু ‥ বিপ্লবী চারু রায়ের কাছে দীক্ষিত, উত্তর ও মধ্য ভারতে বৈপ্লবিক সংস্থা গড়েন, হার্ডিঞ্জ হত্যা চেষ্টা, লরেন্স গার্ডেন হত্যা চেষ্টার পরিকল্পনাকার তিনি। সর্বভারতীয় বিদ্রোহ ঘটাবার চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে ভারত ত্যাগ করেন। 'আজাদ হিন্দ ফৌজ' তার গড়া, তিনিই নেতাজীর হাতে সব তুলে দেন। ১৯৪৫ সালের জানুয়ারীতে জাপানে তাঁর মৃত্যু হয়।

বাবু অরবিন্দ ঘোষ · ঋষি অরবিন্দের পূর্বতন নাম। বাঙলার অগ্নিমন্ত্রের দীক্ষাগুরু · আলিপুর বোমার মামলার প্রধান আসামী…ন্যাশনাল কলেজের অধ্যক্ষ, 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকার অন্যতম সম্পাদক ছিলেন তিনি। বোমার মামলা থেকে মুক্তি পাওয়ার পর তিনি হঠাৎ পণ্ডিচেরী চলে যান এবং সেখানে আধ্যাত্ম সাধনায় কলাতিপাত করেন। ১৯৫০ সালের ৫ ডিসেম্বর তাঁর মৃত্যু হয়।

ক্ষুদিরাম বসু ‥ মজঃফরপুরে কিংসফোর্ড হত্যা করতে গিয়ে মিস্ ও মিসেস্ কেনেডিকে হত্যা করে ১লা মে ক্ষুদিরাম ধরা পড়ে। ঐ বছরেই ১৯০৮ সালে ১১ আগষ্ট তাঁর ফাঁসি হয়।

উল্লাসকর দত্ত · আলিপুর বোমার মামলার বোমা তৈরীর নায়ক। ১৯২০ সালে দ্বীপান্তর দণ্ডভোগ করে ফিরে আসেন। ১৯৬৫ সালের ১৭ইমে মৃত্যু হয়।

মদনলাল ধিংড়া··· লণ্ডনের এ ডি. সি ভারতীয় ছাত্রদের বড়ই বিড়ম্বিত করতেন। এজন্য এক সমাবেশে উইলিয়ম কার্জন উইলকে গুলি করে হত্যা করে ধিংড়া ১৯০৯ সালের ১৭ আগষ্ট পেণ্টনভিল জেলে ফাঁসি বরণ করেন।

কানহারে ·· পুরোনাম অনন্তলক্ষণ কানহারে। নাসিকের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট জ্যাকসনকে ১৯০৯ সালে ২২শে ডিসেম্বর গুলি করে হত্যা করেন। ১৯১০ সালের ১০ই এপ্রিল তাঁর ফাঁসি হয়।

ভগৎ সিং···এই শতাব্দীর তৃতীয় চতুর্থ দশকে ভগৎ সিং ভারতের বিপ্লবাত্মক রাজনীতির চঞ্চলতম মানুষ। সাণ্ডার্স হত্যার অভিযোগে তাঁর ফাঁসির হুকুম হয়। সারাদেশ যখন তা রোধের জন্য উত্তাল, গান্ধীজী কিন্তু সম্পূর্ণ নীরব থাকেন। সুযোগ থাকা সত্বেও তিনি মুখ খোলেন নি। লাহোর সেণ্ট্রাল জেলে ১৯৩১ সালের ২৩শে মার্চ ভগৎ সিং-এর ফাঁসি হয়।

রাজগুরু, সুখদেও ···এঁরাও ভগৎ সিং-এর অনুগামী ছিলেন। ওদেরও একই দিনে একই সময়ে ফাঁসি হয়।

চন্দ্রশেখর ·· ইনিও ভগৎ সিং-এর দলভুক্ত ছিলেন। ১৪ বছর বয়সে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়ে প্রথম শাস্তি পান। পরে বিপ্লবী সংগঠন গড়েন। ১৯৩১ সালের ২৭শে ফেব্রুয়ারী এলফ্রেড পার্কে পুলিশের সঙ্গে প্রত্যক্ষ্য সংগ্রামে তিনি নিহত হন।

১৭. এ বিষয়টা খুব স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে ১৯৩১ সালের কংগ্রেসের করাচি অধিবেশনে···১৯৩১ সালের ২৯শে মার্চ করাচিতে কংগ্রেসের অধিবেশন বসে ভগৎ সিং ও তার সঙ্গীদের ফাঁসি হয় এর ঠিক সাত দিন আগে ২৩শে মার্চ। এ বিষয়ে ঐতিহাসিক মন্তব্যের জন্য রমেশচন্দ্র মজুমদারের History of the Freedom Movement in India III-র 315 পৃষ্ঠা দেখুন বা History of Congress এর I Page 456 দেখুন।

স্টেশাটে হুটসনের ওপর এই আক্রমণের ঘটনা ঘটেছে

গান্ধীজী বলেন,

Bhagat Shing Worship has done and is doing incalculable the Country...the result is goondaismand degradation Wherever this mad worship being performed.

It was the peremptory duty of the A.I.C.C to condemn at the forth coming meeting of the trecherous out rage and reiterate its policy of non-violence in unequivocal terms.

তারা মিথ্যা ইতিহাস লিখতে চেষ্টা করছেন…

এ শুধু নাথুরামের কথা নয়, সুভাষচন্দ্রও বারবার একথা বলেছেন। তবে 'বিনা রক্তপাতে ভারতের স্বাধীনতা এসেছে' এ মন্তব্য ১৯৪৭-৪৮ সালে বলে যে তারিফ মিলত, আজ সে অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটেছে। ভারতের বিপ্লবাত্মক আন্দোলনই ইংরেজকে ভারত শাসন ত্যাগ করতে বাধ্য করেছে—কংগ্রেসের আপোষ-বাদী আন্দোলন তাকে করেছে দ্বিখণ্ডিত এ বিশ্বাস ক্রমেই দৃঢ় হচ্ছে। নানা গবেষণা গ্রন্থেও ক্রমেই তা প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। রমেশচন্দ্রের গ্রন্থের প্রতিষ্ঠিত তত্ত্বও এ মতের সমর্থন করে। 'কংগ্রেসের ইতিহাস' গ্রন্থেও অলিখিতভাবে এ নির্দেশ আছে।

বিপুল ভোটাধিক্যে দ্বিতীয়বার কংগ্রেস সভাপতি পদে নির্বাচিত হলেন ॥

১৯৩৯ সালের ৩০শে জানুয়ারী ভোটের ফল প্রকাশিত হয়। সুভাষচন্দ্র পান মোট ১৫৭৫ ভোট আর সীতা রামাইয়া মোট ১৩৪৬ ভোট।

পরদিনই গান্ধীজীর বিখ্যাত স্বীকৃতি প্রকাশিত হয় 'সীতা রামাইয়ার পরাজয় আমারই পরাজয়।'

সুভাষের উপর রাগ গেল না ॥

পরবর্ত্তিকালে পট্টভি 'কংগ্রেসের ইতিহাস' গ্রন্থের ২ খণ্ডের ৬৭৯ পৃষ্টায় লিখেছেন—

'সুভাষের দ্বিতীয়বার সভাপতি হবার প্রশ্নকে কেন এতখানি অন্যায় বলে গ্রহণ করলেন ? নির্বাচনের পরেও তাঁর মনোভাব যে পরিবর্ত্তিত হয় নি, তা তিনি স্পষ্টই স্বীকার করেছিলেন'—

প্রতিদ্বন্দ্বী দৃশ্যের অবতারণা করলেন ॥

গান্ধীজী প্রয়োজন বুঝলেই অনশনের হুমকী দিতেন। সে কথা আর কেউ না বুঝলেও সুভাষচন্দ্র বুঝতেন। তাই তার The Indian Struggle (Page 245) গ্রন্থে লিখেছেন—

> "তার বিরুদ্ধে কোন বিরুদ্ধিতা গড়ে উঠলেই তিনি কংগ্রেস ত্যাগের বা আমরণ অনশনের হুমকী দিয়ে জনসাধারণকে তার মতে চলতে বাধ্য করবেন।"

অনুবাদ ঃ নীঃ হাঃ

৭৯. তার প্রমাণ এই ঘটনায়…

এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে গান্ধীবাদী নেতা শেঠ গোবিন্দদাসের এক বিবৃতির অংশ উদ্ধৃত করছি—

ফ্যাসিষ্টদের মধ্যে মুসলিনী, নাৎসীদের মধ্যে হিটলার, এবং কমিউনিষ্টদের মধ্যে স্ট্যালিনের যে স্থান, কংগ্রেসসেবীদের মধ্যে মহাত্মা গান্ধীরও সেই স্থান।

কংগ্রেসের লিখিত গঠনতন্ত্রে তাঁহার জন্য কোন স্থান নির্দিষ্ট নাই ইহা সত্য, কিন্তু ইহা কেহ অস্বীকার করিতে পারিবেন না, রাষ্ট্রপতি পদে মহাত্মা গান্ধীর মনোনীত ব্যক্তিকে নির্বাচন করা এবং রাষ্ট্রপতির পক্ষে ওয়ার্কিং কমিটির অধিকাংশ সদস্য পদে মহাত্মা গান্ধীর মনোনীত ব্যক্তিকে মনোনীত করা একটা প্রথায় দাঁড়াইয়াছে।'

[ ১১ মার্চ, ১৯৩৯ : আনন্দবাজার পত্রিকা ]

এদের ইচ্ছেটা ছিল ঠিক উল্টো...

India Wins Freedom গ্রন্থে আবুল কালাম আজাদ এই অধ্যায়ের বর্ণনা দিতে গিয়ে অরুণা আসফ আলির বিশদ বিবরণ দিয়েছেন। তখনকার কংগ্রেসী নেত্রী অরুণা আসফ আলি যে আত্মগোপন করে ৯ই আগস্টের পর থেকে 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের নেতৃত্বের একটা বড় দায় গ্রহণ করেছিলেন একথা প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। তাঁর সম্পর্কে আজাদ বলছেন—

She was not worried about the distinction between violence and non-violence but adoped any method she found useful

complete version ( 1988 ) Page 124.

এত সত্ত্বেও জওহরলাল কিন্তু এ আন্দোলনে জনগণের মনে হিংসার প্রতি দ্বন্দ্ব দেখেছিলেন।

> "অহিংসার যে বাণী কুড়ি বছরের অধিককাল তাদের কর্ণকুহরে নিক্ষিপ্ত হয়েছে জনগণ তা ভুলে গিয়েছিল, তবু তারা, মনের দিক থেকে ও অন্য দিক থেকে সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত ছিল হিংসাকে সফল করতে।"
>
> জওহরলাল : ডিসকভারি অব ইণ্ডিয়া, পৃঃ উঃ পৃঃ ৪৮৭

লিনলিথগো যখন গান্ধীজীর সঙ্গে পত্রালাপ শুরু করেন—

১৯৪২ সালের আগষ্ট মাসে এই পত্রালাপ শুরু হয়। পরে পত্রগুলি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

> Gandhiji's Corrospondance with The Government 1942—1944 ( Anudhadad, 1945 )

৮২. ১৯৪১ সালের জানুয়ারীর প্রথম দিকে সুভাষচন্দ্র আশ্চর্যজনক ভাবে ভারতবর্ষ থেকে পালিয়ে যান—

সুভাষচন্দ্র তাঁর এলগিন রোডের পৈত্রিক বাড়ি থেকে অন্তর্ধান করেন ১৭ জানুয়ারী রাত একটা বেজে পনের মিনিটে। কিন্তু অন্তর্ধান ঘোষিত হয় ২৬শে জানুয়ারীতে।

ভারতে যখন ক্রিপস্ মিশন পৌঁছেছে...

স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস্ দিল্লী পেঁছান ২৩ মার্চ, ১৯৪২ এ, ১২ই এপ্রিল ভারত ত্যাগ করেন।

আমেরিকার পার্ল হারবার আক্রমণ করে ইতঃমধ্যেই জাপান অক্ষশক্তির পক্ষে যুদ্ধে যোগদান করে ফেলেছে- ১৯৪১ সালের ডিসেম্বরে জাপান জার্মানীর সমর্থনে যুদ্ধে যোগ দেয় এবং ৭ই ডিসেম্বর আমেরিকার পার্ল হারবার আক্রমণ ও ধ্বংস করে। আক্রমণ হয় সকালে আটটায়।

৮৩. সুভাষ ভারত অভিযান করলে তিনি তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করবেন।

একথা জওহরলালের এক বিখ্যাত বক্তৃতার অংশ।

এ মনোভাব তিনি বহুবার প্রকাশ করেন। জাপানের পতনের পর নেতাজী সম্পর্কে জওহরলালের এই বিদ্বেষী মনোভাব প্রকাশ হয়েছিল—

একজন মার্কিন সাংবাদিক পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুকে সুভাষচন্দ্র বসুর প্রতি তাঁহার মনোভাব সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেন। তিনি বলেন, বসুর প্রতি যুদ্ধাপরাধীর ন্যায় ব্যবহার করা উচিত। কারণ, তাঁহার লোকজন বহু আমেরিকানকে নিহত করিয়াছে এবং তিনি ব্রহ্মদেশ ও মালয়ে বহু দরিদ্র ব্যক্তিদের নিকট হইতে জবরদস্তি করিয়া অর্থ আদায় করিয়াছেন।

আনন্দবাজার পত্রিকা ২৯।৮।৪৫

অনুচ্ছেদ ৮৪

সুভাষ মারা গেলেন বিদেশে —

১৯৪৫ সালের ২৩শে আগষ্ট ভারতের বিভিন্ন কাগজে সুভাষচন্দ্রের মৃত্যু সংবাদ প্রকাশিত হয়। ১৮ই আগষ্ট তাইহোকু বিমান বন্দর থেকে উঠে তাঁর বিমান দুর্ঘটনায় পড়ে। তিনি রাত্রে হাসপাতালে মারা যান।

এ সংবাদ পরিবেশন করে রয়টার। আজও ভারতের বহু মানুষ এ সংবাদ বিশ্বাস করে না। দেখা যাচ্ছে পত্রিকা সম্পাদক নাথুরাম নেতাজীর এ মৃত্যুকে বিশ্বাস করতেন।

রাজনৈতিক বাণিজ্যের মূলধন করেছিলেন — —

আমরা ওপরে ২৯.৮.৪৫ তারিখের আনন্দবাজার থেকে জওহরলালের যে মতামত পেশ করেছি, তার পাশে ২৪শে আগষ্ট এবটাবাদের জনসভায় জওহরলালের বক্তৃতার অংশ তুলনা করলেই বোঝা যাবে -

সুভাষচন্দ্রের মৃত্যু সংবাদ আমাকে আহত করেছে আবার স্বস্তিও দিয়েছে। তার মত যোদ্ধার ভাগ্যে অনেক দুঃখ দুর্দশা নিহিত থাকে। তা থেকে তিনি নিষ্কৃতি পেয়েছেন, এটা আমার স্বস্তি।— কিন্তু তিনি যে আজীবন দেশের জন্য সংগ্রাম করেছিলেন—এ বিষয়ে কারো সন্দেহ থাকতে পারে না।

যে জওহরলাল সাংবাদিককে বলেন, সুভাষচন্দ্রের প্রতি যুদ্ধাপরাধীর মতই আচরণ করা উচিত তিনিই যখন আজাদ হিন্দ্ ফৌজের বিচারে তাদের সমর্থন করতে ছোটেন, তখন এ বৈপরীত্যকে রাজনৈতিক বাণিজ্যের মূলধন সঞ্চয়ের আগ্রহ ছাড়া আর কি বলা যেতে পারে? আজও যখন কংগ্রেসের মঞ্চ থেকে অন্য

কংগ্রেসী নেতার সঙ্গে সুভাষের নাম জুড়ে স্বদেশমুক্তিতে তাদের ত্যাগের খতিয়ান ভারী করার চেষ্টা করা হয়—তখনও তাকে অন্য নাম দেওয়া যায় না।

যে কোন মূল্যে তা রোধ করবেন - - - -

অন্যের কথা ছেড়ে দিলেও স্বয়ং গান্ধীজী এ মত পোষণ করতেন। ৩১শে মার্চ ১৯৪৬ সালে তিনি আবুল কালাম আজাদকে বলেন,

What a question to ask! If the Congress wishes to accept partition, it will be over my dead body. So long as I am alive. I will never agree to the partition of India.

Abul Kalam Azad . India Wins Freedom (Complete Version, 1988) P. 203.

মুসলীম লীগের কোটনা কুটে চলা

রমেশচন্দ্র মজুমদার মন্তব্য করেছেন,

• From the very begining of his political career in India, he (Gandhi) was the greatest Champion of the cause of Muslims, both in and outside India, among the Hindus. As mentioned above, he was even prepared to sacrifice Vital interests of India in order to placate the Muslims, and always held Hindu. Muslim unity was a *Sine qua-non* for the achievement of Indian freedom

History of the Freedom Movement in India vol-III P. 560

এই একই মন্তব্য করেছেন ঃ

H. N. Barilsford : Rebel India. P. 194

চতুর্থ অধ্যায়

## একটি আদর্শের ব্যর্থতা

অনুচ্ছেদ ৮৮

এমন ব্যবহার করেছেন যা হিন্দুদের পক্ষে অপমানজনক

জিন্নার আবির্ভাব থেকে মুসলীমলীগের কাজ ছিল কংগ্রেসের বিরোধিতা করা এবং তাদের অস্বস্তির কারণ সৃষ্টি করা। চূড়ান্ত অবস্থা হয় কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীত্ব মুসলীমলীগকে দেওয়ায়। সেই অপমানকর পরিস্থিতির বর্ণনা আছে আজাদের গ্রন্থটির পূর্ণাঙ্গ সংস্করণের চতুর্দশ অধ্যায়ে 'মাউন্টব্যাটন কমিশন' অধ্যায়ের প্রথমাংশে। এরই ফলে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল, এমন কি জওহরলালও ভারত বিভাজনের পক্ষে চলে যান।

অনুচ্ছেদ ১৪১

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠায় মুখ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন

এ কথা ঐতিহাসিক ভাবে সত্য যে মাউন্টব্যাটন কমিশন যখন ভারতে আসে তখনও ভারত-বিভাগ অনিশ্চিত। বল্লভভাই প্যাটেল কংগ্রেসের মধ্যে সবচেয়ে বড় সমর্থক ছিলেন ভারত-বিভাগের। কিন্তু জওহরলাল সম্মত না হলে কংগ্রেস সহজে পাকিস্থান গঠনের পক্ষে যেত না। আবুল কালাম আজাদের India Wins Freedom গ্রন্থের চতুর্দশ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।